বাঙ্গলার ইতিহাস

শ্রীগদাধর কোলে

ভগীরথ কুটির
গোপীনগর (হরিপাল)
পোঃ ব্রাহ্মণপাড়া, হুগলী

প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬

প্রকাশক :
শ্রীবিধুভূষণ পাল
"ক্ষীরোদালয়"
গোমতিয়া (নসিবপুর)
পোঃ—মোল্লাসিমলা, হুগলী।

প্রাপ্তিস্থান :
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

টিচার্স বুক স্টল
৬।৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

বাণী নিকেতন
২১৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর
শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না
নিউ মহামায়া প্রেস
৬২।৭, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মূল্য ৩৲ তিন টাকা

উৎস

বাঙ্গলার ইতিহাসের প্রতি বাল্যকাল হইতেই আমার এক অসাধারণ কৌতূহল জন্মিয়াছিল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার এই কৌতূহল বর্দ্ধিত হইতে থাকে কিন্তু অপ্রচুর সময়, অত্যল্প সঙ্গতি এবং অতি সীমায়িত শক্তি আমার এই ক্রমবর্দ্ধমান কৌতূহল সার্থকতার পথে পর্ব্বত সরূপ বাধা হইতে থাকে। তরঙ্গের মতই অব্যাহত গতিতে সময় গড়াইতে থাকে, অতঃপর একদিন (আঃ ১৯৩০ সাল) মাতা ভবতারিণীর শ্রীচরণ দর্শনার্থে দক্ষিনেশ্বরে গমন করি। ইহাই আমার তথায় প্রথম গমন। ইতঃপূর্ব্বেই দেবীর মন্দির, পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি, পরমহংসদেব ও স্বামীজীর বিষয় বিভিন্ন পুস্তক পাঠের মাধ্যমে সবিশেষ অবগত হইয়াছিলাম। স্বামীজীর কথা চিন্তা করিতে করিতে প্রণাম নিবেদন কালে প্রার্থনা করিলাম "মা জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বৈরাগ্য দাও," সেই মুহূর্ত্তেই হস্তস্থিত জনৈক বিখ্যাত বিদেশী ঐতিহাসিকের ভারতবর্ষের ইতিহাসখানির অস্তিত্ব অনুভূত হওয়ায় অবচেতন মনেই মাতার চরণে আকুতি জানাইলাম "মা এইরূপ একখানি ইতিহাস যেন লিখিতে পারি।"

এই প্রার্থনান্তে আমার মনে এক দৃঢ় ধারণা হয়, আমি যেন মায়ের আশিস্ লাভ করিয়াছি। সেই ধারণা আমাকে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে উগ্রতর প্রেরণা যোগাইতে থাকে।

তাই যাঁহার অনুকম্পায় আমার সমগ্র জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা আজ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিল, সর্ব্বাগ্রে সেই সর্বশক্তিরূপিনী, অসম্ভব-সম্ভব-কারিণী মা ভবতারিণীর শ্রীচরণে উহাকে অর্ঘ্যরূপে অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম।

মাতৃচরণাশ্রিত

গ্রন্থকার

গ্রন্থ-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ১৩০৮ সালে বঙ্গদর্শন (নব পর্য্যায়) পত্রিকায় 'ব্রাহ্মণ' নামক এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

"আমাদের বর্ত্তমান সমাজের ভদ্র সম্প্রদায়—অর্থাৎ বৈশ্য, কায়স্থ ও বণিক্ সম্প্রদায়—সমাজ যদি ইহাদিগকে দ্বিজ বলিয়া গণ্য না করে, তবে ব্রাহ্মণের আর উত্থানের আশা নাই।...বৈশ্যেরা তো উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে কায়স্থরা বলিতেছেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়, বণিকেরা বলিতেছেন তাঁহারা বৈশ্য—একথা অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ দেখি না। আকার প্রকার, বুদ্ধি ও ক্ষমতা, অর্থাৎ আর্য্যত্বের লক্ষণে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণের সহিত ইঁহাদের প্রভেদ নাই। বঙ্গদেশের যে-কোনো সভায় পইতা না দেখিলে ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থ স্বুবর্ণ বণিক্ প্রভৃতিদের তফাৎ করা অসম্ভব।...বিশুদ্ধ আর্য্য রক্তের সহিত অনার্য রক্তের মিশ্রণ হইয়াছে... কিন্তু সে মিশ্রণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই রহিয়াছে।"

—ব্রাহ্মণ, ভারতবর্ষ, রবীন্দ্র রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩৯৫-৯৬।

পরবর্ত্তী কালেও এই অংশটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে ঈষৎ পরিবর্তিতরূপে তাঁর "স্বদেশ" গ্রন্থে স্থান পায় (১৯০৮)। কোলে মহাশয়ের 'বাঙ্গলার ইতিহাস' গ্রন্থে এই পরিবর্তিত রূপটি উদ্ধৃত হয়েছে (পৃঃ ১৪৬)। যে মনোভাব থেকে রবীন্দ্রনাথ ওই উক্তি করেছিলেন, আলোচ্য বাংলার ইতিহাসখানিও সে মনোভাব থেকেই লিখিত। উক্ত 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে এবং আরও নানা প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, বৌদ্ধ প্রভাবে দেশে যে সমাজ বিপ্লব দেখা দিয়েছিল তার ফলে একমাত্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ব্যতীত আর সব সম্প্রদায়ই একাকার হয়ে গিয়েছিল। কোলে মহাশয়ও এই মতকেই তাঁর গ্রন্থের অন্যতম মূল তত্ত্বরূপে গ্রহণ করেছেন। তবে তাঁর সিদ্ধান্ত পূর্বোদ্ধৃত

রবীন্দ্রনাথের অভিমতের থেকে কিছু পরিমাণে পৃথক্। তাঁর সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তিনি দিয়েছেন গ্রন্থের উপক্রমণিকাতেই। তাতে তিনি এক জায়গায় (পৃঃ ১৷৵০) বলেছেন—

"কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর কাল পূর্ব্বে উপরিউক্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে নানারূপ সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। বৈদ্য ও কায়স্থগণ ঐ আন্দোলনের পথ প্রদর্শক।"

লক্ষ্য করার বিষয় পূর্বোল্লিখিত 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধটিও ওই সময়েরই রচনা (১৯০১)। যা হক, উক্ত সামাজিক আন্দোলনের ফলাফল সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন (পৃঃ ১৷৵০-১৷৶০)

"বৈদ্যগণ নিজেদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়া উপবীত গ্রহণ করিলেন।…সংস্কার পন্থী কোনো কোনো কায়স্থ ঐতিহাসিক আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ হইতে আগত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ কায়স্থ সে মত গ্রহণ করেন নাই।…যে কারণেই হউক তাঁহারা একপদ নামিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিলেন।"

কিন্তু কোলে মহাশয় বিবিধ যুক্তি দেখিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, "কায়স্থগণও ব্রাহ্মণ হইতে আগত জাতি।" যা হক, তাঁর গ্রন্থখানির ভিত্তিভূমি হচ্ছে তাঁর এই প্রাথমিক সিদ্ধান্ত (উপক্রমণিকা পৃঃ ১৷০)।

"বৌদ্ধযুগে যে সকল ব্রাহ্মণ উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহারা বৈদ্য ও কায়স্থ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যে সকল ক্ষত্রিয় উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহারা মাহিষ্য, সদ্‌গোপ, গোপ ও উগ্রক্ষত্রিয় এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত, আর যে সকল বৈশ্য উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহারা নবশাখ নামে অভিহিত।"

এই সিদ্ধান্তকে স্বীকার্যরূপে গ্রহণ করেই তিনি এই গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। এই সিদ্ধান্তটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আরও বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন, কারণ এর পক্ষে তথা বিপক্ষে আরও অনেক তথ্য ও যুক্তি উপস্থাপিত করবার অবকাশ আছে। কিন্তু গ্রন্থকার সে দিকে অগ্রসর হন নি, কারণ তাঁর মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় এটি নয়। তাঁর মতে "বাঙ্গলা

দেশের ইতিহাস বলতে মাহিষ্য জাতিরই ইতিহাস" (উপক্রমণিকা পৃঃ ১৶০)। কেননা, "বঙ্গদেশের সুসভ্য সমতল ক্ষেত্রে যতগুলি প্রাচীন রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁহাদের অধিকাংশের পরিচয় মহাভারতে ক্ষত্রিয় রাজবংশ বলিয়া উল্লেখ আছে, তাঁহাদের প্রত্যেকটির বংশধরগণ বর্ত্তমানে চাষী কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য নামে পরিচিত" (ঐ পৃঃ।৴০ এবং ১৶০)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত বাংলার ইতিহাস প্রথম খণ্ডে কৈবর্ত্ত-মাহিষ্য সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে (পৃঃ ৫৯১-৯২)।

The revolt in Northern Bengal during the reign of Ramapala and the rule of Divya and his two successors indicate the importance of the Kaivarta Caste to which they belonged···According to ancient smritis the offspring of a Kshatriya father and a Vaisya mother is known as Mahisya whose origin is thus identical with that of Kaivarta as given in the Brahma-vaivarta. These ancient accounts serve to explain the present state of things in Bengal. The Mahishyas of Eastern Bengal···are now regarded to be the same as the chashi Kaivartas of Midnapur and other districts of western Bengal. Both of them form important sections of the Hindu Community. There are many Zamindars and substantial land-holders among them and in Midnapore they may be regarded among the local aristocracy. This position is fully in keeping with the part played by them during the Pala rule······The Kaivartas were from ancient times divided into two sections, the Cultivators and fishermen.

বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর বাংলা দেশের ইতিহাস" গ্রন্থে বলেছেন (পৃঃ ১৭৮)—

"কৈবর্ত্ত জাতি সম্বন্ধে বল্লাল চরিতে অনেক কথা আছে, কিন্তু এ সমুদয় কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নহে।···দিব্য, রুদোক ও ভীম এই তিনজন

কৈবর্ত্ত রাজা বরেন্দ্রে রাজত্ব করেন, সুতরাং রাজ্যে ও সমাজে কৈবর্ত্ত জাতির যে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।… কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য সম্ভবতঃ একই জাতি, কারণ উভয়েরই স্মৃতি ও পুরাণে ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্যা মাতার সন্তান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের পূর্ব্ববঙ্গের মাহিষ্য এবং পশ্চিম বঙ্গের চাষী কৈবর্ত্ত এক জাতি বলিয়া পরিগণিত। ইঁহাদের মধ্যে অনেক জমিদার ও তালুকদার আছেন এবং মেদনীপুর জিলায় ইঁহারা খুব সম্ভ্রান্ত শ্রেণী। কিন্তু আর এক শ্রেণীর কৈবর্ত্ত ধীবর বলিয়া পরিচিত এবং মৎস্য বিক্রয়ই ইহাদের ব্যবসায়।… সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কালের ন্যায় প্রাচীন কালেও কৈবর্ত্ত জাতি হালিক ও জালিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।… বাঙ্গলার আরও অনেক জাতির মধ্যে ঐরূপ উচ্চ নীচ শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়।”

এই মতের সঙ্গে বর্ত্তমান গ্রন্থকারের মতের খুব বেশি পার্থক্য নেই। শাস্ত্রানুসারে পুত্র পিতার বর্ণভুক্ত হয়। সুতরাং মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত সম্প্রদায় ক্ষত্রিয় বলেই স্বীকার্য্য। তাঁর মতে বৈদ্য কায়স্থরাও ব্রাহ্মণ; মাহিষ্য-কৈবর্ত্তদের স্থান তার পরেই এবং এঁরা বাংলার প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজবংশ-গুলিরই বংশধর। প্রাচীনকালে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সর্বত্রই মাহিষ্য বা কৈবর্ত্ত ক্ষত্রিয়দেরই প্রাধান্য ছিল। যাঁরা মনে করেন চাষী কৈবর্ত্ত এবং জেলে কৈবর্ত্ত একই গোষ্ঠীর দুটি শাখা মাত্র, গ্রন্থকারের মতে তাঁরা একান্ত ভ্রান্ত। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের অভিমত বর্ত্তমান গ্রন্থকারের অনুকূল। তথাপি প্রশ্ন হতে পারে চাষী এবং জেলে এই দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোককে একই “কৈবর্ত্ত” নামে অভিহিত করা হয় কেন। গ্রন্থকার এই সমস্যার সমাধানেও প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁর মতে কৈবর্ত্ত কে (জলে)+বৃৎ (থাকা) থেকে উৎপন্ন। অর্থাৎ যে জলে বর্ত্তমান সে কেবর্ত্ত। মূলতঃ কৈবর্ত্ত মানে জেলেও নয়, চাষীও নয়; কারণ কৈবর্ত্ত শব্দ বৃত্তিবাচক নয়, অবস্থান বাচক—যারা জলে থেকে কাজ করে তারাই কৈবর্ত্ত। “যেমন জেলেরা জাল লইয়া জলে

গমন করে। মাঝি নৌকা লইয়া জলে গমন করে। চাষী হাল লইয়া জলে গমন করে। সেই ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে, যথা চাষী কৈবর্ত্ত, জেলে কৈবর্ত্ত, মাঝি কৈবর্ত্ত (পৃঃ ৮৵)। কৈবর্ত্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে যতটা যুক্তি দেখিয়েছেন, মাহিষ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে কিন্তু ততখানি যুক্তি দেখাতে পারেন নি। গ্রন্থকারের মতে যারা "মহীকর্ষণ" করে তারা মাহিষ্য, অর্থাৎ মহী+কৃষ থেকে মাহিষ্য। বলা বাহুল্য এটা ব্যাকরণ সংগত নয়। তার চেয়ে ভাল ব্যুৎপত্তি তিনি দেখাতে পারতেন। সেটি হচ্ছে এই। মহিষ শব্দ মূলতঃ মহৎ শব্দ থেকে উৎপন্ন। মহিষ শব্দের মৌলিক অর্থ প্রধান বা শ্রেষ্ঠ। যেমন 'মহিষী' মানে 'প্রধানা' রাজপত্নী। মহিষাসুর কথার আসল মানে শ্রেষ্ঠাসুর। এমন কি পশু অর্থে মহিষ ও কথারও আসল মানে বৃহৎ বা প্রধান পশু। সুতরাং মাহিষ্য শব্দ সমাজের মুখ্য বা প্রধান সম্প্রদায় অর্থাৎ ক্ষত্রিয় থেকে উৎপন্ন; গ্রন্থকার অনায়াসেই এই অর্থ গ্রহণ করতে পারতেন। অবশ্য এই অর্থ সর্বস্বীকার্য্য কিনা সে কথা স্বতন্ত্র।

মোট কথা, গ্রন্থকারের মতে বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত ও নবশাখ সম্প্রদায় সকলেই মূলতঃ আর্য্যবংশ সম্ভূত; প্রথম তিনটি ব্রাহ্মণ, মাহিষ্যরা ক্ষত্রিয় এবং নবশাখরা বৈশ্য বর্ণের অন্তর্গত। বর্ত্তমান মাহিষ্য-কৈবর্ত্তরা বাংলার প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজগণের বংশধর। বাংলার ক্ষত্রিয়রা একদিকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও উপবীত ত্যাগ করার ফলে শূদ্র বলে গণ্য হয়েছেন, অপরদিকে কৃষির উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করার ফলে সম্পূর্ণরূপে কৃষক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছেন। গ্রন্থকার এই দুটি তত্ত্ব প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যেই এই 'বাঙ্গলার ইতিহাস' রচনা করেছেন এবং প্রাচীন বাংলার সবগুলি ক্ষত্রিয় রাজবংশই বর্ত্তমান মাহিষ্য-কৈবর্ত্তদের পূর্ব্ব-পুরুষ তা দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন। বলা বাহুল্য, তাঁর, এই ইতিহাস আধুনিক কালের খ্যাতনামা ঐতিহাসিকদের রচিত বাংলার ইতিহাস থেকে সর্বতোভাবেই পৃথক প্রকৃতির, এই গ্রন্থের লক্ষ্য আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিই স্বতন্ত্র। তাই তাঁর মতে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ দুই চারিজন নিরপেক্ষ

ঐতিহাসিক বাংলার প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশ করার চেষ্টা করেও "তৎকালীন বাঙ্গলার ইতিহাসের বামপন্থীগণের প্রভাবের চাপে পড়িয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই (পৃঃ ।৶০) শুধু তাই নয় তাঁর মতে আধুনিক কালে যে ধরণের বাংলার ইতিহাস রচিত হচ্ছে তার দ্বারা "দেশের জন সমাজে যে প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ইতিহাস উদ্ধারের বিপরীত ফল প্রদান করিয়াছে" (পৃঃ ১৲)। গ্রন্থকারের এই অভিমত স্বীকারযোগ্য হক বা না হক, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এরকম অভিমতকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা না করে দেশের ইতিহাস সাধকদের ধীরভাবে বিবেচনা করে দেখা কর্ত্তব্য তাদের ইতিহাস সাধনার ফল আশানুরূপ অর্থাৎ জনকল্যানের অনুকূল হচ্ছে কিনা, যদি না হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি ; আর প্রয়োজন হলে আমাদের ইতিহাস সাধনার লক্ষ্য ও আদর্শকে মোড় ফিরিয়ে জনকল্যানের অভিমুখে পরিচালিত করা কর্ত্তব্য। কথাটা একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলা দরকার।

অপ্রীতি অর্জনের ভয়ে আমি সত্যকে এড়িয়ে যেতে বলছি না। সত্য যতই অপ্রিয় হক তাকে নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করা চাই। কিন্তু সত্যও বহুবিধ, সব সত্যই সমান গুরুত্বের অধিকারী নয়, অবস্থা বিশেষে তারও মুখ্য গৌণ ভেদ আছে। যে সত্য কল্যাণমুখী তারই গুরুত্ব বেশি, যা কল্যাণ-অকল্যাণ-নিরপেক্ষ তার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম। যেমন, আকবর কিভাবে আহার বিহার করতেন, তার চরিত্র কিরূপ ছিল, তার চেয়ে তাঁর ধর্মনীতি ও রাজস্বনীতির গুরুত্ব অনেক বেশী। ঐতিহাসিক সত্যের এই গুরুত্ব ভেদ দেশ ভেদের উপরেও অনেকাংশে নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে দীর্ঘকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ "ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে বলেছিলেন, "ইতিহাস সকল দেশের সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়'। অতঃপর তিনি ওই প্রবন্ধে (এবং পরে আরও নানা রচনাতেই) দেখিয়েছেন যে,—ইউরোপে সমাজ গৌণ, রাষ্ট্র প্রধান, তাই সেখানে ইতিহাসের লক্ষ্য রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের প্রতি, পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে সমাজই মুখ্য, রাষ্ট্র গৌণ, সুতরাং এদেশের ইতিহাসের প্রধান লক্ষ্যই হওয়া উচিৎ সমাজ বিবর্তনের বিবরণ, রাষ্ট্র

বিবর্তনের কথা নয়। কিন্তু আমাদের দেশের যে-সমস্ত ইতিহাস রচিত হচ্ছে তাতে রাষ্ট্রের কথাই প্রাধান্য পায়, সমাজের কথা গৌণ বলে স্বীকৃত হয়। রাষ্ট্রের ইতিহাস অবশ্যই উপেক্ষনীয় নয়, কিন্তু সমাজের বিবর্তন কাহিনীকে প্রাধান্য দিলেই আমাদের দেশের ইতিহাস রচনা সার্থক হ'য়ে উঠবে, অর্থাৎ ঐ ইতিহাসের মধ্যেই আমরা আমাদের চিরন্তন স্বদেশকে স্বরূপে উপলব্ধি করতে পারব। আলোচ্য গ্রন্থখানির সিদ্ধান্ত সমূহ অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকগণের কাছে স্বীকার্য্য হক বা না হক, ধৈর্য্য সহকারে বইখানি পড়লে একথা উপলব্ধি হবে যে, আমাদের জাতীয় মনের কম্পাসের কাঁটাকে রাষ্ট্র-কথার দিকে ঘুরিয়ে দিলেও সে আপন স্বভাবের প্রেরণায় সমাজ-কথার দিকেই প্রত্যাবৃত্ত হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায় এবং অবিচলিত ভাবে আমাদের জাতীয় ইতিহাস লক্ষ্যের দিক্ নির্দেশ করে। বস্তুতঃ বইখানি পড়তে বসে আমার ঐতিহাসিক বোধ পদে পদেই পীড়িত হয়েছে এবং গ্রন্থকারের অসহিষ্ণু ক্ষুব্ধ ভাষায় অনেক স্থলেই কুণ্ঠিত হয়েছে। তবু ধৈর্য্য সহকারে লেখকের ভাষা ও সিদ্ধান্তের অন্তরালে তাঁর অন্তরের চিরাগত অনুভূতির সত্যতাকে আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করবার প্রয়াসে কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতেই আমার মনে কৌতুহল জেগে উঠলো এবং সেই কৌতূহলের প্রেরণায় বইখানি শেষ করতে আর ক্লেশবোধ হল না, কেননা সহজেই বুঝতে পারলাম যে আমাদের জাতীয় চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমাদের দেশের ইতিহাস রচনা করতে হবে এবং সে প্রবণতা সমাজের দিকে, রাষ্ট্রের দিকে নয়। এখানেই এই গ্রন্থখানির আসল সার্থকতা।

পরিশেষে একথা বলা প্রয়োজন যে লেখক যদি মাঝে মাঝে সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি কটাক্ষ করে কঠোর ভাষা প্রয়োগ না করতেন তাহলে তাঁর এই গ্রন্থ রচনার উক্ত সার্থকতা অধিকতর পরিমাণে উপলব্ধ হত ; আর, সহৃদয় পাঠক যদি উক্ত ত্রুটিগুলিকে গ্রাহ্য না করে, গ্রন্থখানি যত্ন সহকারে পাঠ করেন তাহলে বাংলার ইতিহাস রচনার আদর্শ কি হওয়া উচিত তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন, এই আমার বিশ্বাস।

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন } প্রবোধচন্দ্র সেন
৩০ আশ্বিন, ১৩৬৬

স্বীকৃতি

বিশ্বভারতীর খ্যাতনামা অধ্যাপক এবং ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম্মবিজয়ী অশোক, ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত, India's National Anthem, ধর্ম্মপদ পরিচয়, বাংলার ইতিহাস-সাধনা প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এম. এ, মহাশয় তাঁহার অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া শ্রমসহকারে যে গ্রন্থ-পরিচয় লিখিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

কতিপয় ঐতিহাসিকের বিরুদ্ধ মন্তব্যের প্রতিবাদে কয়েক স্থানে ভাষা একটু কঠোর হইয়া পড়ায় তিনি একদিকে যেমন সেগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া আমার অন্তরের চিরাগত অনুভূতি ও সত্যতাকে আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য পাঠকগণকে যত্নসহকারে গ্রন্থখানি পাঠ করিতে উৎসাহ দিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দরদী অন্তর দিয়া পত্রান্তরে আমাকে জানাইয়াছেন "আপনার ক্ষুব্ধভাষা অন্যের কঠিন ভাষার প্রতিক্রিয়া-জাত, তা আমি জানি।...ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই ভাষার একটু পরিবর্ত্তন করে দিলে ভাল হবে।"

আমি কোন সম্প্রদায়ের প্রতিই বিদ্বেষভাব পোষণ করি নাই। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকল সম্প্রদায়ের প্রতি আমার কত গভীর শ্রদ্ধা এবং সেই শ্রদ্ধার জন্য তাহাদের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিতে যে প্রচেষ্টা করিয়াছি তাহা পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, যাঁহারা গ্রন্থখানি যত্নসহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন। ঐতিহাসিক বিশেষের বিরুদ্ধ মন্তব্যের প্রতিবাদে অনবধানতাবশতঃ কয়েকটি স্থলে ব্যক্তির পরিবর্ত্তে সম্প্রদায়গতভাবে অনভিপ্রেত ভাষা প্রয়োগ হইয়া গিয়াছে এবং কঠিন ভাষার প্রতিবাদে কঠিন ভাষা প্রয়োগ করা আদর্শ নহে, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা সত্ত্বেও যে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে তজ্জন্য আমি সত্যই দুঃখিত। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে ঐ ভাষাগুলি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করিয়া দিবার একান্ত ইচ্ছা রহিল।

গ্রন্থকার

উৎসর্গ

যে পুণ্যশীলা মহিলা একটি পৌত্র লাভার্থ ব্যাকুলা হইয়া
গয়াধামে শ্রীগদাধরের পাদপদ্মে ধর্ণা দিয়াছিলেন
এবং দেবানুকুল্যে প্রাপ্ত বিশ্বাসে সেই বাঞ্ছিত পৌত্রকে
অতি সন্তর্পণে লালন পালন করিবার
পূর্ণ ব্যবস্থা সম্পাদনের পূর্ব্বেই,
সেই পৌত্রের মাত্র ছয়মাস বয়ঃক্রমকালে
অতৃপ্ত অন্তরে স্বর্গতা হইয়াছিলেন
সেই পরমারাধ্যা পিতামহী **কামিনী দেবী**

ও

যে পূতস্মৃতি, তীর্থবিলাসিনী,
সমগ্র জীবন দোল দুর্গোৎসবে নিরতা, দানশীলা মহিলা
তাঁহার সমগ্র সম্পত্তির ভার ন্যস্ত করিয়া,
আমাকে সংসার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া
ইহধাম ত্যাগ করিয়া যান
সেই পরম কল্যাণকামিনী মাতামহী **কাদম্বিনী দেবী**

এবং

যে পূতচরিত্রা, একনিষ্ঠা সমাজ সেবিকা
আমাকে অকৃত্রিম অপত্যস্নেহে লালন পালন করিয়াছিলেন
সেই স্বর্গতা পিতৃস্বসা **মোক্ষদা দেবীর**
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে
জন্মভূমির এই ক্ষুদ্র ইতিহাসখানি উৎসর্গ করিয়া
ধন্য হইলাম।

সূচীপত্র

নিবেদন

কোন এক ব্যক্তির দ্বারা সমগ্র বিষয়ের সত্যানুসন্ধান পর্য্যবেক্ষণ ও প্রমাণাদি সংগ্রহপূর্ব্বক ইতিহাস রচনা যে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। বাঙ্গালার ইতিহাস রচনায় যাঁহারা পথিকৃৎ ও যাঁহাদের শ্রম ও সাধনায় বাঙ্গলার ইতিহাসের বহু সত্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, এই গ্রন্থ রচনায় আমি তাঁহাদের লব্ধ বিষয়কে উপাদান হিসাবে গ্রহণ না করিয়া পারি নাই। কবিগুরুর ভাষায় বলা যায় যে—

"যেখানেই যে তপস্বী করেছে কঠিন যজ্ঞ যাগ,
আমি তার লইয়াছি ভাগ।"

যে সকল গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তাঁহাদের ঋণ শোধ করা যায় না। তথাপি অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি সেই সকল গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যে অর্পণ করিতেছি। বিভিন্ন গ্রন্থসকল হইতে উদ্ধৃত বিবরণগুলি গ্রন্থকারের নামসহ যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি।

দীর্ঘ অনুসন্ধানকালের মধ্যে সকল গ্রন্থের নাম স্মরণ রাখা হয়তো সম্ভব হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদের বিষয় বস্তু আমার সাধারণ জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সেই আনচ্ছাকৃত অনুল্লেখের জন্য সেই সকল গ্রন্থকারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্যেও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

বাঙ্গলার ইতিহাসের দুইটি জটিলতর বিষয়ের উপর আলোক সম্পাতে আমি (১) Ceylon Tenement ও (২) বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্ম এই দুইখানি গ্রন্থ হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

বাঙ্গলার ক্ষত্রিয়গণ কৃষির উন্নতি কল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া কিরূপে যে সম্পূর্ণ কৃষক জাতিতে পরিণত হইলেন তাহার তথ্য উল্লিখিত প্রথম পুস্তকখানি হইতে পাওয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলার ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সেই ধর্ম্মবিস্তারে সর্ব্বস্ব পণ করার ফলে পরিণামে যে শূদ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন দ্বিতীয় গ্রন্থখানি হইতে তাহার মূলসূত্রটি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। ঐ দুই গ্রন্থের প্রণেতার নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

ক্ষত্রিয়গণের কৃষিবৃত্তি অবলম্বনের এবং দ্বিজ সংস্কার ত্যাগের ইতিহাসের মূলসূত্র উক্ত দুইখানি গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হইলেও চাষী নামের সহিত কৈবর্ত্ত নাম যুক্ত হওয়ার যে জটিলতম সমস্যা কিছুতেই তাহার সমাধান করিয়া উঠিতে পারি নাই। বহুদিন ধরিয়া হতাশায় দিন কাটাইয়াছি। অবশেষে একদিন ডায়মণ্ডহারবারে বেড়াইতে যাই। তখন পৌষ মাস। মাঠে অগণিত নৌকা লইয়া কৃষকগণ ধানের শীষ কাটিয়া তাহাদ্বারা নৌকাগুলি পূর্ণ করিতেছেন। কেহ বা ধানশীষ পূর্ণ নৌকা লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছেন। সেই দৃশ্যটি দৃষ্টিপথে পড়িবামাত্র আমি আমার ঐ সমস্যা সমাধানের সূত্র পাইলাম। ডায়মণ্ডহারবারে বেড়াইতে যাওয়ার মধ্যে আমি যেন মা ইচ্ছাময়ীর এক প্রচ্ছন্ন ইচ্ছার আভাষ পাইলাম। ঐ দৃশ্যটি যে আমার সমস্যা পূরণের অনুকূলে মায়েরই ইঙ্গিত তাহা সমস্ত অন্তর দিয়া আমি অনুভব করিলাম। বহু অনুসন্ধানের বস্তু সহসা এত সহজে প্রাপ্ত হওয়ায় আমার চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইতে লাগিল, সমস্ত শরীর

রোমাঞ্চিত হইল। আমি তদ্‌গত চিত্তে মা ভাবতারিণীর শ্রীচরণোদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ মস্তক অবনত করিতে লাগিলাম। চাষী নামের সহিত কৈবর্ত্ত নাম কেন যুক্ত হইয়াছে এতদিন তাহা আমার নিকট সহজ-বোধ্য হইল।

যাঁহার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমি সাধন ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছি সেই আদর্শ পুরুষ, চন্দননগরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবীনকর্ম্মী, শহীদ কানাইলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও জীবনীকার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে, হরিপাল গুরুদয়াল বিদ্যালয়ের প্রবীন ইতিহাস শিক্ষক ও হরিপালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দোপাধ্যায় এবং উক্ত বিদ্যালয়ের জনপ্রিয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ দে (বাঙ্গলায় অনার্স ডিগ্রী প্রাপ্ত) এই গ্রন্থ প্রণয়ণে আমাকে যে উৎসাহ ও সাহায্য দান করিয়াছেন তাহা অবিস্মরণীয়। ইঁহাদের সহিত আমার আত্মীয়বৎ যে সম্বন্ধ বিদ্যামান তাহার জন্য ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আমার তৃতীয় জামাতা শ্রীমান যুগলচন্দ্র বাড় বি. এ. ও কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীমান গৌরীপদ কোলে বি. এস. সি. আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই জন্য অধিকন্তু হইলেও ইহাদিগকে আমার সস্নেহ আশীর্ব্বাদ না জানাইয়া পারিতেছি না।

আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীমান বটকৃষ্ণ পাল বি. কম. গ্রন্থখানির মুদ্রনে সাহায্য করিয়া আমাকে অনেকটা নিশ্চিন্ত করিয়াছেন তজ্জন্য তাহাকেও আমার সস্নেহ আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি।

এই গ্রন্থের মুদ্রাকর শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না মহাশয় মুদ্রন ব্যাপারে যে সহৃদয় সাহায্য করিয়াছেন আমি তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

নানারূপ কর্ম্মব্যস্ততার জন্য এবং প্রুফ সংশোধন ব্যাপারে নিজের দক্ষতার অভাবের জন্য পুস্তকে বহু বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। গ্রন্থ শেষে একটি শুদ্ধিপত্র সংযোজিত হইয়াছে, তথাপি তাহা যথেষ্ঠ হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। এই ত্রুটির জন্য আমি পাঠকগর্গের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। অনবধানতা বশতঃ যদি আর কিছু ভুল থাকে সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে তাহা দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করিয়া দিব।

ভগীরথ কুটির
গোপীনগর (হরিপাল)
পোঃ—ব্রাহ্মণপাড়া, হুগলী
মহাষ্টমী ১৩৬৬ সাল

শ্রীগদাধর কোলে

উপক্রমণিকা

'বাঙ্গলার ইতিহাস' এই কথাটি শুনিয়া একশ্রেণীর লোক ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন, আর একশ্রেণীর লোক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন। যাঁহারা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন তাঁহারা বলেন যে, ইতিহাস বলিতে সাধারণতঃ রাজরাজড়ার কাহিনী, আর বাঙ্গলাদেশের তথা ভারতবর্ষের রাজরাজড়ার কাহিনী বলিতে হইলে আর্য্যজাতি ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিষয় বলা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। বাঙ্গলার ইতিহাসে সে আলোচনার কি সার্থকতা আছে? স্মার্ত্ত রঘুনন্দন স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, এদেশে মাত্র দুইটি জাতি—ব্রাহ্মণ আর শূদ্র। আর শূদ্র বলিতে অনার্য্য জাতি, ওরফে কোল, ভিল, সাঁওতাল ইত্যাদি। আর ঐতিহাসিকগণও বলিতেছেন যে, আদিশূরের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে অনার্য্য-শূদ্র তথা কোল, ভিল, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতির বাস ছিল। আদিশূর কনৌজ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আর পাঁচজন কায়স্থ আনাইয়াছিলেন। ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণই এদেশে আর্য্যজাতির বসতির সূত্রপাত করেন। আর ঐ যে পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন তাঁহারাও সেই দেশের শবর পুলিন্দ ছাড়া আর কি হইতে পারেন? কারণ তাঁহারা অনুপবীত এবং শূদ্র নামে পরিচিত।

["ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতিই আর্য্য। ইহারা উপবীত ধারণ করেন। শূদ্র অনার্য্য জাতি"। বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বিবিধ প্রবন্ধ।]

আর বাঙ্গলায় তাঁহাদের আদিবাস হইলেও বরং একটা কৈফিয়ত দিবার কারণ থাকিত যে, এদেশ বৌদ্ধ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল সুতরাং কোন আর্য্যজাতি হয়তো দ্বিজ সংস্কার ত্যাগ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু যেহেতু তাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মের খাঁটী পীঠস্থান কনোজ হইতে

বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে এদেশে আসিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের শূদ্রত্বের পরিচয়ে খাঁটী অনার্য্য ব্যতীত আর কি হইবে? স্বগোত্রীয়গণকে বঞ্চিত করিয়া, পঞ্চ ব্রাহ্মণের তল্পী বহনের পুরস্কার স্বরূপ ভদ্র সম্প্রদায় বলিয়া যে প্রচার করিয়া আসিতেছেন, তাহা ইতিহাস বিচারের কোষ্ঠীপাথরে টিকিতে পারে না। কারণ জাতিগত ভাবে শূদ্র যদি ভদ্র হয়, তাহা হইলে আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাসের ভিত্তি ধ্বসিয়া যাইবে। একথা তো প্রাথমিক শ্রেণীর বালকগণও জানে যে শূদ্র শব্দের বিপরীত শব্দ ভদ্র (আর্য্য)।

আর যে আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন, তাহারও আদি, অন্ত কিছুই পাওয়া যায় না। তিনি ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন, এই কথা মাত্র উল্লেখ আছে। তিনি যে তাঁহাদের সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন, একথার উল্লেখ কোথাও নাই। সুতরাং তিনিও এদেশের আদিম অধিবাসী শবর, পুলিন্দ প্রভৃতির একটা ব্যতীত আর কি হইতে পারেন? আর শেষের রাজবংশ, সেনবংশ, তাঁহাদের অবস্থাও তদনুরূপ। তাঁহারাও ছিলেন বৈদ্য, সঙ্কর শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত। আবার সেনরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন আসিয়াছিলেন, দ্রাবিড় দেশের কর্ণাট প্রদেশ হইতে, সুতরাং সে স্থানের শূদ্র বলিতে তদ্দেশীয় গলায় ঘণ্টা বাঁধা লোক ব্যতীত আর কি হইতে পারেন? তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন পালরাজাদিগের গোলামী করিতে, শেষে গোলামী পদের ক্রমোন্নতিতে প্রভু মদনপাল বিষপ্রয়োগে নিহত হইলে, তাঁহার রাজ্যটি দখল করিয়া, প্রভুর জাতিকে বৌদ্ধ বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়া কতই হৈ চৈ করিলেন, যে হৈ চৈ এর স্রোত এখনও থামে না। আর যখন রাজা হইয়াছেন তখন ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় একটা কিছু না হইয়া

ছাড়িবেন কেন? কিন্তু সত্য স্বরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় নাই। আর অদূর ভবিষ্যতে মুসলমান শাসনে সবদিকেই বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। তখন হিন্দুয়ানি রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর আবার জাতির বড়াই করা সুদূরপরাহত। ইংরাজ আমলে তাঁহাদের বংশধরগণ, বেশ একটু গজাইয়া উঠিয়া আবার 'কেঁচে গণ্ডুস' আরম্ভ করিলেন।

সব আন্দোলনের মূলে একটি ঘাত প্রতিঘাত প্রয়োজন। শুনা যায় কলিকাতার কোন এক বিশিষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তির মাতৃশ্রাদ্ধে সেই ঘাতপ্রতিঘাতের সূত্রপাত হইল। কাহাদের ভোজনের আসন আগে হইবে এই লইয়া বৈদ্য ও কায়স্থ এই দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। সেই লইয়া জাতির পাঁজি, পুঁথির কত বিরাট অভিযান চলিল। একদল ক্ষত্রিয় হইলেন আর একদল তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণ হইলেন, উপবীত গ্রহণ করিলেন। দেশের লোক তাহা শুনিবে কেন? আজকাল পাতা কয়েক ইংরাজী পড়িয়া সবাই ঐরূপ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

যদি জাতির পাঁজি পুঁথি দেখিতে চাও তবে পূর্ব্বের সেই অন্ধকারের যুগে, সেই সামাজিক গোঁড়ামির অন্ধকারে ফিরিয়া চল। সব জিনিসেরই ভাল মন্দ দুইটি দিক আছে। অন্ধকারেরও একটা মূল্য আছে। হীরা মানিক চিনিতে প্রয়োজন হয় সেই অন্ধকারের। অন্ধকারে কার জ্যোতি কম আর কার জ্যোতি বেশী তাহা ভালভাবে চেনা যায়। তেমনি সামাজিক মর্যাদা চেনা যায় সেই গোঁড়ামির অন্ধকারে। সেই যুগের সামাজিক মর্য্যাদাই হইবে খাঁটি সামাজিক মর্য্যাদা।

ইতিহাস রচনা করিতে হইবে জাতির অতীত গৌরব লইয়া। যাহাদের অতীত কাল এইরূপ হীন, পরিচয়ের অযোগ্য,

তাহাদের ইতিহাস লিখিতে যাওয়া, মূর্খতার পরিচয় দেওয়া মাত্র। এই হইল এক শ্রেণীর মত। অন্যশ্রেণীর হইলেন তাঁহারা, যাঁহারা, পূর্ব্বে অন্ধকারের যুগে, অন্য কতকগুলি স্বগোত্রীয়কে প্রবঞ্চিত করিয়া নিজেদের সুবিধা সুযোগ একটু বেশী করিয়া ভোগ করিতেছেন। বাঙ্গলার সত্য ইতিহাসকে ঢাকা দেওয়াই হইল তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টা। তাঁহাদের মহলে ঐতিহাসিক বাক্‌চাতুর্য্যের গভীর আবরণে বাঙ্গলার ইতিহাসকে যিনি যত বেশী ঢাকিতে পারিবেন তিনিই ততবড় ঐতিহাসিক পণ্ডিত বলিয়া গন্য হইবেন। "মরে না মরে না কভু সত্য যাহা, শত শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে," কবিগুরুর এই কথা স্মরণ করিরা তাঁহারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত হইয়া আছেন, কোন্ দিক দিয়া, কোন্ মুহূর্ত্তে 'পূজ্য অতিথির বেশ ধরিয়া সেই সত্য দ্বারে উপস্থিত হইবে'।

অবশ্য আধুনিক ধরণের ইতিহাস লেখার প্রচলন পূর্ব্বে এদেশে ছিল না। মুসলমান যুগে শিক্ষার অভাবে দেশবাসীগণ ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। কোন্ অনাদিকাল হইতে মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতে আগত বিভিন্ন বিজেতার দল, বিজিত দলকে চাপিয়া রাখিবার যে কৌশলগুলি অবলম্বন করিয়াছিলেন সেইগুলিই এক প্রকার সামাজিক স্তরের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহা ছাড়া আর এক প্রকার সামাজিক স্তরের সৃষ্টি হইয়াছিল আর্য্যগণের স্বেচ্ছাকৃত বর্ণ বিভাগের দ্বারা। পরবর্ত্তী যুগে এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া, অপবাদ দিয়া, কোনরূপে দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজগণের ইতিহাস অনুরাগ দেখিয়া এতদ্দেশীয় কতকগুলি ব্যক্তির ইতিহাস অনুরাগ জাগিল। তাঁহারা কৃতসংকল্প হইলেন দেশের ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্য। এই চেষ্টার ফলে প্রথমেই যাহা পাইলেন তাহাতেই আনন্দে বিহ্বল হইয়া

গাহিলেন "একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়, একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়।" কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে এই আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। উল্লিখিত শেষোক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে শীঘ্রই এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের অভ্যুদয় হইল যাঁহারা ইহা অনুমোদন করিতে পারিলেন না। বাঙ্গলার মৃত ইতিহাসের ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কঙ্কালগুলি সংযোজনা করিয়া যে মূর্ত্তি গঠিত হইল, তাহা দেখিয়াই উক্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণের বিভীষিকার সৃষ্টি হইল। রূপকথার রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র প্রভৃতির অস্থি, মাংস প্রাণ সংযোজনাকারী মন্ত্র পরীক্ষার সিংহমূর্ত্তির ন্যায়। বাঙ্গলার ইতিহাসের সেই মূর্ত্তি বিনষ্ট করা উক্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণের মূলমন্ত্র হইল। তাই বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালীর কীর্ত্তিগুলি ঢাকিয়া দিবার চেষ্টায়, সে গুলির চতুর্দ্দিকে কুয়াশার সৃষ্টি করিয়া, সে গুলিকে নির্দ্দিষ্টভাবে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি বলিয়া স্বীকার না করিয়া অস্পষ্টভাবে ভারতের নামে প্রচলন করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

দেখা যাইতেছে বঙ্গদেশে সুসভ্য সমতল ক্ষেত্রে যতগুলি প্রাচীন রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহাদের অধিকাংশের পরিচয় মহাভারতে ক্ষত্রিয় রাজবংশ বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহাদের প্রত্যেকটির বংশধরগণ বর্ত্তমানে চাষী-কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য নামে পরিচিত। ইউয়ান সাংঙের বর্ণনা আছে যে, "বাঙ্গলাদেশ বহু খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল," সেই প্রত্যেক খণ্ডটিরই রাজা ছিলেন মাহিষ্য ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই সম্প্রদায় ভিন্ন যতগুলি রাজবংশের অস্তিত্ব বর্ত্তমানে বিদ্যমান প্রাচীন আর্য্য সমাজের মধ্যে, তাহাদের প্রত্যেকটির আদি পুরুষ মুসলমানদিগের নিকট হইতে জমিদারীর কবুলতি দিয়া রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের ইতিহাস,

মুসলমান রাজ্য পত্তনের সাহায্য করার অপকর্ম্মের কলঙ্কে কলঙ্কিত। দুর্গাদাস সান্যাল মহাশয়ের "বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাসে" ঐ সকল অপকলঙ্কের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার সবিশেষ বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর হইল না। 'এখন যদি বাঙ্গলার ইতিহাস উদ্ধার করিতে হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, সেন ষড়যন্ত্রের দ্বারা যাহাদিগকে দমন করার চেষ্টা করা ব্যর্থ হইয়াছিল এবং অবশেষে মুসলমানদিগকে ডাকিয়া আনিয়া যাহাদিগকে গলা টিপিয়া নিছক কৃষি মজুর বানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদিগকেই দেবপালের সিংহাসনে বসাইয়া সমগ্র উত্তর ভারতের রাজন্যবর্গের গললগ্নীকৃতবাসে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া থাকার এবং শীলভদ্র ও অতীশ দীপঙ্করের সমগ্র বিশ্বে জ্ঞান বিতরণী সভার বেদীতে বসাইয়া, সমগ্র পৃথিবীর বিদ্বৎমণ্ডলীর শ্রদ্ধার্ঘ্য দানের দৃশ্য দেখিতে হয়। এতবড় চক্ষুশূলের প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা বাঙ্গলার ইতিহাসকে জাহান্নমে পাঠানই শ্রেয়। যে বাঙ্গলার ইতিহাস ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ইতিহাস অপেক্ষা অধিকতর মহিমান্বিত ছিল। সেই ইতিহাস নষ্ট করিয়া বিদ্যালয়ের বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে মারাঠা ও রাজপুত জাতির ইতিহাসরূপ চুষিকাঠি দিয়া ভুলাইয়া রাখা হইতেছে। ইংরাজ রাজপুরুষগণ রাজনীতির দায়ে পড়িয়া, ভারতের অতীত গৌরবকে ঢাকিয়া রাখিবার বহু রকমের অপপ্রচার করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহাদের মধ্যে বহু মনীষী ভারতের অতীত গৌরবের নিকট শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিয়া মুক্তকণ্ঠে তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সার উইলিয়াম উইলকিন্স, সার উইলিয়াম জোন্স, সার এইচ, টি, কোলব্রুক, সার জন মার্শাল, হ্যাভেল, ম্যাকডোনেল, প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এ পর্য্যন্ত একজনও স্বদেশবাসী ঐতিহাসিককে দেখা গেল না যিনি মুক্তকণ্ঠে

অতীত বাঙ্গলার মুখোজ্জ্বলকারিগণের বর্ত্তমান বংশধরগণকে নির্দ্দিষ্ট ভাবে তাহাদের প্রাপ্য সম্মান দান করিয়াছেন। দুই চারি জন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক যথা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দুর্গাদাস লাহিড়ী, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি বাঙ্গলার প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তৎকালীন বাঙ্গলার ইতিহাসের বামপন্থীগণের প্রভাবের চাপে পড়িয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কেবল মাত্র নিষ্ফল আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল আক্ষেপ তাঁহাদের লিখিত ইতিহাসগুলির মধ্যেই স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে। তাঁহাদের মধ্যে আবার কাহাকেও যথেষ্ট অপমানও সহ্য করিতে হইয়াছে। রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

বাঙ্গলার প্রকৃত ইতিহাসকে জাহান্নমে পাঠানোর কৌশলগুলিই বর্ত্তমানকালের কতকগুলি জাতি বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তির মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। সেই মন্ত্রগুলির বিচারই এই স্থলে আলোচ্য বিষয়। উক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া কতকগুলি ঐতিহাসিক মিথ্যা প্রচার আরম্ভ করিলেন যে আদিশূর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনের পূর্ব্বে এদেশে আর্য্যগণের বাস ছিল না ইত্যাদি। তার প্রমাণে বেদ, পুরান, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতিতে দুই চারিটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়া কিংবা কোন কোন প্রাচীন শ্লোকের নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন অর্থ করিয়া বাঙ্গলাদেশের অতীত গৌরবের বিরুদ্ধে নানারূপ অপপ্রচার আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গলার ইতিহাস কতদূর উদ্ধার হইল তাহার সন্ধান কয়জন রাখেন? "ঐতরেয় ব্রাহ্মণে" ঐরূপ একটি প্রক্ষিপ্ত বিবরণ আছে যে, বঙ্গদেশে কেবল মাত্র অনার্য্য—শবর, পুলিন্দ ইত্যাদির বাস ছিল। সেই প্রক্ষিপ্ত বিবরণটি বাঙ্গলার ইতিহাসের বিরুদ্ধবাদীগণের প্রধান অবলম্বন। একজন শ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিকের একটি মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ

করিতেছি। উক্ত বিবরণটি যে প্রক্ষিপ্ত তাহাতে সেই ইঙ্গিতই প্রকাশ পাইতেছে।

["বিশ্বামিত্রের বংশীয়গণ কি করিয়া পুলিন্দ, শবর, অন্ধ্র, পুণ্ড্র ও মুতিব-দিগের পূর্ব্বপুরুষ হইতে পারেন তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক গ্রন্থে এইকথা বলা হইয়াছে। যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়ের কথা মনু কি হিসাবে বলিতেছেন?" বৈদিক আর্য্য ও অবৈদিক আর্য শ্রীননীমাধব চৌধুরী—প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৫৪ সাল, ২০ পৃঃ]

মহাভারতীয় যুগে যে সকল ক্ষত্রিয় রাজবংশের উল্লেখ মহাভারতে দেখা যায় তাহার মূল্যই বা কোথায়? আর একটি বেশ মুখরোচক শ্লোক প্রচলিত আছে যে, "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু চ ···তীর্থযাত্রা বিনাগচ্ছ পুনঃসংস্কারমর্হতি।" এই শ্লোকের অর্থ যদি হয়, বঙ্গদেশ আর্য্য বসতির বহির্ভূত, তাহা হইলে তীর্থস্থান হইল কিরূপে? অনার্যদেশে আর্য্যগণের তীর্থস্থান? একটা মজার কথা বটে! হিন্দুগণ তো মুসলমানদিগের মক্কা তীর্থে যান না।

তারপর হইল দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজবংশগুলিকে অনার্য্য পর্য্যায়ভুক্ত করিতে হইবে। সে দিকেও ছলের অভাব নাই বরং সুবর্ণ সুযোগ। সমগ্র বাঙ্গলার প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজবংশগুলির বংশধরগণ পরবর্ত্তী যুগে জলাভূমিতে ধানের আবাদে মনোনিবেশ করিয়া চাষী কৈবর্ত্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই চাষী কৈবর্ত্ত নামের সুযোগ লইয়া একটি বিপরীত অর্থ আবিষ্কার হইল যে, কৈবর্ত্ত অর্থে ধীবর আর ধীবরগণ চাষ অবলম্বন করায় চাষী কৈবর্ত্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে বাঙ্গলাদেশে এমনি সামাজিক আবহাওয়া যে, কেহ দেশের প্রকৃত ইতিহাস জানুক কিংবা নাই জানুক, কেবল মাত্র এই বীজ মন্ত্রটি আওড়াইতে পারিলেই

বাঙ্গলার ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন। এইরূপ কদর্থের জন্য যাহাদিগকে মূর্খ বলিয়া তিরস্কার করা উচিৎ ছিল, তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগকে ইতিহাসের বড় পণ্ডিত বলিয়া প্রশংসা করা হয়। সুতরাং ঐ শ্রেণীর ঐতিহাসিকের ইতিহাস 'পণ্ডিত মূর্খনাম্ উপাখ্যান' ভিন্ন আর কিছুই নহে। ধীবরগণ নিষাদ জাতির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং নিষাদ যে দেশের রাজা, সে দেশে আর্য্যগণের বাস কিরূপে সম্ভব হইবে ? আর এই মতটি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহার স্বপক্ষে কতকগুলি যুক্তি দেখান আবশ্যক। যুক্তির অভাব কি ? ঈশপ সাহেব বলিয়াছেন "...কোন কালে কোন বিষয়ে যুক্তির অভাবে ঘটে নাই।" এক্ষেত্রে বরং সেই যুক্তির মণি-কাঞ্চন সংযোগ।

বৌদ্ধপ্লাবন সেই মণি-কাঞ্চনের সংযোগ ঘটাইয়াছে। বাঙ্গলায় কতক সংখ্যক ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমগ্র আর্য্য সমাজ দ্বিজ সংস্কার ত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা অনার্য্য—শবর পুলিন্দগণের বংশধর স্থির হইলেন। এ ক্ষেত্রে 'মটরের হড়্‌হড়ানিতে' কেবল মাত্র যে মসুরই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল তাহাই নহে, শ্রেষ্ঠ সোনামুগও পরিত্রাণ পাইল না। অর্থাৎ প্রাচীন রাজবংশগুলির পরিচয় ঢাকিবার জন্য, ক্ষত্রিয়গণের দায়ে বৈশ্যগণই যে কেবল মাত্র আর্য্যত্ব হইতে বঞ্চিত হইলেন তাহা নহে, সেই সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজ সংস্কার ত্যাগী ব্রাহ্মণগণও পরিত্রাণ পাইলেন না। তবে এরূপ নির্লজ্জ বিচারকের একান্ত অভাব হয় নাই এ দেশে, যিনি একই বিধান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বিচার করিয়াছেন। অর্থাৎ উক্ত দ্বিজ সংস্কার ত্যাগী সম্প্রদায় বিশেষকে ভদ্র বলিয়া স্বীকার করিয়া, সম্প্রদায় বিশেষকে অভদ্র বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

কোন কোন সত্যসন্ধ ঐতিহাসিক বাঙ্গলা বিহারের ভৌগলিক অবস্থান দেখিয়া বিস্মিত হন যে, উভয় দেশের মধ্যে কোন প্রাকৃতিক

ব্যবধান নাই, বিশেষতঃ উত্তর বিহার ও উত্তর বঙ্গের মধ্যে, যাহার জন্য সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে যে, বৈদিগ যুগ হইতে বিহারে আর্য্যগণ বসতি স্থাপন করিলেন, কারণ মিথিলা রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় বৈদিক যুগ হইতে অথচ বঙ্গদেশে আর্য্যগণ প্রবেশ করিলেন না? আবার কেহ কেহ কামরূপে ক্ষত্রিয় রাজ্য দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত হন যে, যদি বাঙ্গলায় আর্য্যবসতি সম্ভব না হয় তাহা হইলে কামরূপে সম্ভব হইল কিরূপে। তাহার সমর্থনে যুক্তি মিলিল ইংরাজগণ যে ভাবে ভারতের বিভিন্ন তিনটি স্থানে, বোম্বাই, মাদ্রাজ, ও কলিকাতায় প্রথমে ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছিলেন, সেইরূপে সম্ভব হইয়াছিল। তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? ইংরাজগণ যেমন জলযানের সাহায্যে তিনটি বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছিলেন সেই ভাবে আর্য্যগণ (দেবতাগণ) তৎকালীন পুষ্পরথে করিয়া বিহার হইতে গিয়া কামরূপে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। যুক্তির অভাব কি আছে? এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বৈদিক যুগে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে চন্দ্রবংশীয় রাজা বলি রাজত্ব করিতেন। বহু বৈদিক সূক্তের রচয়িতা দীর্ঘতমা ঋষি তাঁহার সভা পণ্ডিত ছিলেন, ইহা মহাভারতে উল্লেখ আছে। মহাভারতীয় যুগে বঙ্গদেশে ও সুহ্মদেশে ক্ষত্রিয় রাজারা রাজত্ব করিতেন তাহাও মহাভারতে উল্লেখ আছে। কিন্তু যেহেতু পূর্ব্বোক্তশ্রেণীর ঐতিহাসিকগণের নিকট ঐ উল্লেখগুলি স্বার্থ সিদ্ধির অন্তরায়, অতএব তাঁহারা ফতোয়া জাহির করিরা দিয়াছেন যে, মহাভারতের ঐ কথাগুলি বিশ্বাসযোগ্য নহে।

কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই। আদিশূর ও বল্লালযুগের বহু পূর্ব্বের ক্ষত্রিয় রাজরাজড়ার কাহিনীতে সারা বাঙ্গলা মুখরিত। সেগুলিকে চাপা দিয়া রাখা যায় না। মহাভারতের উল্লেখগুলি বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া বিরুদ্ধ প্রচার করিলেও, সেগুলির কোনটি

বিদেশীর ভ্রমণ কাহিণীতে, কোনটি ভারতের অন্য প্রদেশের ইতিহাসে উল্লিখিত।

["অবশ্য আমরা স্বীকার করি ৮ম শতাব্দীর পুর্ব্বে আর্য্যরাজকুল বাঙ্গলায় ছিল এবং উহাদের আনুসঙ্গিক ব্রাহ্মণও থাকিতে পারে। চৈনিক পরিব্রাজকদিগের গ্রন্থে প্রমাণিত হইয়াছে, বাঙ্গলা বহু খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল"। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বিবিধ প্রবন্ধ, বাঙ্গলার ইতিহাস]

ঐ কারণে বাঙ্গলার ইতিহাসের উক্ত বিবরণগুলি লইয়া একটু আলোচনা না করিলে বাঙ্গলার ইতিহাস নিতান্ত অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া পড়ে। সেই কারণে আদিশূর, শশাঙ্ক প্রভৃতি কতকগুলিকে লইয়া (যেগুলির বংশ পরিচয়ের বিশেষ উল্লেখ নাই) বাঙ্গলার ঐতিহাসিকগণ কত গভীর গবেষণা দেখাইয়াছেন। কে কোন্ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন এই লইয়া কত শত তাম্রশাসনের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের বংশধর বা স্বজাতীয় কাহারা তাহা চিন্তা করিবার সার্থকতা কি আছে? নিতান্ত আধুনিক পালবংশ, সাভার রাজবংশ, কমলাঙ্ক ও মেহারকুল রাজবংশগুলির জাতি নির্ণয় নিতান্ত সহজ সরল বলিয়া তাহাদিগকে বৌদ্ধত্বের ছাপ দিয়া দাগি করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। একেবারে সশরীরে বিদ্যমান বিশ্ব-বিখ্যাত তমলুক রাজবংশ, যাহা এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণের চক্ষুশূল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার জন্য পিশাচ সাধকের ন্যায় হান্টার সাহেবের স্কন্ধে ভুত চাপাইয়া বক্তৃতা করাইলেন যে, রাজা নিঃশঙ্কনারায়ণের মৃত্যুর পর কৈবর্ত্তরাজ (fisher king) কালুভূঁইয়া তমলুক সিংহাসনে (কলের পুতুলের ন্যায়) উপবেশন করেন। যাক্, সব অশান্তি দূরীভূত হইল। বাঙ্গলার ইতিহাসের আদ্য-শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গেল। আর কে পায়!

যুগে যুগে কালে কালে সঙ্কীর্ণমনা ব্যক্তিগণ এইভাবে সত্যকে অবলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, পক্ষান্তরে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ

জগতের কল্যাণের জন্য সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে অবিরাম সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গলার ইতিহাস মিথ্যাচ্ছাদিত হইলেও, ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তাহার উজ্জ্বল অতীত গৌরবের ভগ্নাংশ দেশবাসীর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া তাহাদিগকে অমৃতের সন্ধান দিতেছে। তজ্জন্য তাঁহারা উদাত্ত কণ্ঠে বলিতেছেন, 'চাই দেশের ইতিহাস'। সেই সকল সত্যসন্ধ ব্যক্তিগণের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া স্বদেশী মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, "বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি, বাঙ্গালীকে মানুষ করিতে হইলে চাই বাঙ্গলার ইতিহাস, নহিলে বাঙ্গালী মানুষ হইবে না। যে জাতির অতীত গৌরব নাই তাহার আবার উন্নতি কিসের?" তারপর হইতে কত কাল কাটিয়া গেল, কত ইতিহাস লেখা হইল কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় একজনও দেশবাসী নিজেকে চিনিতে পারিলেন না। অসংখ্য তাম্রশাসন, রৌপ্যশাসন, আবিষ্কৃত হইল কিন্তু মানবশাসন আবিষ্কৃত হইল না।

অধুনা ইতিহাস অনুরাগী বহু ব্যক্তিকে বাঙ্গলার ইতিহাস উদ্ধারের অকৃতকার্য্যতার জন্য, ইংরাজ ও মুসলমান ঐতিহাসিকগণকে দোষারূপ করিতে শুনা যায়। তাঁহারা বলেন, ইংরাজ ও মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বাঙ্গলার ইতিহাসকে বিকৃত করিয়া গিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, যদি আমরা মুসলমান ও ইংরাজ শাসন কালের ইতিহাস না পাই তাহা হইলে বাঙ্গলার প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হইয়া পড়িবে? যে ইতিহাস না হইলে বাঙ্গালী মানুষ হইবে না, তাহা কি মুসলমান কিংবা ইংরাজ আমলের ইতিহাস? না বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগের দিক্ দিগন্ত প্রসারিত বাঙ্গলার উদ্দীপ্ত ক্ষাত্রশক্তির শৌর্য্য বীর্য্যের বিজয় কাহিনী, যাহা আমাদের সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করিবে? অবশ্য মুসলমান যুগের প্রারম্ভে বাঙ্গলার ইতিহাসের

কীর্ত্তি কাহিনীর কিছু পরিচয় দিবার থাকিলেও, তাহা তাহার মুমূর্ষু জীবনের ক্ষীণ আক্ষেপবাণী মাত্র। কিন্তু যদি তাহার কৈশোরের বুক্‌ভরা আশার গীতি শুনিতে হয়, যদি তাহার পূর্ণ যৌবনের উদ্দাম কর্ম্ম ক্ষেত্রে দিক্ বিজয়ের চিত্রগুলি দর্শন করিতে হয়, যদি তাহার প্রৌঢ়কালের অভিজ্ঞতাপূর্ণ রাজনীতিকুশলতার পরিচয় লইতে হয়, যদি তাহার বার্দ্ধক্যের বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ মুমূর্ষু তাম্রলিপ্ত, ময়নাগড়, সুজামুঠা, খণ্ডরুই' ভোগবেতাল রাজগণের ভগ্ন সিংহদ্বারে এবং সিংহল পাটন, সাভার, কমলাঙ্ক, মেহারকুল রাজধানীর ধ্বংসস্তূপের উপর ধর্না দিতে হইবে। বাঙ্গলার ইতিহাসের গয়া, গঙ্গা বারাণসী সকলই তাহাদের সহিত জড়িত। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য, সিংহলের মহাবংশ, অজন্তার গিরিগুহা, নেপাল, তিব্বত ও চীনে সংরক্ষিত বাঙ্গলার বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের রাশি রাশি ধর্ম্মগ্রন্থ সেই সত্যের সন্ধান দিবার অনন্ত উৎস। মুসলমান কিংবা ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ কেহই তাহা বিকৃত করেন নাই এবং সেগুলিকে বিকৃত করিবার প্রয়োজনও তাঁহাদের ছিল না। সেই সকল তত্ত্ব সন্ধানের অক্ষমতা কিংবা জাতি বিদ্বেষ-জনিত অশ্রদ্ধা ঢাকিয়া রাখিয়া মিথ্যা অজুহাত দেখাইলে কিরূপে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে? বাঙ্গলার ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহই যে ঐ সকল সত্যের সন্ধান পান নাই তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবকাশ কোথায়? কেহ কেহ সন্ধান পাইয়া তাহার উল্টা অর্থ করিতে গিয়া অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদের বিচার বুদ্ধির প্রবণতা দেখিয়া মনে হয় ঐরূপ বিপরীত অর্থ করিবার প্রয়োজনই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেই প্রয়োজনের কারণ হইল সর্ব্বজন বিদিত শূর ও সেন প্রতিদ্বন্দ্বিতার জের। যাহার জন্য অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু······তীর্থযাত্রা বিনাগচ্ছ

পুনঃসংস্কারমর্হতি, বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ শূদ্র মাত্র দুইটি জাতি ইত্যাদি চোরাবালির সৃষ্টি করা হইয়াছে। সেই জন্যই দেখা যায়, যাঁহারা বর্ত্তমান যুগের উচ্চ শিক্ষিত, যাঁহাদের উপর প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধারের ভার, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সাধারণ সরল বুদ্ধিতে যে সকল তত্ত্ব উদ্ধার হইবে সে পন্থা অবলম্বন করেন নাই। পক্ষান্তরে বিপরীত পন্থার দ্বারা অজ্ঞগণকে তথাকথিত উচ্চ বুদ্ধির পরিচয় দিবার সুযোগও পাইয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে বাঙ্গলার প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজবংশগুলির বর্ত্তমান বংশধরগণ সকলেই চাষী কৈবর্ত্ত নামে পরিচিত। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণ এই 'চাষী কৈবর্ত্ত' শব্দের অর্থ করিলেন কৈবর্ত্ত-অর্থে জেলে, আর যে সকল জেলে জাল ছাড়িয়া হাল ধরিয়াছে তাহাদের নাম হইয়াছে চাষী কৈবর্ত্ত। ইহা, কোন এক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এক উপযুক্ত শিষ্যের "তৈলে পাত্রম" মীমাংসা করার অনুরূপ মীমাংসা।

প্রথমতঃ দেখা যায় উক্ত মীমাংসকগণের শব্দার্থ জ্ঞানের একান্ত অভাব। কৈবর্ত্ত শব্দের অর্থ-কে (জলে) বৃত (থাকা) + অন্ ক + ষ্ণ। অর্থাৎ যে জলে বিদ্যমান আছে, সে কৈবর্ত্ত। কৈবর্ত্ত শব্দের অর্থ জেলে নহে, চাষীও নহে। জলে বিদ্যমান থাকার অর্থজ্ঞানও প্রয়োজন। মানুষ প্রকৃতগত ভাবে জলে বিদ্যমান থাকিতে পারে না, নতুবা তাহাদিগকে কোন জলজন্তু, মৎস্য, কুম্ভীর প্রভৃতির বংশধর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মানুষ, কোন একটা বিশেষ প্রয়োজনে জলে গমন করে। যেমন জেলেরা জাল লইয়া জলে গমন করে। মাঝি নৌকা লইয়া জলে গমন করে। চাষী হাল লইয়া জলে গমন করে। সেই ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির জন্য, ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে যথা, চাষী কৈবর্ত্ত, জেলে কৈবর্ত্ত, মাঝি কৈবর্ত্ত।

দ্বিতীয়তঃ, দেখা যায় চাষী—কৈবর্ত্ত শব্দ অর্থপ্রকাশে স্বতঃসিদ্ধ। জলা গামী চাষী। ইহা সর্ব্বজনবিদিত প্রচলিত কথা, চাষী জলায় গিয়াছেন, ধানের আবাদ করিতে। এখনও পল্লীঅঞ্চলের লোক সর্ব্বদাই এই কথা বলিতেছে। এই কথার অর্থ বাহির করিবার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণকে গবেষণা করিতে হইবে না। 'ধানের জলা,' এই কথাটি এখনও বাঙ্গালীর ভাষা হইতে লুপ্ত হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, দেখা যায় যদি শব্দের বিপরীত দিক হইতে অর্থাৎ শেষের দিক হইতে অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া সাধারণভাবে শব্দের আরম্ভের দিক হইতে অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা করা হইত, তাহা হইলে সাধারণ অর্থ বাহির হইত। যথা চাষী-কৈবর্ত্ত, অর্থ, চাষী জলায় বিদ্যমান।

বিরুদ্ধবাদীগণের কেহ কেহ চাষী-কৈবর্ত্তগণের ধীবর অর্থ প্রতিপন্ন করিবার কারণ, অধিকতর পরিষ্কারভাবে বুঝাইবার জন্য; দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোন কোন জাতি তাহাদের আদি বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি গ্রহণ করায়, তাহারা সেই উভয় বৃত্তিমূলক নামে অভিহিত হইয়াছেন। যথা চাষা-ধোপা, মুচি-তাঁতি ইত্যাদি। এস্থলে উক্ত বিরুদ্ধবাদীগণকে প্রশ্ন করা হইতেছে যে, চাষী-কৈবর্ত্ত এই দুইটি শব্দই কি বৃত্তিমূলক? কৈবর্ত্ত শব্দ স্থানবাচক হিসাবে ব্যবহৃত এবং চাষী শব্দ বৃত্তিবাচক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। তদনুরূপ জেলে কথা বৃত্তিবাচক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে জেলে-চাষী কিংবা চাষী—জেলে প্রচলিত থাকিলে তবে ঐরূপ যুক্তি দেখান সম্ভব হইত। এইভাবে অধিকতর পরিষ্কারভাবে বুঝাইতে গিয়া, বিরুদ্ধবাদীগণ তাঁহাদের অজ্ঞতার গভীরতাকে অধিকতর পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

কেহ যদি এরূপ প্রশ্ন করেন, ক্ষত্রিয়গণ চাষ অবলম্বন করিলেন কেন এবং ক্ষত্রিয়ের চিহ্ন স্বরূপ উপবীত কোথায়? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে বলিতে হইবে, তিনি বাঙ্গলার ইতিহাসে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাঁহার পক্ষে এরূপ তত্ত্বের আলোচনা করা সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চ্চা মাত্র।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে ভূগোল ও ভূ-তত্ত্ব বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এসম্বন্ধে বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত একটি মুল্যবান মন্তব্যের উল্লেখ করিতেছি।

["কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে, সেই দেশের প্রকৃত ধ্যান ধারণা হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এই দেশ কি ছিল? আর এখন এইদেশ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইয়াছে, তাহা আগে না বুঝিয়া ইতিহাস লিখিতে যাওয়া অনর্থ কাল হরণ করা মাত্র।" বঙ্গদর্শণ]

বাঙ্গলার ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ঐরূপ কালহরণকারীর সংখ্যা বিরল নহে। ভূ-তত্ত্বে গভীর জ্ঞান দূরে থাকুক, প্রাথমিক ভূগোলে আদৌ জ্ঞান নাই, এইরূপ একশ্রেণীর টোলো পণ্ডিতগণই বাঙ্গলার ইতিহাসের বড় বড় সমস্যা লইয়া বড় বড় মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা দেশের জনসমাজে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ইতিহাস উদ্ধারের বিপরীত ফল প্রদান করিয়াছে।

ভূ-তাত্ত্বিকগণ বলিতেছেন যে, উত্তর ভারতের সমগ্র গাঙ্গেয় সমতল-ভূমি পুরাকালে টেমিস সাগর নামে এক বিপুল জলধির অংশ ছিল, যাহার অবশিষ্ট এখন ভূ-মধ্য-সাগর। সুদূর অতীতে, প্রবল ভূ-কম্পনের ফলে সমুদ্র উত্থিত হইয়া নিম্ন জলাভূমিতে পরিণত হয়। প্রথমে সমুদ্রের জোয়ারের জল প্রবেশ করিত, পরে হল্যাণ্ডের ন্যায় বাঁধ বাঁধিয়া তাহা রোধ করা হইয়াছে। ইহা বৈদিক আর্য্যগণের এবং অবৈদিক আর্য্য-গণের সম্মিলিত চেষ্টার ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। পুরাণে এই বিষয়টি "দেব ও দৈত্যগণের সমুদ্র মন্থন" নামে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া মনে

হয়। আর্য্যগণের এদেশে আগমনের প্রাক্কালে, তাঁহাদের অসীম ধৈর্য্যের ও চেষ্টার ফলে সেই নিম্ন জলাভূমিতে ধান চাষের প্রবর্ত্তন হয় এবং তৎসঙ্গে এতদ্দেশীয় আর্য্য চাষীগণের নাম হয় চাষী-কৈবর্ত্ত। এই কারণে সমগ্র উত্তর ভারতের সমতল ক্ষেত্রে চাষী-কৈবর্ত্তগণের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা বিদ্যমান।

উপরোক্ত যুক্তিটি এরূপ সুস্পষ্ট ও দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সে বিষয়ে চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। উক্ত অঞ্চলের মধ্যে ঠিক যতটুকু অংশ পূর্ব্বে সমুদ্রের অংশ ছিল এবং পরবর্ত্তীযুগে পলিমাটি দ্বারা ভরাট হইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ সমতল ভূমিতে পরিণত হইয়াছে কিংবা জলাভূমির আকারে আছে, ঠিক ততটুকু স্থানের আর্যচাষীগণের নাম হইয়াছে চাষী-কৈবর্ত্ত। আর যতটুকু অংশে ঐরূপ জলাভূমি কস্মিনকালে ছিল না অর্থাৎ যে স্থানের উপরিভাগ প্রস্তরময় ভূমি বিশিষ্ট (Rock degraded soil) সেখানে এই জাতির অস্তিত্বই দেখা যায় না। একটি ক্ষুদ্র মহকুমার মধ্যেও উক্ত ভূমি অনুসারে ঐরূপ পার্থক্য দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আরামবাগ মহকুমার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলেও ঐরূপ পার্থক্য বিদ্যমান। খানাকুল থানার এলাকায় ধানের জলা বিদ্যমান, সুতরাং সেখানে চাষী-কৈবর্ত্তগণ বিদ্যমান। আর গোঘাট থানার সীমার মধ্যে ওরূপ জলাভূমি নাই, সেখানে প্রস্তরময়ভূমি, ভূ-পৃষ্ঠের ২।৪ ফুট নিম্নে পাহাড়ের আকারে প্রস্তর স্তর বিদ্যমান। সেখানে চাষী-কৈবর্ত্তের আদৌ বাস নাই। অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর ভূ-খণ্ড হিসাবে উত্তর বিহারের গাঙ্গেয় সমতলভূমি এবং দক্ষিণে গয়া, হাজারিবাগ প্রভৃতি প্রস্তরময় অঞ্চলের মধ্যে ঐরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বিরুদ্ধবাদীগণকে প্রশ্ন করা যাইতে পারে নাকি, যদি জলা অঞ্চলের ধীবরগণ দলে দলে জাল ছাড়িয়া হাল ধরিয়া চাষী-কৈবর্ত্ত নাম গ্রহন করিতে পারে তাহা হইলে সেই দৃষ্টান্ত ডাঙ্গা অঞ্চলের

একটিও ধীবর গ্রহণ করিতে পারিল না ? উক্ত ডাঙ্গা অঞ্চলে বহু নদ, নদী, হ্রদ, তড়াগাদি বিদ্যমান এবং বহু ধীবরও বিদ্যমান। কিন্তু একটিও চাষী কৈবর্ত্ত বিদ্যমান নাই, ইহার কারণ বুঝিবার শক্তি থাকিলে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ হইত না।

বর্ত্তমানকালে উত্তর ভারতের উক্ত জলাভূমিও গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ নদীগুলির পলির দ্বারা এত ভরাট হইয়া গিয়াছে যে, নালন্দা, সোমপুরী ও জগদ্দল বিহারের ন্যায় দ্বিতল ও ত্রিতল বিহারগুলি মৃত্তিকা প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল এবং উহাদের উপরিভাগ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু এ দেশ এরূপ ভরাট হওয়া সত্বেও বিভিন্ন স্থানে, উত্তর বঙ্গের ও পূর্ব্ব বঙ্গের অধিকাংশ স্থলে, এরূপ গভীর ধানের জলা দৃষ্ট হয়, যেখানে কৃষকগণ ডুবজলে, নৌকা চড়িয়া, দীর্ঘ ধানের বীজ (চারাগাছ) লইয়া গিয়া, এবং ঐ সকল বীজ-গাছের গোড়ায় এঁটেল কাদার ডেলা পাকাইয়া, ধানের জলায় নিক্ষেপ করিয়া আসেন। পূর্ণ বর্ষায় ঐ সকল জলায় ৮।১০ হাত পরিমিত গভীর জল জমে এবং ঐ জলার উপর দাঁড় বিশিষ্ট নৌকা চলে। পৌষ মাসে কৃষকগণ নৌকা চড়িয়া গিয়া ধানের শীষগুলি কাটিয়া লইয়া আসেন। ইহা অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারিবে, দুই আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঐ জলাগুলির গভীরতা কিরূপ ছিল।

দেশ জয়ের পর, আর্য্যগণের মধ্যে ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ই কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। কারণ আর্য্যগণের তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষত্রিয়গণেরই কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিবার সমধিক অবসর ছিল। যুদ্ধ নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল না। সেই কারণেই বঙ্গদেশের সুসভ্য সমতল ক্ষেত্রে যতগুলি ক্ষত্রিয় রাজবংশ ছিল, তাহাদের সবগুলিরই বংশধরগণ চাষী-কৈবর্ত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। সিংহলের মহাবংশে,

বিজয়সিংহের বিবরণে এই সত্যটি উজ্জ্বলভাবে বিকশিত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ক্ষত্রিয়গণের কৃষি বৃত্তি অবলম্বনের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। ভারতের অন্যান্য বহু স্থানে ব্রাহ্মণগণেরও কৃষি বৃত্তি অবলম্বনের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। (জাতিভেদ—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, ১৩২।৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সর্ব্বশেষ অভিযোগ মাহিষ্য জাতীয় শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রতি। বঙ্কিমবাবু বলিয়া গিয়াছেন যে, "প্রত্যেক জাতিকে তাহাদের নিজ নিজ ইতিহাস লিখিতে হইবে। এক জাতির ইতিহাস অন্য জাতি লিখিয়া দেয় না।" বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস বলিতে মাহিষ্য জাতিরই ইতিহাস। সুতরাং সে ইতিহাস মাহিষ্য জাতিকেই উদ্ধার করিতে হইবে। মাহিষ্য জাতির বহু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন কিন্তু তাঁহাদের ইতিহাস অনুশীলনে বিশেষ অনুরাগ দেখা যায় না। নাম মাত্র দুই চারিজনের মধ্যে যাহা দেখা যায় তাহাও নগন্য। তাহা ছাড়া পৌরাণিক বর্ণসঙ্কররূপ ছানি পড়া চক্ষু দিয়া বাঙ্গলার ইতিহাসের সত্য মূর্ত্তি তাঁহারা দেখিতে পান নাই। সেই মূর্ত্তির দিব্য-জ্যোতি যখন চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তখনও সম্পূর্ণরূপে তাহাকে চিনিতে পারেন না। সেই জন্য খাঁটি ক্ষত্রিয়ের পরিবর্ত্তে নিজদিগকে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সংমিশ্রিত জাতি বলিয়া পরিচয় দেন। পক্ষান্তরে এই দুর্ব্বলতার সুযোগে, বর্ত্তমান বাঙ্গলার কতকগুলি ভণ্ড ঐতিহাসিকের হস্তে ধীবর যষ্টি উত্তোলিত দেখিয়া হতভম্ব হইয়া পড়েন, মুখ দিয়া বাক্য স্ফুর্ত্তি হয় না। "যার ধন তার ধন নয়……।" এই দৃষ্টান্তটি উক্তরূপ বাঙ্গলার ইতিহাসে যেরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, তেমনটি বোধ হয় কুত্রাপি সম্ভব হয় নাই। যে ক্ষত্রিয়গণের বাহুবলে, বঙ্গভূমি আর্য্য বাসভূমির যোগ্য হইয়াছিল, তাহাদের বংশধরগণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কি অদৃষ্টের পরিহাস

হইতে পারে? ইহা যেন প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিজিতের অভিসম্পাত, ইতিহাস অনুশীলনে অবহেলার প্রায়শ্চিত্ত।

অবশ্য গভীর দুঃখে পড়িয়াই এইরূপ আক্ষেপ করিতে হইতেছে। এরূপ হতভম্ব হওয়ার অপরাধই বা কি আছে? প্রায় দুই, আড়াই হাজার বৎসরকাল ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভিন্ন নামে পরিচিত, তাহার উপর বৌদ্ধ যুগে দ্বিজ সংস্কার ত্যাগ। সুতরাং এগুলির আবিষ্কার নিতান্ত সহজ কাজ নহে। কেবল মাত্র মাহিষ্য জাতি নহে, মাহিষ্য জাতি অপেক্ষা শিক্ষা দীক্ষায় অধিকতর উন্নত কায়স্থগণও নিজেদের বিজ্ঞান সম্মত অর্থ (প্রকৃতি প্রত্যয় মিল করিয়া) বাহির করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের শূদ্রত্বের খণ্ডনে কোন সন্তোষজনক যুক্তি দেখাইতে পারেন নাই। ইহা প্রত্যেক ইতিহাস অভিজ্ঞ ব্যক্তিই জানেন। শূদ্র নামে পরিচিত হওয়ায় অশূদ্রযাজী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের বাটীতে জল গ্রহণ করেন না। অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদেরই মধ্যে কোন কোন ঐতিহাসিক চাষী-কৈবর্ত্ত জাতির, প্রকৃত প্রত্যয় অনুযায়ী অর্থ নিরূপণ করিবার জন্য কত অনুসন্ধানের অবতারণা করিয়াছেন এবং বিদ্যা বুদ্ধিতে নাগাল না পাইয়া অবশেষে তাঁহাদিগকে ধীবর প্রতিপন্ন করিয়া ঐতিহাসিক বিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। "নিজের চরকায় তেল দিতে পারে না, পরের চরকায় তেল দিতে যায়"—এই প্রবাদ বাক্যের নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? দুর্গাদাস সান্যাল মহাশয়ের সামাজিক ইতিহাসে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সব ঘৃণিত মন্তব্য আছে তাহার উত্তর দিবার বিদ্যা কুলাইল না, কেবল মাত্র চাষী কৈবর্ত্ত জাতির উৎপত্তি বিচার করিতে বিদ্যার জাহির চলিতেছে।

আর কেবল মাত্র কায়স্থ জাতি নহে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত উপবীতহীন বাঙ্গলার সকল আচরণীয় জাতিগুলিরই এই অবস্থা। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন

সঠিক নির্ণয় না করিয়া তাহাদিগকে সৎশূদ্র আখ্যা দিয়া সোনার পাথর বাটি তৈয়ারী করিয়া গিয়াছেন। এই সৎশূদ্রগণই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, আর্য্যগণের তিনটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে? রঘুনন্দনের ন্যায় পুরাণকারগণও কতকগুলি সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে সাধারণ লোকগণ এবং বহু ঐতিহাসিক এই সঙ্করবর্ণ সৃষ্টিকেই জোর গলায় সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে উহা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। আর্য্য সমাজ কোন কালেই ঐরূপ সঙ্করবর্ণ সৃষ্টির প্রশ্রয় দেয় নাই, ইহাই দৃঢ় নিশ্চিত। এ বিষয়ে সংশয়মান হওয়ার আদৌ কারণ নাই। উচ্চ বর্ণের হিন্দু সমাজ বিবাহকালীন উভয় পক্ষের জাতি, কুল, গোত্র, প্রবর যেরূপ নিষ্ঠা সহকারে পরীক্ষা করেন পূর্ব্বে তদপেক্ষা নিষ্ঠা সহকারে পরীক্ষা করিতেন। যাঁহারা একটু অন্তর্দৃষ্টি সহকারে উক্ত বিষয়টি লক্ষ্য করিবেন তাহারাই উহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। আর্য্য সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে ইহা সকলেই জানেন এবং সকল ইতিহাসেই তাহা উল্লেখ আছে। কিন্তু তথাপি তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে বৈশ্য জাতি নয়টি শাখায় বিভক্ত হইয়া নবশাখ নামে অভিহিত। ঐ নয়টি শাখার মধ্যে পরস্পরের বিবাহ প্রথা প্রচলন নাই। সমাজে এইরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাব বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত। এই বদ্ধমূল সংস্কার ত্যাগ করিয়া তাহারা সঙ্করবর্ণ সৃষ্টির প্রশ্রয় দিয়াছে ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? মহাভারতে উল্লেখ দেখা যায়, বৈদিক যুগের প্রথমভাগে, তৎকালীন সমাজের উদার আবহাওয়ায় দুই চারিটি অসবর্ণ বিবাহ ঘটিয়াছিল, কিন্তু সেখানে সন্তান পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐরূপ ভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হয় নাই। আর দলে দলে এক সম্প্রদায়ের পুরুষগণ অন্য সম্প্রদায়ের কন্যাদিগকে বিবাহ করেন নাই।

অনেকে বলেন যে বৌদ্ধ প্লাবন সঙ্করবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু তাহা আদৌ সত্য নহে। বৌদ্ধ প্লাবনে কেবল মাত্র যজ্ঞসূত্রগুলিই ভাগীরথীর পূত সলিলে ভাসিয়া গিয়াছে, তদতিরিক্ত আর কিছুই ভাসিয়া যায় নাই। সমাজ সংস্কার সবই অটুটভাবে বিদ্যমান। তাহা যদি না থাকিত তাহা হইলে অবৈদিক আর্য্যগণ জলাচরণের বহির্ভূত হইয়া থাকিত না। আর ছত্রিশ জাতির অস্তিত্বও থাকিত না। বৌদ্ধ বিপ্লব সম্বন্ধে ঐরূপ একটা বিপরীত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে বর্ণসঙ্করকে মানিয়া লইতে স্বীকৃত তথাপি বৌদ্ধ প্লাবন স্বীকার করিতে ঘৃণা বোধ করেন।

বৌদ্ধ যুগে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। কতক সংখ্যক ব্রাহ্মণ বৈদিক যাগযজ্ঞ পূজা পদ্ধতির প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধার নিমিত্ত উপবীত রক্ষা করিয়া দ্বিজ সংস্কার বজায় রাখিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ উপবীত রক্ষার কোন প্রয়োজন নাই মনে করিয়া ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে উপবীত ত্যাগ করিয়া ছিলেন। পৌরানিক যুগে সমাজ সংস্কারের সময় তাঁহাদের পূর্ব্ব জাতি নির্ণয় প্রয়োজন হইয়াছিল। মনুর প্রদর্শিত যুক্তি "গুণ কর্ম্ম বিভক্তয়ো" হইয়াছিল সেই বিচারের কষ্টিপাথর। উক্ত জাতিগুলি যদিও উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্বের জাতিবৃত্তি, সংস্কার ও সামাজিক মর্য্যাদার ক্রম সবই অটুট ছিল।

ক্ষত্রিয়গণ সেই সকল সামাজিক সংস্কার অধিকতর নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। নিম্নের বিবরণটি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

["আভিজাত্য বিষয়ে দেখা যায় বৌদ্ধ যুগে ক্ষত্রিয়েরাই ব্রাহ্মণের অপেক্ষা উন্নত ও তাই তাঁহাদের সামাজিক অনুশাসনও বেশি কড়া। রাজা ওক্কাক নিজের সুয়োরাণীর সন্তানকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য বড় রাণীর সন্তানদের নির্বাসিত করেন। তাঁহারা হিমালয়ের পাশে এক শাক বৃক্ষের নিকটে

হ্রদের তীরে গিয়া বাস করেন। পাছে তাঁহাদের বংশে হীন রক্তের আমদানি হয় তাই তাঁহারা ভাইয়ে ভগ্নীতে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইলেন তবু হীন জাতির সঙ্গে ক্রিয়া করিলেন না।" (অম্বটঠ সূক্ত ১৬) জাতি ভেদ—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, ৫৭ পৃঃ]

বর্ত্তমান যুগেও উত্তর বঙ্গে এবং পূর্ব্ব বঙ্গে মাহিষ্য সমাজের মধ্যে কড়া সামাজিক অনুশাসন বিদ্যমান। বিশেষতঃ শীলভদ্র ও অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান, বর্ত্তমান ঢাকা জেলায় মাহিষ্যগণ পূর্ব্বের সেই ক্ষত্রিয়াচার সম্যক্ নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া আসিতেছেন। তথায় তাঁহাদের সামাজিক অনুশাসন ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাও কড়া। কিন্তু তথাপি পুরাণকারগণ উপবীতত্যাগী আর্য্যগণকে কি কারণে তাঁহাদের পূর্ব্বের এক একটি নির্দ্দিষ্ট বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য) অন্তর্ভুক্ত না করিয়া কতকগুলি কাল্পনিক সঙ্কর বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করিলেন তাহা আমাদের বিচার বুদ্ধির অতীত। অথচ তাঁহারা যে, যথার্থ বর্ণ নিরূপণ করিতে পারেন নাই সে সন্দেহেরও অবকাশ নাই। কারণ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, উক্ত কাল্পনিক সঙ্কর বর্ণগুলি যে দুইটি বর্ণের মিলনে সৃষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই দুইটির মধ্যে প্রথমটিই (পিতৃবর্ণটি) হইতেছে প্রকৃত বর্ণ। উপবীত হীনতার কারণ অন্য একটি কাল্পনিক বর্ণের সংযোগ করিয়া একটি কাল্পনিক বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুই একটি, নিম্নে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

পুরাণে উল্লেখ আছে ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তানগণ বৈদ্য। কিন্তু বৈদ্যগণ প্রকৃত ব্রাহ্মণ। তাহার কারণ দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গলার বাহিরে, বিহার, সংযুক্ত প্রদেশে একমাত্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা বিদ্যমান। তাহাছাড়া সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন ও অন্যান্য ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মের জন্য এবং সামাজিক ক্রম অনুযায়ী ইহাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে তাঁহারা ব্রাহ্মণ। কবিগুরু, ভারতবর্ষের ভিতরে

সামাজিক ধূলি কলুষিত আবহাওয়ায়, সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গদেশে ঐ কলুষ অধিকতর তীব্র বলিয়াই মনে হয়। সেই কারণে বঙ্গদেশ অপেক্ষা বিহার ও অযোধ্যা প্রদেশে জাতিতত্ত্ব অধিকতর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দেখা যায়। বৈদ্যগণের ন্যায় সুবর্ণ-বণিকগণের উজ্জ্বলতর রূপ দেখা যায় উক্ত প্রদেশদ্বয়ের মধ্যে। সংযুক্তপ্রদেশে সুবর্ণ বণিকগণই, বৈশ্য সম্প্রদায়ের শীর্ষ স্থানীয়। বঙ্গদেশে সুবর্ণ বণিকগণ বাস্তব ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় হইলেও বল্লাল-পন্থীগণের নিকট তাঁহারা হেয় বলিয়া গণ্য।

পুরাণে উল্লেখ আছে ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তানগণ মাহিষ্য কিংবা কৈবর্ত্ত নামে অভিহিত। বঙ্গদেশে সুসভ্য সমতল ক্ষেত্রে যতগুলি ক্ষত্রিয় রাজবংশ ছিল, তাহাদের সবগুলিরই বংশধরগণ, মাহিষ্য বা চাষী-কৈবর্ত্ত নামে অভিহিত। এই জাতি ব্যতীত, উক্ত স্থানে, অন্য কোন জাতীয় রাজবংশ বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং তাহারা যে ক্ষত্রিয়, তাহার জীবন্ত প্রমান বিদ্যমান। অনোপবীত সমস্যা সমাধান করিবার জন্য, বৈদ্যগণের ন্যায় বৈশ্যের সংমিশ্রণ দেখাইয়াছে। এই বৈশ্য সংমিশ্রণ বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা। বৈশ্যগণেরও উপবীত ছিল।

পুরাণকারগণ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন অপেক্ষা একটা প্রকৃত সূত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার কারণ পুরাণের যুগ, রঘুনন্দনের যুগের বহু পূর্ব্বের যুগ। সে যুগে উক্ত জাতিদ্বয়ের আদিবৃত্তি অটুট ভাবে বিদ্যমান ছিল।

বৌদ্ধযুগে যে সকল ব্রাহ্মণ উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহারা বৈদ্য ও কায়স্থ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যে সকল ক্ষত্রিয় উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহারা মাহিষ্য, সৎগোপ, গোপ ও উগ্রক্ষত্রিয় এই কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত আর যে সকল বৈশ্য উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহারা নবশাখ নামে অভিহিত।

কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসরকাল পূর্ব্বে উপরি-উক্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে নানারূপ সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। বৈদ্য ও কায়স্থগণ ঐ আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। কে বড় কে ছোট, এই প্রশ্ন লইয়া উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। সেই দ্বন্দ্ব ঘোরতর আকার ধারণ করিয়াছিল। উভয়েই আপন আপন সমাজ সংস্কারে দৃঢ় সংকল্প করিলেন। পূর্ব্ব উল্লিখিত ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মের নিদর্শন হেতু বৈদ্যগণ, নিজদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া দৃঢ়ভাবে ঘোষনা করিয়া উপবীত গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কায়স্থগণের সম্মুখে এক জটিল সমস্যা উপস্থিত হইল। বৌদ্ধযুগেও কায়স্থগণের মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন ও ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি নানারূপ ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মের নিদর্শন ছিল। অশ্বঘোষ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কায়স্থগণের ঘোষ, বসু, মিত্র উপাধিগুলি স্পষ্ট বৌদ্ধ-সঙ্ঘের উপাধি। কিন্তু মুসলমানযুগে কায়স্থগণের অধিকাংশ, মুসলমান সরকারে চাকুরি গ্রহণ করিয়া আরবী পারসী ভাষার অনুশীলন করায়, সাধারণের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণোচিত আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট বলিয়া গণ্য হন। সেইজন্য তাঁহাদের জাতীয় ইতিহাস অধিকতর কুয়াশাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। দুর্গাদাস সান্যাল মহাশয়ের সামাজিক ইতিহাসে, সেই কারণে, কায়স্থ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ হীন পরিচয়ের উল্লেখ আছে। পুরাণকারগণও তাঁহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। যাঁহারা যথাযথ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, তাঁহারা পরবর্ত্তীযুগের লেখক বলিয়া অনুমান হয়। কারণ কতকগুলি পুরাণ মুসলমানযুগের প্রারম্ভে লেখা হইয়াছিল।

কায়স্থগণের ঘোষ, বসু, মিত্র, বৌদ্ধসঙ্ঘের উপাধি বলায় কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণই কি বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন? অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকও বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ

করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও উক্ত উপাধি দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। কারণ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণই চিরকাল জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া থাকেন, সুতরাং বৌদ্ধসঙ্ঘেও উচ্চস্তরের আচার্য্য ও ভিক্ষুগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক ছিল। ব্রাহ্মণগণের পর জ্ঞানের বিভাগে ক্ষত্রিয়দের স্থান। শীলভদ্র শান্তরক্ষিত, অতীশ দীপঙ্কর, চন্দ্রগোমী, বিভুতিচন্দ্র, পদ্মসম্ভব সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। বেদের জ্ঞানকাণ্ডের অধিকাংশ ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা রচিত। ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়গণের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। রাজর্ষি জনক তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বৌদ্ধসঙ্ঘের কতিপয় সংখ্যক ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ ভিন্ন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধও ছিলেন এবং তন্মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চাকারীগণ (বৈদ্যগণ) ব্যতীত অবশিষ্টাংশ কায়স্থ নামে অভিহিত। পূর্ব্ববঙ্গে বৈদ্যগণের সহিত কায়স্থগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের নিদর্শন হইতে এবং বিভিন্ন বিদ্যানুশীলন বৃত্তি অবলম্বন থাকাতে, ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে কায়স্থগণও ব্রাহ্মণ হইতে আগত জাতি। বৈদ্যগণের ন্যায় কায়স্থগণের একটি নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি না থাকায় এবং কায়স্থগণ উপবীতহীন জাতিগুলির শীর্ষস্থানীয় থাকায়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোলুপ দৃষ্টি তাঁহাদের উপর পতিত হয়। এই উপবীত হীনতার সুযোগ লইয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের বহু লোক আত্মগোপন করিয়া কায়স্থ সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। অবশ্য এরূপ দৃষ্টান্ত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আদৌ নাই তাহাও বলা চলে না।

সামাজিক আন্দোলনের যুগে, সংস্কারপন্থী কোন কোন কায়স্থ ঐতিহাসিক, আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ হইতে আগত জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ কায়স্থগণ সে মত গ্রহণ করেন নাই। এই গ্রহণ না করার কারণ, মনে হয়, বহুযুগ উপবীতহীন অবস্থায়

পূজোপাসনাদি কর্ম্ম হইতে বিরত থাকায়, পুনরায় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন। যে কারণেই হউক তাঁহারা একপদ নামিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিলেন। এই উদ্দেশ্যে, বাঙ্গলার প্রকৃত ক্ষত্রিয়গণকে স্বস্থান হইতে অপসারিত করিয়া সেই শূন্য পদে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হইলেন। সেইজন্য দেখা যায়, স্বাধীন বাঙ্গলায় কায়স্থ সম্প্রদায়ের একটিও রাজবংশের অস্তিত্ব বিদ্যমান না থাকিলেও এবং পক্ষান্তরে প্রত্যেকটি রাজবংশ, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বৈশিষ্টরূপে একমাত্র মাহিষ্য ক্ষত্রিয় (চাষী-কৈবর্ত্ত) সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও মাহিষ্যগণের বিরুদ্ধে অন্যায় অপপ্রচারের বিরাম নাই। এই দুঃসাহসিক কার্য্যে, কেবলমাত্র কায়স্থগণই নিজেদের দায়ে ব্রতী হন নাই। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক ব্রাহ্মণগণও, এ বিষয়ে যথেষ্ঠ সাহায্য করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদেরও একটু আঁতে ঘা ছিল। ইহা গৌড়াদ্য ও সপ্তশতী প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবশিষ্টাংশ। সেইজন্য উভয় সম্প্রদায়ের বহু ঐতিহাসিক, মাহিষ্য ও তৎপুরোধাগণের বিরুদ্ধে নানাভাবে অপপ্রচার করিয়া, ইতিহাস লেখার গরজ তীব্রভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন। জীবন্ত সত্যের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যার এই অভিযান, বাঙ্গলার আকাশ বাতাস কলুষিত করিয়া দিয়াছে।

বাঙ্গলার ইতিহাস

প্রথম ভাগ

বাঙ্গলার ইতিহাসের পূর্ব্বাভাষ

বাঙ্গলা দেশের অবস্থান—উত্তর-ভারতের পূর্ব্ব সীমায় বাঙ্গলাদেশ অবস্থিত। ইহার উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্ব্বে আসাম ও ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ।

বাঙ্গলার ভূ-প্রকৃতি—বাঙ্গলা দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই সমতলভূমি বা নিম্ন জলাভূমি। পূর্ব্বে ইহা বঙ্গোপসাগরের অংশ ছিল। পূর্ব্ব দিকে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব্বাংশ এবং পশ্চিম দিকে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার পশ্চিমাংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও প্রস্তরময়।

প্রাচীন ইতিহাস—কথিত আছে, আদিম যুগে বঙ্গদেশে পুরাণ বর্ণিত দৈত্যরাজ বলির রাজত্ব ছিল। বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলায় বলিরাজের রাজধানী ছিল। বলির পুত্র বাণের নামানুসারে রাজধানীর নাম হয় বাণগড়। দিনাজপুর শহরের অনতিদূরে পুনর্ভবা নদীর তীরে প্রাচীন বাণগড় অবস্থিত ছিল। বাণরাজকন্যা উষার নামানুসারে উষাবন নামে একটি স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। উষার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া পুরাণে উল্লেখ আছে। যে সময়ে আর্য্যগণ মিথিলা রাজ্য স্থাপন করেন সেই সময়েই বঙ্গদেশ আর্য্য রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বিষ্ণুকে ত্রিপাদভূমি দান করিয়া দৈত্যরাজ বলির পাতালে গমন করার যে উপাখ্যান মহাভারতে আছে,

তাহাই ঐতিহাসিকগণের মতে আর্য্যগণের বঙ্গবিজয়। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগে চন্দ্রবংশীয় রাজা বলি রাজত্ব করিতেন, তাহাও মহাভারতে উল্লেখ আছে। এই চন্দ্রবংশীয় রাজা, বলির পঞ্চ পুত্রের নামানুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র—এই পাঁচটি বিভাগে বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া মহাভারতে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর উপলক্ষে ও কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধে পৌণ্ড্ররাজ ও তাম্রলিপ্তিরাজের উপস্থিতির পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে। এই সকল প্রমাণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে, বৈদিক যুগের শেষ ভাগেই বৈদিক আর্য্যগণ বঙ্গদেশ জয় করেন।

দৈত্য-জাতি— মহাভারতে দেব ও দৈত্যের অসংখ্য যুদ্ধের বিবরণ বর্ণিত আছে। অভিনিবেশ সহকারে সেই বর্ণনাগুলি পাঠ করিলে মনে হয়, সমগ্র উত্তর ভারত ঐ দৈত্যজাতির অধিকারে ছিল। আর্য্যগণের প্রতিদ্বন্দ্বী এই দৈত্যজাতিকেই অনেক ঐতিহাসিক দ্রাবিড় নামে আখ্যাত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আদিম মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে দ্রাবিড় সংজ্ঞাবাচক কোনও সম্প্রদায় দেখা যায় না। এই নামটি মনে হয়, এক শ্রেণীর বাঙ্গালী ঐতিহাসিকেরই বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য একটি মধ্য-শ্রেণীর উদ্ভব করা এবং মহেন-জো-দাড়োর সভ্যতাও দ্রাবিড় জাতির সৃষ্টি বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। রিজ্‌লী সাহেবও তাঁহাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া ঐ মত সমর্থন করিয়া ভারত-ইতিহাসে এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ভাষাবাচক দ্রাবিড় শব্দ পরে জাতিবাচক এবং তৎপরে দেশবাচকে রূপান্তরিত হয়। দেশবাচক হিসাবে দক্ষিণ ভারতকে দ্রাবিড় দেশ বলা হইয়াছে। ঐ দেশের আদিম অধিবাসীদিগকে আদি দ্রাবিড় বলে। নিগ্রো-বটু ও প্রায়-অষ্ট্রেলীয় এই দুই আদিম মানব-গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে তাহাদের উৎপত্তি। (ভারতের আদিবাসী—শ্রীসুবোধ ঘোষ ১৬,৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

পরবর্ত্তীকালে আর্য্যগণ দ্রাবিড় দেশ জয় করেন। অগস্ত্য ঋষি আর্য্য উপনিবেশকারীদের পথপ্রদর্শক। রামায়ণের কাহিনী আর্য্যগণের দ্রাবিড় দেশ জয়ের সূত্র ধরিয়া রচিত বলিয়া মনে হয়।

দৈত্যজাতির ইতিহাস বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাহারা আর্য্য জাতিরই একটি প্রাচীন শাখা। রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় যে বৈদিক আর্য্য ও অ-বৈদিক আর্য্য নামে দুইটি বিভিন্ন আর্য্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয়, পূর্ব্বতন শাখাটি অ-বৈদিক আর্য্য এবং পরবর্ত্তী শাখাটি বৈদিক আর্য্য। এই অ-বৈদিক আর্য্যগণকেই পুরাণকারগণ দৈত্য নামে আখ্যাত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মহাভারতে দিতির গর্ভজাত কশ্যপ ঋষির সন্তান বলিয়া উল্লেখ থাকায় তাঁহাদের আর্য্যত্বের স্বীকৃতি পাওয়া যাইতেছে।

সমুদ্র হইতে উত্থিত হইবার পরবর্ত্তী বহুকাল ধরিয়া বঙ্গদেশ সমুদ্রের জোয়ারের জলে প্লাবিত হইয়া যাইত। বৈদিক আর্য্য ও অ-বৈদিক আর্য্য উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত যত্নে বাঁধ দিয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে চাষবাসের উপযোগী করা হইয়াছে। পুরাণে ইহাকেই দেব ও দৈত্যগণের সমুদ্রমন্থন বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে, মনে হয়।

প্রাচীন হিন্দু জাতিগুলির মধ্যে বর্ত্তমানে যাহারা তপশীল পর্য্যায়ভুক্ত তাহারাই উক্ত দৈত্য জাতি বা অ-বৈদিক আর্য্যগণের বংশধর বলিয়া মনে হয়। পরবর্ত্তী যুগে বৈদিক আর্য্যগণদ্বারা বিজিত হইয়া অ-বৈদিক আর্য্যগণ এই অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুগণের মধ্যে উচ্চ নীচের ঘোরতর বৈষম্যের মূলে ইহাই ঐতিহাসিক ভিত্তি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহার পর আর্য্য সমাজে আর কখনও এত বেশী পার্থক্য সৃষ্টির বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া

যায় না। কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীগণ অষ্ট্রিক জাতির বংশধর। বৈদিক আর্য্যগণের দ্বারা বিজিত হইয়া অ-বৈদিক আর্য্যগণ পাতাল অর্থাৎ বাঙ্গলার প্রত্যন্ত প্রদেশসমূহে চলিয়া যায়।

পুরাণে বর্ণিত দৈত্যগণের অপর নাম অসুর। আবার এই নাম পূর্ব্বে দেবগণেরই ছিল।

["ঋগ্বেদ পাঠে দেখা যায়, ইন্দ্রাগ্নি, বরুণ, মিত্রভগ বহুস্থলে বহুবার 'অসুর' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। অসুর শব্দে দৈত্য-দানব বাচক কোনও অভিব্যক্তি আদিতে ছিল না।"

ঋগ্বেদে ৩য় মণ্ডল ৫৫ শং সূক্ত ২য় মন্ত্রে প্রজাপতি ঋষি বলিতেছেন :—

"......মহৎদেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্।"

—বৈদিকতত্ত্বে ভাষাবিজ্ঞান—শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ ৪৬—৫৪ পৃঃ]

পরবর্ত্তী যুগে যাযাবর আর্য্যগণের মধ্যে যাগ-যজ্ঞাদি লইয়া ভিন্ন মতের সৃষ্টি হইলে দুইটি বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়। একদল দেব, আর একদল অসুর নামে অভিহিত হইতে থাকেন।

["অদেবযাজী জ্ঞাতৃবর্গের প্রতি আর্য্য ঋষিদের অভিমান সূচিত হইয়াছে। পরে অভিসম্পাত ও ঘোরতর শত্রুতা বেদে লিপিবদ্ধ আছে।"

......পরবর্ত্তীযুগে পুরাণ আসিয়া তাহার কঠিন দণ্ডের আঘাতে জ্ঞাতিত্বের সেই শেষ স্মৃতিচিহ্নটিও চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিলেন। বাজীকরের ন্যায় পুরাণ অসুর ও মহাসুরের কত ভয়াবহ এবং লোমহর্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। অসুরের অত্যাচারে সর্বংসহা বসুমতীকেও রসাতলে প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ঐ পুস্তক ৫৭, ৫৯, ৬০ পৃষ্ঠা।]

রামায়ণ যুগ—রামায়ণ যুগের কিছু পূর্ব্বে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী তীরস্থ স্থানসমূহে বৈদিক আর্য্য বসতির উল্লেখ দেখা যায়। কপিল মুনির আশ্রম গঙ্গার মোহনায় সাগর

দ্বীপে অবস্থিত ছিল। মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল বীরভূম জেলার তারাপীঠ নামক স্থানে। মহারাজ রঘু দিগ্বিজয় উপলক্ষে বাঙ্গলাদেশে আগমন করিয়াছিলেন এবং সুহ্ম দেশীয় বীরগণের সহিত প্রবল সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন—ইহা রামায়ণে বর্ণিত আছে। ইহা ব্যতীত, রামায়ণে পুণ্ড্রবর্ধন এবং বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ দেখা যায় না। মহাভারতের যুগে সুহ্মের পরিবর্ত্তে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ দেখা যায়।

মহাভারতীয় যুগ—মহাভারতে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর উপলক্ষে এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেব ও তাম্রলিপ্তরাজের উপস্থিতির পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখা যায়। পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসকালে মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে একচক্রা নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে বাস করিতেন। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম তত্রস্থ 'বক' রাক্ষসকে বধ করিয়াছিলেন। বক রাক্ষসের নামানুসারে উক্ত অঞ্চলকে বকৃড়ী পরগণা বলে। বকৃড়ীর দোল উৎসবে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। ইহা হিন্দুদিগের একটি প্রাচীন তীর্থস্থান।

[জৈমিনীভারতে ৪৬ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে তাম্রলিপ্তাধিপতি ময়ূরধ্বজের পুত্র তাম্রধ্বজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ধৃত করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সেই ভীষণ সমরে কৃষ্ণার্জ্জুনকে পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত হইতে হইয়াছিল। বাঙ্গালীর বল ১৬ পৃঃ]

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গমস্থল ত্রিবেণী (মুক্তধারা) এবং সপ্ত-ঋষি অধ্যুষিত সপ্তগ্রাম স্মরণাতীত কাল হইতে আর্য্য ঋষিগণের সাধনার পবিত্র ক্ষেত্র ছিল।

বৌদ্ধ যুগ—বুদ্ধদেবের জীবনের শেষভাগে বিজয়সিংহ লঙ্কাদ্বীপ জয় করেন। বিজয়সিংহ রাঢ় দেশের মধ্যবর্ত্তী সিংহপুর বা সিংহল

পাটন রাজ্যের রাজা সিংহবাহুর পুত্র এবং তমলুকরাজের দৌহিত্রপুত্র ছিলেন। তমলুকরাজ তৎকালে বঙ্গাধিপ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তৎকালে বঙ্গের পাঁচটি বিভাগের মধ্যে তমলুকরাজই প্রভাব-প্রতিপত্তিতে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করায় বঙ্গাধিপ নামে অভিহিত হন। তমলুক গঙ্গার মোহনার নিকট অবস্থিত বলিয়া গ্রীক্‌গণ এই রাজ্যটিকে গঙ্গা-রাষ্ট্র বা গঙ্গারাঢ় রাজ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে গ্রীক্‌বীর আলেকজাণ্ডার পঞ্চনদ জয় করিয়া পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতে মনস্থ করেন কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ গঙ্গারাঢ়ী সৈন্যগণের শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী শুনিয়া পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতে অসম্মত হন। বাধ্য হইয়া আলেকজাণ্ডারকে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতে হয়। এই প্রাচীন রাজবংশটি এখনও বিদ্যমান আছে।

মহাভারতে উল্লেখ আছে, চন্দ্রবংশীয় গৌড়রাজ বলির পঞ্চপুত্রের নামানুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র এই পাঁচটি বিভাগের সৃষ্টি হয়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে পৌণ্ড্ররাজ্যের অরাজকতার কাহিনী শোনা যায়। পৌণ্ড্রবাসীগণ সকলে মিলিয়া সমতটের (বঙ্গের) রাজভট্টবংশীয় যুবরাজ গোপালদেবকে গৌড়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া উত্তর বঙ্গকে অরাজকতার কবল হইতে রক্ষা করেন। গোপালদেবের রাজনীতি-কুশলতায় শীঘ্রই উত্তর বঙ্গে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে। প্রাচীন গৌড়রাজ্যের অতীত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। গোপালদেবের পুত্র ধর্মপালদেব কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত এবং তৎপুত্র দেবপালদেব সমগ্র উত্তর ভারত জয় করেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পালবংশীয় নৃপতিগণ বঙ্গদেশ শাসন করেন। তাঁহাদের শাসনগুণে দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কলা ইত্যাদির চরম উন্নতি হয়।

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায়, তৎকালে গৌড় ও কর্ণসুবর্ণে পরম শৈব শশাঙ্ক এবং সমতটে এক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী রাজা রাজত্ব করিতেন। বঙ্গদেশ তখন বহু খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল।

প্রাচীন গৌড় বর্ত্তমান মালদহ জেলায় অবস্থিত। ইহা সমগ্র উত্তর বঙ্গের (পুণ্ড্রবর্দ্ধনের) রাজধানী ছিল এবং মিথিলার ন্যায় উত্তর ভারতের একটি প্রাচীন নগর ছিল। তৎকালীন গৌড়রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনুসারে সমগ্র বঙ্গদেশ গৌড় নামে অভিহিত হইত।

সমতট— প্রাচীন বঙ্গ রাজ্যই মধ্যযুগে সমতট রাজ্য নামে অভিহিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহাকে পূর্ব্ববঙ্গ ও সেখানকার অধিবাসীদিগকে "পূর্ব্ববঙ্গবাসী" বলে। ইহা মধ্যযুগে রাজধানী সাহুর বা সাভারের নামানুসারে সাভার রাজ্য বলিয়াও আখ্যাত হইয়াছিল। ঐ সাভারের রাজভট্ট বংশীয় গোপালদেব উত্তর বঙ্গে অরাজকতার সময় তত্রস্থ প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই প্রাচীন রাজবংশটি এখনও বিদ্যমান। অনেক ঐতিহাসিক বলেন, বঙ্গদেশ পূর্ব্বে মগধের অধীন ছিল ; কিন্তু কোন স্থানেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতি প্রাচীনকাল হইতে গৌড়রাজ্যের স্বাতন্ত্র্যের উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতীয় যুগে তাম্রলিপ্তরাজ ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন-রাজের উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেবের সময় বঙ্গাধিপ তাম্রলিপ্তরাজ ও তাঁহার সামন্তরাজ সিংহবাহুর উল্লেখ দেখা যায়। অনেকে সম্রাট্ অশোকের বিশাল রাজত্বের বিবরণ হইতে অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ বঙ্গদেশ সে সময় অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল ; কিন্তু ইতিহাসে তাহার নাম মাত্র উল্লেখ নাই। তাহা ছাড়া, সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, যে গঙ্গারাঢ়ী বীরগণের ভয়ে

আলেকজাণ্ডার বঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না, তাহার ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পরে অশোকের রাজত্বকাল আরম্ভ হইলে, তাঁহার পক্ষে বঙ্গদেশ জয় করা আদৌ সম্ভব হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, এই গঙ্গারাঢ়ী বীরগণ সমগ্র পাঠান রাজত্বকাল পর্য্যন্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের সময় শশাঙ্ক বঙ্গদেশে প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। কোন্ সময়ে কোন্ অবসরে মগধরাজ বাঙ্গলা দেশের কোন্ স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন, তাহার নামমাত্র উল্লেখ কোথাও নাই। একমাত্র পুণ্ড্রবর্দ্ধন কিছু সময়ের জন্য অরাজক ছিল, কিন্তু সেখানেও বঙ্গদেশের অন্যতম রাজা সমতট রাজবংশীয় গোপালদেব প্রতিষ্ঠিত হন। বাঙ্গলাদেশে অবাঙ্গালীর প্রাধান্য কোনকালেই ছিল না। রাজেন্দ্র চোলের ন্যায় দুই একজন বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা কেহই স্থায়ী রাজত্ব স্থাপন করিতে পারেন নাই; তাহা তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, বঙ্গবীরগণের বাঙ্গলার বাহিরে রাজ্যবিস্তারের ও উপনিবেশ স্থাপনের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের সময় "বাঙ্গলীর ছেলে বিজয় সিংহ হেলায় লঙ্কা করিল জয়।" ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে পালরাজগণ সারা উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন। ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে গঙ্গারাঢ়ীগণ উড়িষ্যা জয় করেন। পুরীর জগন্নাথের মন্দির আজিও তাঁহাদেরই অমর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালীগণ অপেক্ষাকৃত রুগ্নস্বাস্থ্য বলিয়া তাহাদিগকে "ভীরু ভেতো বাঙ্গালী" অপবাদ সহ্য করিতে হইতেছে। কিন্তু ইতিহাস এতদিন তাহার বিপরীত সাক্ষ্যই দিয়া আসিয়াছে। আর শুধু বাঙ্গলাই নয়, সকল প্রাচীন সুসভ্য দেশগুলিই, যেমন—মিশর, চীন, গ্রীস, রোম—অনুরূপভাবেই বিড়ম্বিত হইয়াছে।

আদিশূর—দেবপালদেব যখন গৌড়ের সিংহাসনে সমাসীন সেই সময় মধ্যরাঢ়ে ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইয়া একটি খণ্ডরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দেবপাল দেবের সেনাপতি লাউসেন ইছাই ঘোষকে প্রবল সংগ্রামে নিহত করিয়া বিদ্রোহ দমন করেন। পরবর্ত্তীকালে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষও বিদ্রোহী হইয়া মধ্যরাঢ়ে একটি খণ্ড স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ এই ঈশ্বর ঘোষ কিংবা তদ্বংশীয় কেহ আদিশূর উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। শূররাজগণ সৎগোপ জাতীয় ছিলেন। ইছাই ঘোষের সময় হইতেই মধ্যরাঢ়ে সৎগোপ-শক্তির প্রাধান্য স্থাপিত হয়। প্রবাদ আছে, আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ আনাইয়াছিলেন। অনেকে আদিশূরকে সমগ্র বাঙ্গলা দেশের রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে মধ্যরাঢ় ভিন্ন অন্যত্র কোথাও তাঁহাদের রাজত্বের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না। তাহা ছাড়া, তাঁহারা চিরকাল স্বাধীনতা বজায় রাখিতেও পারেন নাই। পরবর্ত্তীকালে তাঁহারা পালরাজগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সামন্ত রাজারূপে মধ্যরাঢ় শাসন করিতেন।

সেন বংশ—গৌড়ের পাল রাজশক্তি চারিশত বৎসর কাল সগৌরবে রাজ্য শাসন করিয়া বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে। এই সুযোগে মদন পালের সেনাপতি বিজয় সেন গৌড় রাজ্য অধিকার করিয়া লন। পরে সমতট রাজ্যের কিয়দংশ তাহার হস্তগত হয় এবং শূররাজকন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করিয়া নবদ্বীপের অধিপতি হন। নবদ্বীপ, গৌড় ও বিক্রমপুর—এই তিন স্থানেই তাঁহাদের রাজধানী ছিল। সেনবংশীয়গণ বৈদ্য জাতীয় ছিলেন। প্রায় সকল ইতিহাসেই ইহাদিগকে সমগ্র বাংলার রাজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা এক অষ্টমাংশের অধিপতি ছিলেন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তৎকালে

আলেকজাণ্ডার বঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না, তাহার ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পরে অশোকের রাজত্বকাল আরম্ভ হইলে, তাঁহার পক্ষে বঙ্গদেশ জয় করা আদৌ সম্ভব হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, এই গঙ্গারাঢ়ী বীরগণ সমগ্র পাঠান রাজত্বকাল পর্য্যন্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের সময় শশাঙ্ক বঙ্গদেশে প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। কোন্ সময়ে কোন্ অবসরে মগধরাজ বাঙ্গলা দেশের কোন্ স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন, তাহার নামমাত্র উল্লেখ কোথাও নাই। একমাত্র পুণ্ড্রবর্দ্ধন কিছু সময়ের জন্য অরাজক ছিল, কিন্তু সেখানেও বঙ্গদেশের অন্যতম রাজা সমতট রাজবংশীয় গোপালদেব প্রতিষ্ঠিত হন। বাঙ্গলাদেশে অবাঙ্গালীর প্রাধান্য কোনকালেই ছিল না। রাজেন্দ্র চোলের ন্যায় দুই একজন বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা কেহই স্থায়ী রাজত্ব স্থাপন করিতে পারেন নাই; তাহা তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, বঙ্গবীরগণের বাঙ্গলার বাহিরে রাজ্যবিস্তারের ও উপনিবেশ স্থাপনের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের সময় "বাঙ্গলীর ছেলে বিজয় সিংহ হেলায় লঙ্কা করিল জয়।" ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে পালরাজগণ সারা উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন। ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে গঙ্গারাঢ়ীগণ উড়িষ্যা জয় করেন। পুরীর জগন্নাথের মন্দির আজিও তাঁহাদেরই অমর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালীগণ অপেক্ষাকৃত রুগ্নস্বাস্থ্য বলিয়া তাহাদিগকে "ভীরু ভেতো বাঙ্গালী" অপবাদ সহ্য করিতে হইতেছে। কিন্তু ইতিহাস এতদিন তাহার বিপরীত সাক্ষ্যই দিয়া আসিয়াছে। আর শুধু বাঙ্গলাই নয়, সকল প্রাচীন সুসভ্য দেশগুলিই, যেমন—মিশর, চীন, গ্রীস, রোম—অনুরূপভাবেই বিড়ম্বিত হইয়াছে।

আদিশূর—দেবপালদেব যখন গৌড়ের সিংহাসনে সমাসীন সেই সময় মধ্যরাঢ়ে ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইয়া একটি খণ্ডরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দেবপাল দেবের সেনাপতি লাউসেন ইছাই ঘোষকে প্রবল সংগ্রামে নিহত করিয়া বিদ্রোহ দমন করেন। পরবর্ত্তীকালে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষও বিদ্রোহী হইয়া মধ্যরাঢ়ে একটি খণ্ড স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ এই ঈশ্বর ঘোষ কিংবা তদ্বংশীয় কেহ আদিশূর উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। শূররাজগণ সৎগোপ জাতীয় ছিলেন। ইছাই ঘোষের সময় হইতেই মধ্যরাঢ়ে সৎগোপ-শক্তির প্রাধান্য স্থাপিত হয়। প্রবাদ আছে, আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ আনাইয়াছিলেন। অনেকে আদিশূরকে সমগ্র বাঙ্গলা দেশের রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে মধ্যরাঢ় ভিন্ন অন্যত্র কোথাও তাঁহাদের রাজত্বের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না। তাহা ছাড়া, তাঁহারা চিরকাল স্বাধীনতা বজায় রাখিতেও পারেন নাই। পরবর্ত্তীকালে তাঁহারা পালরাজগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সামন্ত রাজারূপে মধ্যরাঢ় শাসন করিতেন।

সেন বংশ—গৌড়ের পাল রাজশক্তি চারিশত বৎসর কাল সগৌরবে রাজ্য শাসন করিয়া বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে। এই সুযোগে মদন পালের সেনাপতি বিজয় সেন গৌড় রাজ্য অধিকার করিয়া লন। পরে সমতট রাজ্যের কিয়দংশ তাহার হস্তগত হয় এবং শূররাজকন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করিয়া নবদ্বীপের অধিপতি হন। নবদ্বীপ, গৌড় ও বিক্রমপুর—এই তিন স্থানেই তাঁহাদের রাজধানী ছিল। সেনবংশীয়গণ বৈদ্য জাতীয় ছিলেন। প্রায় সকল ইতিহাসেই ইহাদিগকে সমগ্র বাংলার রাজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা এক অষ্টমাংশের অধিপতি ছিলেন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তৎকালে

উত্তর বারেন্দ্রে পাল বংশের দুই তিনটি শাখা বিদ্যমান ছিল। মেঘনাপারে প্রাচীন কুমিল্লা ও মেহেরকুল রাজবংশ এবং মৈমনসিংহের ভোগ বেতালে নবরঙ্গ রাজার বংশ আজিও বিদ্যমান। নদীয়ার পূর্বাংশ, যশোহরের উত্তরাংশ এবং ফরিদপুরের পশ্চিমাংশ লইয়া লাট ও কঙ্ক দ্বীপের রাজবংশ এবং দক্ষিণ রাঢ়ে তমলুকরাজ ও তাঁহার সামন্ত রাজগণ রাজত্ব করিতেন। সেন বংশের তিন খণ্ডের মধ্যে দক্ষিণ বারেন্দ্রে বর্ত্তমান মালদহ ও রাজসাহী লইয়া গৌড় রাজ্য, মাত্র ঢাকা জেলার পূর্ব্বাংশ লইয়া বিক্রমপুর রাজ্য এবং বর্দ্ধমানের পূর্ব্বাংশ এবং নদীয়ার পশ্চিমাংশ লইয়া অতি ক্ষুদ্র নবদ্বীপ রাজ্য বিদ্যমান ছিল। হুগলীর উত্তরাংশ তখন দ্বারবাসিনীর পালরাজগণের হস্তে ছিল এবং যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পাণ্ডুয়ার মুসলমান শাসনকর্ত্তা দ্বারবাসিনী অধিকার করেন। বর্দ্ধমানের মধ্যভাগে সৎগোপ জাতীয় রাজারা আমড়ার গড়ে রাজত্ব করিতেন।

বৈদিক যুগের শেষ ভাগে, বৈদিক আর্য্যগণের বঙ্গবিজয়ের আদিম কাল হইতে মুসলমান অধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণের হাতেই সমগ্র বাংলা দেশের শাসনভার ছিল। গঙ্গারাঢ়ী রাজবংশ, পালবংশ, সাভার রাজবংশ, কুমিল্লা ও মেহেরকুল রাজবংশ, মৈমনসিংহের ভোগবেতাল রাজবংশ, লাট ও কঙ্ক দ্বীপের রাজবংশ, কামরূপ রাজবংশ এবং শ্রীহট্টের প্রাচীন রাজবংশ সকলেই সেই প্রাচীন ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্ত্তী যুগে তাঁহারা কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া মহীকর্ষণ জনিত মাহিষ্য বা চাষী কৈবর্ত্ত নামে অভিহিত হন। বৈদ্য সেনবংশীয়গণ বাঙ্গলার মধ্য ভাগের কিয়দংশ অধিকার করিয়া মাত্র তিন পুরুষকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে সেগুলির অধিকাংশ মাহিষ্যরাজগণই পুনরুদ্ধার করিয়া লন।

গৌড়রাজ্য উত্তর বারেন্দ্রীর পাল বংশীয়গণ জয় করেন। নবদ্বীপ রাজ্যের দক্ষিণাংশ গঙ্গারাঢ়ীগণ এবং বিক্রমপুর রাজ্য ত্রিপুরার চন্দ্র বংশীয় রাজগণ অধিকার করেন। মধ্যরাঢ়ে শূরবংশীয়গণ বিদ্রোহী হইয়া যে স্বাধীন রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে এই প্রাচীন রাজবংশগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। আর একমাত্র বারেন্দ্রভূমি ছাড়া বাঙ্গলার বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রাচীন মাহিষ্য রাজবংশগুলির বংশধরগণ আপন আপন রাজধানীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদাররূপে বর্ত্তমান আছেন। কেবল মাত্র বারেন্দ্রভূমিতে প্রাচীন রাজবংশগুলির সম্পূর্ণরূপে উৎসাদন হওয়ায় মুসলমান যুগে কতকগুলি ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ জমিদারগণের মধ্যে আবার লক্ষ্মণসেনের গুরুবংশই প্রাচীনতম জমিদার বংশ। প্রবাদ আছে, তাঁহারাই মুসলমানদিগকে বাঙ্গলা দেশ জয় করিবার জন্য ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। সুতরাং বারেন্দ্রীর জমিদারী তাঁহাদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি হইয়াছিল। একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, লক্ষ্মণসেনের আশ্রিত জনৈক ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গলা দেশ মুসলমানদের হাতে যাইবে" এবং সেই কথাগুলি শুনিয়া লক্ষ্মণসেন খিড়কির দরজা দিয়া পলায়ন করেন। এই কিংবদন্তীটি যথেষ্ট অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। ঘটনা পরম্পরা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, গৌড়রাজ্য যখন সেন বংশের হস্তচ্যুত হইল এবং নবদ্বীপেরও সেই অবস্থা ঘটিবার উপক্রম হইল তখন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য পশ্চিমের জয়চাঁদের ন্যায় বাঙ্গলা দেশেও দ্বিতীয় জয়চাঁদের আবির্ভাব হইয়াছিল।

মুসলমান যুগ—১১৯২ খৃঃ দিল্লীর সম্রাট্ পৃথ্বীরাজ মোহম্মদ ঘোরীর হস্তে পরাজিত ও নিহত হইলে ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলমান রাজত্বের

সূত্রপাত হইল। মোহম্মদ ঘোরী দিল্লী জয় করিয়া তাহার প্রধান সেনাপতি কুতুবউদ্দীনকে ভারতবর্ষ জয়ের ভারার্পণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময় বখ্‌তিয়ার খিলজির পুত্র ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন মোহম্মদ কুতুবউদ্দীনের সেনাপতি ছিলেন। তিনি বঙ্গ ও বিহার জয় করেন। প্রবাদ আছে, লক্ষ্মণসেন প্রধান মন্ত্রীর প্ররোচনায় নবদ্বীপ ছাড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া যান এবং ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মাত্র অষ্টাদশ জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া নবদ্বীপ অধিকার করেন এবং তৎপরে গৌড়ও অধিকার করেন। লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ সোনার গাঁয়ে কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, পরে মেঘনার পূর্ব্ব-তীরস্থ দেব বংশীয় রাজা দামোদর দেব তাহাও জয় করিয়া লন। ইহার কিছুদিন পরে গৌড়ের মুসলমান শাসনকর্ত্তা বোখ্‌রা খাঁর পৌত্র বাহাদুর শাহ পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করেন।

বাহাদুর শাহ দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিলে তৎকালীন দিল্লীর সুলতান মহম্মদ তোগলক বাঙ্গলা অধিকার করেন এবং বাঙ্গলাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। সোনার গাঁ পূর্ব্ববঙ্গের, গৌড় উত্তর বঙ্গের এবং সপ্তগ্রাম দক্ষিণ বঙ্গের রাজধানী হইয়াছিল।

দ্বাদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ মুসলমান শাসনের অধীনে থাকে। দিল্লী ও তাহার নিকটবর্ত্তী আগ্রা শহর তাহাদের রাজধানী ছিল। দিল্লীর বাদশাহের অধীনস্থ কর্ম্মচারীরাই বরাবর বঙ্গদেশ শাসন করিতেন। মাঝে মাঝে কোন কোন কর্ম্মচারী বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা স্থায়ী করিতে পারেন নাই।

দ্বাদশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সকল মুসলমান শাসক ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন, তাঁহারা আফগানিস্থানের অধিবাসী অথবা তাহাদের ক্রীতদাস। তাহাদিগকে পাঠান বলা হয়। তাহাদের

পর পশ্চিম তুর্কীস্থানের অধিবাসী বাবর ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে পাঠানদিগের হস্ত হইতে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া লন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বংশের হাত হইতে ইংরাজগণ ভারতবর্ষ অধিকার করেন। পাঠান আমলে গৌড় বাংলার রাজধানী ছিল। মোগল আমলেও প্রথমে গৌড়, পরে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানী হয়।

বাঙ্গলার পাঠান শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে হুসেন শাহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল ও বাঙ্গলা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ১৪৯৪ খৃঃ হইতে ১৫২৫ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। ইঁহার সময়ে হিন্দু মুসলমানের পুনর্মিলন বহুলাংশে সার্থক হয়।

ইংরেজ যুগ—বাঙ্গলার নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মীরজাফর এবং অপর কতিপয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর প্রান্তরে ১৭৫৭ খৃঃএর কপট যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইভ নবাব সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করেন। অতঃপর নানা কূট-কৌশলে তৎকালীন ভারতবর্ষের মারাঠা, শিখ ও মহীশূর অধিপতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান শক্তিগুলিকে পরাজিত করিয়া ইংরাজগণ ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করেন।

প্রায় দুইশত বৎসর ইংরাজ শাসনাধীনে ভারতবর্ষ বহিঃ সম্পদে পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য দেশের ন্যায় উন্নত হইলেও ইহাদের শোষণ ও পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবস্থায় ভারতবাসী অধীর হইয়া উঠে এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

প্রায় চল্লিশ বৎসর ব্যাপী নানা বিদ্রোহ ও আন্দোলনে অতিষ্ঠ হইয়া ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া শাসনদণ্ড ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

দ্বিতীয় ভাগ

তাম্রলিপ্ত রাজ্য

তাম্রলিপ্ত ভারতের একটি অন্যতম সুপ্রাচীন বন্দর ও রাজধানী। ইহার অধিবাসীদিগের অতীত যুগের শৌর্য্যবীর্য্য ও জ্ঞানগরিমার অবধি নাই। বৈদিক যুগ হইতে পাঠান রাজত্বকাল পর্য্যন্ত তাম্রলিপ্ত-রাজবংশ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য শাসন করিয়া আসিয়াছেন। মোগল যুগে এই রজ্যের স্বাধীনতা নষ্ট হয়। এখনও পর্য্যন্ত সেই প্রাচীন রাজবংশ তাঁহাদের প্রাচীন বাস্তুভিটায় দীনভাবে জীবন যাপন করিতেছেন। তাম্রলিপ্ত রাজ্য এখন একটি ক্ষুদ্র জমিদারীতে পরিণত। কিন্তু তথাপি ইহা ঈশ্বরের অশেষ অনুগ্রহ মনে করিতে হইবে। কারণ সমগ্র ভারতবর্ষের কথা দূরে থাক, সমগ্র পৃথিবীতেও এরূপ একটি প্রাচীন রাজধানীতে এরূপ একটি প্রাচীন রাজবংশের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে কিনা সন্দেহ। আমরা এখনও প্রত্নতত্ত্বের সম্যক আদর করিতে শিখি নাই। নতুবা এই তাম্রলিপ্ত সমগ্র পৃথিবীর ঐতিহাসিকগণের মহাপুণ্যতীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইত। তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে বিভিন্ন কাব্যে, ইতিহাসে, ভ্রমণ বৃত্তান্তে যে সকল বর্ণনা আছে নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

পাঞ্চাল রাজকুমারীর স্বয়ংবরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যে সকল নৃপতি উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাম্রলিপ্তরাজের উল্লেখ আছে।

["কলিঙ্গস্তাম্রলিপ্তশ্চ পত্তনাধিপতিস্তথা।
মদ্ররাজস্তথাশল্যঃ সহপুত্রো মহারথঃ॥

এতেচান্যে চ বহবো নানাজনপদেশ্বরাঃ।
ত্বদর্থমাগতা ভদ্রে ক্ষত্রিয়াঃ প্রথিতা ভুবি ॥"
মহাভারত—হুগলী হাওড়ার ইতিহাস—শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য—৫১ পৃঃ।]

ভগবান বুদ্ধ যখন তাঁহার নূতন ধর্ম্মপ্রচার করেন, তখন উত্তর ভারতের শক্তিশালী নৃপতিপুঞ্জই তাঁহার প্রথম ও প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। রাজশক্তিকেই কেন্দ্র করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম উত্তর ভারতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল এবং সেই রাজশক্তির অন্তর্দ্ধানেই উত্তর ভারত হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অপসৃতি ঘটে। মগধাধিপতির ন্যায় তাম্রলিপ্ত অধিপতিও বুদ্ধদেবের একজন প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারই সহায়তায় দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধিকতর সম্প্রসারণ সম্ভব হয়।

["সুহ্মদেশ—এই দেশে ভগবান্ বুদ্ধ বাস করিয়াছিলেন এবং এই দেশেরই এক অরণ্যের মধ্যে বাসের সময় কোন একটি অজ্ঞাত বৌদ্ধসূত্রের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছিলেন।

বৌদ্ধযুগের ভূগোল—ডাঃ বিমলাচরণ লাহা, M.A. B.L., P.H.D. ৪৬ পৃঃ]

খৃঃ ৩৯৯ অব্দে বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান যখন এদেশে আগমন করেন তখন তিনি তাম্রলিপ্ত নগরে ২৪টি বৌদ্ধ সংঘারাম দেখিয়াছিলেন। তিনি দুই বৎসর কাল এই শহরে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং রাজার সাহায্যে সেখানকার অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। বিদেশাগত বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজক সেখানে অবস্থান করিতেন। এই সকল হইতে তৎকালীন তাম্রলিপ্তির ঐশ্বর্য্য ও রাজশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

তাম্রলিপ্ত শহরে একটি অশোকস্তম্ভ ছিল বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ আছে। তজ্জন্য অনেকে মনে করেন, তাম্রলিপ্ত অশোক কর্ত্তৃক বিজিত

হইয়াছিল কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। ইতিহাসে অশোক কর্তৃক তাম্রলিপ্ত বিজয়ের কথা আদৌ উল্লেখ নাই।

["বাঙ্গলায় অশোকের কোন অনুশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই।"
বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম—নলিনীনাথ দাশগুপ্ত ৩৬ পৃঃ।]

অশোকস্তম্ভ থাকার অর্থ অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া, নানাদেশে বুদ্ধের অমৃতবাণী প্রচার করিবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া বহু স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদের গাত্রে বুদ্ধের বাণী-সমূহ খোদিত করিয়াছিলেন। সিংহল, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশেও ঐরূপ অশোকস্তম্ভ ছিল। সুতরাং অশোকস্তম্ভ যে অশোকের বিজয়স্তম্ভ এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক।

[মহাবংশ নামক পালিভাষায় রচিত বিখ্যাত গ্রন্থে একটি মনোহর প্রবাদ লিপিবদ্ধ আছে। একদিন অশোক গুরু মগ্‌গলিপুত্র তিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের আয়তন কতখানি ?"

তিষ্য উত্তর করিলেন "ধর্ম ৮৪,০০০ শাখায় বিভক্ত।" অশোক বলিলেন "প্রত্যেকটি শাখায় আমি একটি করিয়া বিহার নির্মাণ করিব।" অতঃপর তিনি ভারতের বিভিন্ন অংশে ৮৪,০০০ বিহার নির্মাণের ব্যবস্থা করিলেন। বিচিত্র ভারত—শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় M. A., P. H. D., P. R. S., ও শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় M. A., P. H D. P. R. S. ৮০ পৃঃ।]

["তমলুকে অশোকস্তম্ভ থাকার অর্থ মনে হয় কামরূপ অধিপতি ভাস্করবর্ম্মা যেমন বৌদ্ধসম্রাট ও হর্ষবর্দ্ধনের মিত্র নরপতি ছিলেন, তাম্রলিপ্ত রাজগণও তদ্রূপ রাজাধিরাজ প্রিয়দর্শী অশোকের ও অন্যান্য বৌদ্ধ সম্রাটগণের বন্ধু ছিলেন এবং উক্ত ধর্মপ্রচারের জন্য সাহায্য করিয়াছিলেন। হাওড়া হুগলীর ইতিহাস—শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য—৭৩ পৃঃ"]

["বৌদ্ধদের প্রাচীন ষোড়শ মহাস্থবিরদের মধ্যে একজন বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি তাম্রলিপ্তের অধিবাসী। তাঁহার নাম ছিল কালিক। কালিকের তারিখ

কত তাহা বলা যায় না, এমন কি তিনি খৃঃ অব্দের পূর্ব্বের কিংবা পরের তাহাও স্থির হয় নাই।

৬৭৩ খৃঃ অব্দে ই-ৎসিং তাম্রলিপ্তে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন এবং নাগার্জ্জুনের সুহৃল্লেখখানি চীনা ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। সেই সময় আরও কোনও কোনও চীনা শ্রমন বিদ্যাভ্যাস করিতেন এবং তাম্রলিপ্ত তখন সর্ব্বাস্তিবাদিদিগের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। তৎকালে সেখানে পো-লো-হো বা 'বরাহ'-বিহার নামে একটি বিখ্যাত বিহার ছিল এবং সেই বিহারে বাস করিতেন রাহুলমিত্র নামে এক অল্পবয়স্ক শ্রমণ। ই-ৎসিং বলেন, তিনি জ্ঞানের গভীরতার জন্য সেই যুগের প্রাচ্য ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।—বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্ম—শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত ৪০ ও ৬৭ পৃঃ।]

["ক্যাম্বেল সাহেব যখন বাঙ্গালীর প্রতি সদয় হইয়াছিলেন তখন বলিয়াছিলেন, "আসিয়াখণ্ডের মধ্যে বাঙ্গালীরা প্রথিণীয় জাতি সদৃশ। সিংহল বাঙ্গালী কর্তৃক পরাজিত এবং পুরুষানুক্রমে অধিকৃত ছিল। যবদ্বীপ ও বালীদ্বীপ বাঙ্গালীর উপনিবেশ ছিল ইহাও অনেকে অনুমান করেন। তাম্রলিপ্ত সমুদ্রযাত্রার স্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় আর কোন জাতি এরূপ ঔপনিবেশিকতা দেখান নাই।"

গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী রাষ্ট্রকে গঙ্গারাষ্ট্র এবং অপভ্রংশে গঙ্গারাঢ় বলা হয়।

Mackenzie's Collections হইতে সংগৃহীত উইলসন্ সাহেব কর্ত্তৃক প্রচারিত তথ্যে পাওয়া গিয়াছে, গঙ্গারাঢ়ীর অধীশ্বর অনন্তবর্ম্মা কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। একথা প্রস্তরশাসনে লিখিত আছে। উড়িষ্যার বিখ্যাত গঙ্গা বংশের ইনিই আদিপুরুষ। কেহ কেহ বলেন, গঙ্গাবংশীয়েরা দক্ষিণদেশ হইতে আসিয়াছিলেন এবং চোরগঙ্গা নামে একজন দাক্ষিণাত্যবাসী রাজা এই বংশ স্থাপন করিয়াছিলেন—এই কথাটি মিথ্যা। এই প্রবল প্রতাপশালী মহামহিমময় রাজবংশীয়েরা বাঙ্গালী ছিলেন। একথা যাঁহারা বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারাই সেই পক্ষ সমর্থন করেন। উইল্‌সন্ সাহেবের রচিত গ্রন্থে ৮২পৃঃ তাঁহারই একখানি তাম্রশাসনের উল্লেখ আছে। তাহাতে লিখিত

আছে রাঢ়ী অনন্তবর্ম্মাই উড়িষ্যা বিজেতা এবং উড়িষ্যা গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ। তাম্রফলক বা প্রস্তরফলক মিথ্যা কথা বলিবে না। বর্ম্মা শব্দে বুঝাইতেছে যে উঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয় হইলে বাঙ্গালী হইল না, ভরসা করি, এ আপত্তি কেহ উত্থাপন করিবেন না। বাঙ্গলার ক্ষত্রিয়কে বাঙ্গালী বলিব না, তবে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণকেই বা বাঙ্গালী বলিব কেন?

তাম্রলিপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া হাওড়া, হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলাকে গঙ্গারাঢ় প্রদেশ বলে। প্রাচীন গঙ্গারাঢ়ীগণ এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—বিবিধ প্রসঙ্গ—

বাঙ্গলার কলঙ্ক—১৮০।৪ পৃঃ।

"ভারতবর্ষে যে সকল রাজবংশের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই বাঙ্গালী গঙ্গারাঢ়ীয়দিগের প্রতাপ ও মহিমা কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। পুরীর জগন্নাথের মন্দির ও কোনারকের আশ্চর্য্য প্রাসাদাবলী তাহাদিগেরই কীর্ত্তি। বাঙ্গলার পাঠানেরা যতবার তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, ততবারই পরাভূত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। উদ্ধত পাঠানদিগকে গঙ্গাবংশীয়েরা তিনশত বৎসর ধরিয়া যেভাবে প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছিলেন, চিতোর রাজবংশ ছাড়া আর কোন হিন্দুরাজবংশই মুসলমান সম্রাট্‌দিগকে সেরূপভাবে প্রতিহত করিতে পারেন নাই। ইঁহারা দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজাদিগকেও দমন করিয়াছিলেন। সাহেবেরা বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে বাঙ্গলার প্রকৃত ইতিহাস নাই। তাহাতে কেবল মুসলমানদিগের বর্ণনা। যে বাঙ্গালী এ সকলকে বিশ্বাস করে সে বাঙ্গালী নয়। বাঙ্গলার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গলার ভরসা নাই। আইস আমরা সকলে মিলিয়া সেই ইতিহাস লিখি। বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ—বাঙ্গলার কলঙ্ক ১৮৪।১৮৫ পৃঃ।"

"মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাবসম্পন্ন, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা—ঐ গ্রন্থ—১৮২ পৃঃ।"]

খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতকে এই গঙ্গাবংশীয় তাম্রলিপ্ত অধিপতির সামন্তরাজ ও দৌহিত্রের পুত্র বিজয়সিংহ সাতশত অনুচর লইয়া লঙ্কা দ্বীপ জয় করেন। বিজয়সিংহ সাতশত গঙ্গারাঢ়ী বীর লইয়া এই তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতেই জাহাজ ভাসাইয়াছিলেন।

আজকাল বাঙ্গলা দেশ ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া পেটজোড়া প্লীহা লইয়া, রুগ্ন, কৃশ, খর্ব্ব দেহ লইয়া, বঙ্গ সন্তানগণ কোনরূপে এদেশে মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে মাত্র। তাই তাহাদের মধ্যে অনেকে অধুনা কোন পাঞ্জাবী কিংবা কাবুলী দেখিলে ভীত হন। একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা যেরূপ বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় ছিল, তাহা তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন না। এই বাঙ্গলা দেশেরই বীর সৈন্যগণ পঞ্চনদ প্রদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত শাসন করিতেন। অতীত যুগে এই গঙ্গারাঢ়ী সৈন্যগণের সিংহ বিক্রমে আসমুদ্র হিমাচল কম্পিত হইত। বাহিরের কোন বিজেতা বঙ্গ আক্রমণের স্বপ্ন দেখিতেও সাহস পাইতেন না। তাই মহাবীর আলেকজাণ্ডার এই সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিলেও তাঁহার সৈন্য সামন্তগণ বাঙ্গালীর বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া আলেকজাণ্ডারকে তাঁহার বঙ্গজয়ের লোভ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিল।

["মেগাস্থিনিসের কথায় আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, তৎকালে রাঢ়দেশ একটি পৃথক্ রাজ্য ছিল। মেগাস্থিনিস্ বলেন, এই রাজ্য এরূপ প্রতাপান্বিত ছিল যে, ইহা কখনও কোন শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই এবং অন্যান্য রাজগণ গঙ্গারাঢ়ীদিগের হস্তীসৈন্যের ভয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইতেন না। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং পরাক্রান্ত আলেকজাণ্ডার গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া গঙ্গারাঢ়ীদিগের প্রতাপের কথা শুনিয়া সেইখান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বাঙ্গালীর বলবীর্য্যের সম্মুখীন

হইয়া আলেকজাণ্ডার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক হ'ন নাই। একথা কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, ইহার সাক্ষী স্বয়ং মেগাস্থিনিস্। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—বিবিধ প্রবন্ধ—বাঙ্গলার কলঙ্ক—১৮৩ পৃঃ।]

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, জাতিবিদ্বেষ-পরায়ণ এক শ্রেণীর কতকগুলি লোক তমলুক রাজবংশের সেই মহিমাময় চিত্রে অযথা কালিমালেপন করিতে সহায়তা করিয়াছে। সেই কালিমাময় রূপ দেখিলে সহৃদয় পাঠকগণ বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিবেন। প্রথম পরিচ্ছেদে ইহা সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে যে বৈদিক যুগের বঙ্গবিজয়ী ক্ষত্রিয়গণের বংশধরগণ পরবর্ত্তী যুগে কৃষি অবলম্বন করিয়া মহীকর্ষণ করার জন্য মাহিষ্য নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং বাঙ্গলার সুবিস্তীর্ণ জলায় ধানের আবাদ করার জন্য তাহাদের অপর নাম হইয়াছে চাষী কৈবর্ত্ত। ইহাও সত্য যে, বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তাঁহারা উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান তমলুক রাজবংশ সেইরূপ উপবীত ত্যাগী চাষী কৈবর্ত্ত নামে পরিচিত বাঙ্গলার একটি প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজবংশ। জলার ধানচাষীরা যেমন চাষী কৈবর্ত্ত নামে পরিচিত, তেমনি জালের দ্বারা জলার মৎস্য শিকারীগণ জেলে কৈবর্ত্ত নামে পরিচিত। বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনের তীব্র কলুষিত আবহাওয়ার যুগে চাষী কৈবর্ত্তগণের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ এক শ্রেণীর ব্যক্তিগণ কৈবর্ত্ত এই সাধারণ নাম বিদ্যমান থাকার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে জেলে কৈবর্ত্ত নামে প্রচার করিতে আরম্ভ করে। বিভিন্ন পুরাণেও দুই প্রকার কৈবর্ত্ত জাতির উল্লেখ আছে।

প্রথম—ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান-কৈবর্ত্ত। ইহারাই চাষী-কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য নামে পরিচিত।

দ্বিতীয়—নিষাদ পিতা ও আয়োগব মাতার সন্তান কৈবর্ত্ত। ইহারাই নৌ ও মৎস্যজীবী কৈবর্ত্ত নামে পরিচিত।

ঐতিহাসিক শ্রীনীহাররঞ্জন রায় চাষী-কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য)-গণের পরিচয় প্রসঙ্গে শেষোক্ত শ্রেণীর কৈবর্ত্তগণের অর্থ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার জাতিবিদ্বেষপরায়ণতা ও সঙ্কীর্ণ ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। [বাঙ্গালী হিন্দুর বর্ণভেদ শ্রীনীহাররঞ্জন রায় ৫১, ৯৭।৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

বিখ্যাত ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব ও রিজলী সাহেব তমলুক রাজবংশের ইতিহাস সংগ্রহকালীন উক্তরূপ এক শ্রেণীর ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রতারিত হইয়া তাঁহাদের ইতিবৃত্তে লিখিয়া যান যে, রাজা নিঃশঙ্ক নারায়ণের মৃত্যুর পর কৈবর্ত্তরাজ (fisher king) কালু ভুঁইয়া তমলুক সিংহাসন দখল করেন। উক্ত ইংরাজ ঐতিহাসিকদ্বয় দ্বারা ঐরূপ বিবরণ লিখাইয়া লইবার পর বর্ত্তমান তমলুক রাজবংশকে উক্ত মতের পৃষ্ঠপোষক ঐতিহাসিকগণের কেহবা ধীবর কেহবা শবর জাতীয় বলিয়া জোর গলায় প্রচার করিতে থাকেন।

হাণ্টার সাহেব ও রিজ্‌লী সাহেবের নিকট ঐরূপ বিবরণটি আদায় করা হইয়াছিল তাঁহাদের স্বদেশ যাত্রাকালে। পরে ঐরূপ বিবরণ প্রচারিত হইলে তৎকালীন তমলুক রাজার পক্ষ হইতে তাঁহার বংশের কোর্ষিনামা ও বিস্তারিত বিবরণ সহ যখন তাঁহাদিগকে বিলাতে পত্র লেখা হইয়াছিল, তখন তাঁহারা উভয়েই দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ভারতীয় অনুচরগণ তাঁহাদিগকে ঐরূপ বিবরণ দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেরা এ সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিবার সুযোগ পান নাই। তাঁহারা আরও বলিয়াছিলেন যে তমলুকরাজের নিকট হইতে উক্ত বিবরণ পাইয়া অতীব আনন্দিত হইয়াছিলেন। রিজলী সাহেব প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে তাঁহার "Castes & Tribes of Bengal" এর দ্বিতীয় সংস্করণে

তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন। ইহার অল্পদিন পরেই রিজ্‌লী সাহেবের মৃত্যু হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার দ্বারা ঐ বিবরণ সংশোধন করা সম্ভব হয় নাই। সেবানন্দ ভারতী মহাশয়ের তমলুকের ইতিহাসের ৪৮ পৃঃ ও ভ্রান্তি বিজয় পুস্তকের ৩৩৪ পৃঃ হাণ্টার সাহেবের ও রিজ্‌লী সাহেবের ঐ সকল উক্তির বিষয় লিপিবদ্ধ আছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা নিঃশঙ্ক নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কালু রায়, তৎকালীন গৌরব সূচক ভুঁইয়া উপাধি লইয়া তমলুক সিংহাসনে আরোহণ করেন। চক্রান্তকারীর দল হাণ্টার সাহেবকে ও রিজ্‌লী সাহেবকে বুঝাইয়া দিল, রাজা নিঃশঙ্ক নারায়ণের মৃত্যুর পর কৈবর্ত্তরাজ (fisher king) কালু ভুঁইয়া তমলুক সিংহাসন অধিকার করিয়া লন। ইহার বেশী আর কিছু উল্লেখ নাই। রাজসিংহাসন যেন একটি ছেলের হাতের মোয়া আর সেটিকে যেন হঠাৎ কাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল!

গঙ্গারাঢ়ী বীরগণের দৌর্দ্দণ্ড প্রতাপের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সমগ্র পাঠান রাজত্বকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা পাঠানগণের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছেন, সে কথাও বহু ইতিহাসে উল্লেখ আছে। তাহার মধ্যে এই রাজবংশ এমনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে, সে রাজ্য দখল করা ছেলে খেলার মত সহজ ও সরল হইয়া গেল। কোন যুদ্ধ বিগ্রহের প্রয়োজন হইল না। কারণ, তদনুরূপ ঘটনার বিন্দুমাত্র উল্লেখ দেখা যায় না কোন ইতিহাসে। প্রতিপক্ষগণের কালু ভুঁইয়াই বা কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন, তাহারও বিন্দুমাত্র উল্লেখ দেখা যায় না। হাণ্টার সাহেবর ও রিজ্‌লী সাহেবের মুখ দিয়া এই বেদবাক্যটি উচ্চারণ করাইবার পূর্ব্বে সমগ্র দেশবাসী ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতেন না। বর্ত্তমান তমলুকরাজ মহাভারতে উল্লিখিত ক্ষত্রিয় রাজার বংশধর এই সরল বিশ্বাসই সকলের ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে যে মুসলমানের সংখ্যা কম, আজ পশ্চিমবঙ্গ যে হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিয়াছে, তাহা একমাত্র তমলুকরাজ ও তাহার সামন্ত রাজগণের বাহুবলের প্রভাব। পাঠান রাজত্বকালে বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পাঠান যুগে তমলুকরাজ ও তাঁহার সামন্তরাজ হরিদাসের হাতে সেকেন্দার শাহের লাঞ্ছনার ইতিহাস তমলুক ইতিহাসে বর্ণিত আছে। পশ্চিম বঙ্গবাসীগণ তাহাদের মান সন্ত্রম ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তমলুক রাজের নিকট যে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ ছিল, তাহার পুরস্কার স্বরূপ এক শ্রেণীর লোক উক্ত ইংরাজ ঐতিহাসিক দ্বয়ের নিকট 'fisher king' এই বীজ মন্ত্রটি প্রদান করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন।

তৎকালীন তাম্রলিপ্তের পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক। তখন বাঙ্গলা দেশে দুর্দ্দান্ত পাঠানগণের রাজত্ব। নবদ্বীপ ও গৌড় জয় করিয়া তাঁহারা লোলুপদৃষ্টিতে তাম্রলিপ্ত জয়ের সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেই সময় যদি তাম্রলিপ্ত রাজ্য এমনই অন্তঃসারশূন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িত যে, বাহিরের একজন নগণ্য ব্যক্তি সে রাজ্য দখল করিয়া লইতে পারিত, তাহা হইলে সে সুযোগ সর্ব্ব প্রথম পাঠানগণই গ্রহণ করিতেন। আসলে উক্ত বিবরণটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কতকগুলি সম্পূর্ণ ইতিহাস অনভিজ্ঞ, বিদ্বেষপরায়ণ তথাকথিত বিজ্ঞ ব্যক্তির অপপ্রচার মাত্র। আসল ব্যথা কোথায় তাহা ভুক্তভোগীগণ সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছেন।

তমলুকরাজ বর্ত্তমানে চাষী কৈবর্ত্ত নামে পরিচিত। ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে বিরুদ্ধবাদীগণের মত এই যে, কোথায় মহাভারতে উল্লিখিত যাজ্ঞসেনীর পাণিপ্রার্থী ক্ষত্রিয় রাজবংশ, আর কোথায় বর্ত্তমানের উৎপীড়িত চাষী কৈবর্ত্ত জাতি! চাষী কৈবর্ত্তগণ সেই

ক্ষত্রিয় রাজবংশধর কিরূপে হইতে পারে? সুতরাং যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ যদি নাই করা হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? মানুষের সাধারণ বুদ্ধির বিচারই শ্রেষ্ঠ বিচার। আর সেই সাধারণ বুদ্ধির বিচারে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, প্রাচীন রাজবংশ সর্ব্বজন বিদিত ক্ষত্রিয় রাজবংশ, আর বর্ত্তমান রাজবংশও সেইরূপ সর্ব্বজনবিদিত চাষী কৈবর্ত্ত রাজবংশ। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কোন সময়ে না কোন সময়ে চাষী কৈবর্ত্তগণ সেই ক্ষত্রিয় রাজ্যটি অধিকার করিয়া লইয়াছেন। আর সেই অনুমান যদি করিতে হয়, তাহা হইলে একদিকে নিঃশঙ্ক নারায়ণ, আর একদিকে কালু রায় (ভুঁইয়া)। এইখানেই সেই অব্যর্থ যুক্তি প্রয়োগ করিবার উপযুক্ত স্থান।

সাধারণতঃ দেখা যায়, সঙ্কীর্ণভাব ও জাতিবিদ্বেষের জন্ম হয় অজ্ঞতার মধ্য হইতে। যদি হাণ্টার সাহেবের যুক্তিদাতা ও তৎপক্ষ সমর্থনকারীদের চক্ষে এই সত্যটি বিকশিত হইত যে, প্রাচীন বৃহৎ বঙ্গের সুসভ্য সমতল ক্ষেত্রে যতগুলি প্রাচীন রাজবংশ বিদ্যমান ছিল; মহাভারতে উল্লিখিত অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ এবং প্রাগ-জ্যোতিষের সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজগণের বর্ত্তমান বংশধরগণ সকলেই চাষী কৈবর্ত্ত নামে পরিচিত, তাহা হইলে হয়ত তাঁহারা একটু চিন্তা করিবার সুযোগ পাইতেন যে, চাষী কৈবর্ত্ত এই নামটির মধ্যে এক গভীর ও জটিল ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। আর সেই জটিল সমস্যার সমাধান করিতে পারিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, প্রাচীন বাঙ্গলার এবং প্রাচীন বাঙ্গালীর গর্ব্বের ও কৃতিত্বের যাহা কিছু আছে, তাহা একমাত্র বর্ত্তমানের উৎপীড়িত এই চাষী কৈবর্ত্তগণের পূর্ব্ব পুরুষগণের। ইহাও বুঝিতে পারিতেন যে, উক্ত ঐতিহাসিক-দ্বয়কে ঐরূপ যুক্তি দেওয়া তাহাদের পক্ষে কতখানি হাস্যাস্পদ ও লজ্জার বিষয় হইয়াছে।

ঐতিহাসিকের প্রধান কর্ত্তব্য ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকের ন্যায় সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা। তিনি হইবেন একজন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। তিনি সর্ব্ব প্রথম দেখিবেন সমগ্র দেশের ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ জীবন্ত মূর্ত্তি। পরে দেশবাসীর সম্মুখে সেই মূর্ত্তিটি প্রতিফলিত করিবেন। অবশ্য একজনের পক্ষে দেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস উদ্ধার করা দুঃসাধ্য কিংবা অসাধ্য হইতে পারে। তজ্জন্য, যিনি যতটুকু সত্য দর্শন করিবেন তিনি ততটুকু সত্যই সকলের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিবেন এবং সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া সত্যের পথে অগ্রসর হইয়া সম্পূর্ণ মূর্ত্তিটি আবিষ্কার করার চেষ্টা করিতে ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে উৎসাহ দিবেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের এই শ্রেণী বিদ্বেষ-জর্জ্জরিত সমাজে তাহার বহু বিপরীত দৃষ্টান্তই ফুটিয়া উঠে।

প্রাচীন বঙ্গরাজগণের বংশাবলী যে যে স্থানে সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য ছিল আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোন কোন ঐতিহাসিক সেই সেই স্থানে অবান্তর গ্রন্থের সৃষ্টি করিয়া সত্যকে সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য করিয়া দিয়াছেন। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তগুলি এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত করিবে।

মহাভারতে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে যেহেতু তাম্রলিপ্ত রাজের উপস্থিতির উল্লেখ আছে অতএব উক্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিকদিগের মতে উহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। সিংহলের মহাবংশ নামক প্রাচীন ইতিহাসে বাঙ্গলার ইতিহাস অধিকতর স্পষ্ট হইয়াছে, অতএব উহাও তদনুরূপ বিশ্বাসযোগ্য নহে। সাভার রাজবংশ, পালবংশ, রাণী ময়নামতীর বংশগুলির জাতির সঠিক সংবাদ গোপন করিয়া তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান তমলুক রাজবংশধর মহাভারতের উল্লিখিত ক্ষত্রিয় রাজবংশধর; কোনকালেই সেই বংশের বিলুপ্তি ঘটে নাই, তাহা নিম্নোক্ত প্রমাণগুলি হইতেই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইবে।

১। কালু রায় (ভুঁইয়া) ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি হইলেন চাষী কৈবর্ত্ত, আর তাঁহার ঠিক প্রথম পূর্ব্ব রাজা নিঃশঙ্ক নারায়ণ রায় (যাহারা কালু রায় ভুঁইয়াকে নিঃশঙ্ক নারায়ণের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে চান না, তাহাদের পক্ষে প্রথম পূর্ব্বরাজা বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইতেছে) পর্য্যন্ত প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজবংশ চলিয়াছিল—এই হইল হাণ্টার পন্থীগণের মত। কিন্তু দেখা যাইতেছে, খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতকে ঐ বংশের দৌহিত্রের পুত্র বিজয় সিংহের বংশধরগণও বর্ত্তমানে (তাঁহারা প্রাচীন সিংহল পাটন রাজধানীর চতুঃপার্শ্বে বাস করিতেছেন) চাষী কৈবর্ত্ত নামে পরিচিত আছেন এবং সেই নামে পরিচিত হওয়ার পূর্ব্বাভাষের বিষয় পরবর্ত্তী প্রবন্ধে (বিজয় সিংহ) লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

২। তাম্রলিপ্তরাজের কতকগুলি সামন্ত রাজার উল্লেখ ইতিহাসে ৯ম।১০ম শতাব্দী হইতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও বিদ্যমান। তাঁহারাও বর্ত্তমানে চাষী কৈবর্ত্ত নামে পরিচিত। নবম দশম শতাব্দীর তমলুকরাজ পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় দ্বিজ সংস্কার সম্পন্ন হইলে উক্ত সামন্তরাজগণও তদনুরূপ হইতেন, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে দেওয়া হইতেছে।

৩। ত্রয়োদশ শতাব্দীর নিঃশঙ্ক নারায়ণ যদি দ্বিজ সংস্কার সম্পন্ন ক্ষত্রিয় হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার বহু জ্ঞাতি ও কুটুম্বদিগের দ্বারা তমলুকের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল পূর্ণ হইয়া থাকিত। এখানে বাঙ্গলার একজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের যুক্তির উল্লেখ করিলাম।

["কোন শ্রেণীর হিন্দুরাজা স্ব-শ্রেণীর লোক ব্যতীত থাকিতে পারেন না; সুতরাং সেন রাজারা যদি ক্ষত্রিয় হইতেন তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাদের বহু জ্ঞাতি কুটুম্ব তাঁহাদের রাজধানীর চতুর্দ্দিকে থাকিত"। সামাজিক ইতিহাস—শ্রীদুর্গাদাস সান্যাল—১৬ পৃঃ।]

তাম্রলিপ্ত কিংবা তাহার চতুষ্পার্শ্বে সেরূপ দেখা যায় কি ?

৪। তাম্রলিপ্তরাজ বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাম্রলিপ্ত শহরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের এক বড় কেন্দ্র ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহাদের কি অবস্থা হইবে, তাহা কি ঐতিহাসিকগণ অজ্ঞাত আছেন? ইতিহাসের এই সাধারণ যুক্তিগুলি যে সকল ঐতিহাসিকের মাথায় স্থান পাইবার যোগ্য নয়, সেইরূপ পক্ষাঘাতগ্রস্ত মস্তিষ্ক লইয়া কি ইতিহাস উদ্ধার হইবে ?

তমলুক রাজবংশের ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল অপপ্রচার চলিতেছে, তাহার মূলে দুইটি কারণ বিদ্যমান—দেখা যাইতেছে। প্রথমটি বাঙ্গালী জাতির চিরাচরিত জাতিবিদ্বেষ। দ্বিতীয়টি হইল চাষী কৈবর্ত্ত শব্দের অর্থ সঠিক নিরূপণ করিতে না পারা। বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকগণের তমলুক রাজবংশ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্যগুলির অনৈক্য হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়, সেগুলি কিরূপ অলীক ও স্বকপোল-কল্পিত। নিম্নে ঐ অনৈক্যগুলির দুই একটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

(১) হাণ্টার সাহেব ও তৎপন্থীগণ—নিঃশঙ্ক নারায়ণ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়-রাজবংশ চলিয়াছে। কালু রায় ভুঁইয়া হইতে বর্ত্তমান কৈবর্ত্ত রাজবংশ চলিতেছে (ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে) সেবানন্দ ভারতী মহাশয়ের তমলুকের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

(২) ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত—অনাদিকাল হইতেই তমলুকে অনার্য্য (কৈবর্ত্ত নামের কারণ) রাজবংশ চলিতেছে। তাহারা আর্য্য রীতি-নীতি গ্রহণ করিতে পারে এই মাত্র। [বাঙ্গলার ইতিহাস—১ম খণ্ড ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

এই মত সমর্থন করিলে বলিতে হইবে, আর্য্যগণ বঙ্গদেশে আদৌ আসেন নাই এবং রামায়ণ মহাভারতের উল্লেখের কোন মূল্য নাই।

(৩) [বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত :—৺পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২ পৃঃ—খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাবে শবরগণ প্রতাপশালী হইয়া উঠে এবং তাঁহারা বাঙ্গলার কোন কোন স্থান ও উড়িষ্যা পর্য্যন্ত অধিকার করেন। এই সময়ে কৈবর্ত্ত জাতি স্বজাতীয় একজন নৃপতিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার নাম বিদ্যাধর রায়। বিদ্যাধর রায় হইতে কালু ভুঁইয়া রায় পর্য্যন্ত বত্রিশ পুরুষ উক্ত রাজবংশের রাজাদিগের নাম উল্লেখ আছে।]

[বাঙ্গালীর বল—৪২৮ পৃঃ।

ময়ূর বংশ—প্রাচীনকালে মেদিনীপুর ময়ূর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ময়ূর বংশ তাম্রলিপ্ত নগরে রাজধানী করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, ময়ূরবংশের নৃপতিগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। শেষ নৃপতি নিঃশঙ্ক নারায়ণের মৃত্যুর পর ময়ূর সিংহাসন কৈবর্ত্তরাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। কালু ভুঁইয়া সেই কৈবর্ত্তরাজগণের প্রথম পুরুষ।]

সিংহল পাটন রাজ্য

বিজয় সিংহ

বাঙ্গলার বীর সন্তান বিজয় সিংহ সাত শত অনুচর লইয়া লঙ্কা দ্বীপ জয় করিয়াছিলেন। বিজয় সিংহ বাঙ্গলার মধ্যবর্ত্তী রাঢ় দেশের রাজা সিংহ বাহুর পুত্র। কথিত আছে, তিনি যৌবনে অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ছিলেন বলিয়া পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন এবং সাতশত অনুচর লইয়া লঙ্কা দ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন। বিজয় সিংহ লঙ্কা দ্বীপে বাঙ্গলার বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন।

উল্লিখিত কয়েকটি কথা ব্যতীত, আমরা সাধারণ বাঙ্গালী, এই বীর সন্তানের বীরত্বের কাহিনীর আর অধিক কিছুই জানিতাম না। এমন কি, বাঙ্গলার রাজা সিংহ বাহু এই কথাটি পর্য্যন্ত যেন একটি

উপকথার মত চলিয়া আসিতেছে মাত্র। সিংহবাহু কোন্ বংশের রাজা ছিলেন, কোথায় তাঁহার রাজধানী ছিল তাহারও বিশেষ সংবাদ আমরা রাখিতাম না ; আর সাধারণ ইতিহাসেও তাহার বিশেষ কিছু বিবরণ দেখা যায় না।

মহাবংশ নামক সিংহলের এক অতি প্রাচীন ইতিহাসে বিজয় সিংহের কাহিনী এবং তাঁহার রাজত্বের অনেক কিছু বিবরণ আছে। কিছুকাল পুর্ব্বে আমাদের দেশের কোন কোন ঐতিহাসিক এই মহাবংশ অবলম্বন করিয়া বিজয় সিংহের ও তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের এবং রাজধানীর পরিচয় দিবার সামান্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পাছে তাঁহাদের বিবরণ আধুনিক আধিপত্যশালী সম্প্রদায়বিশেষের মতের পরিপন্থী হয় এই আশঙ্কায় তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

মহাবংশে উল্লেখ আছে, সার্থসিংহ নামক এক প্রবল প্রতাপান্বিত বীর শত যোজন অরণ্য পরিষ্কার করিয়া রাঢ়দেশে গঙ্গার সমীপবর্ত্তী স্থানে সিংহপুর নামক একটি রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার সহিত বঙ্গাধিপতির কন্যা সুপ্রাদেবীর বিবাহ হয়। সুপ্রাদেবীর গর্ভে সিংহবাহুর জন্ম হয়। সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ লঙ্কা দ্বীপ জয় করায় লঙ্কার নাম হয় সিংহল।

কোন কোন ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে উক্ত বঙ্গাধিপের কন্যার এক সিংহের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। সেই সিংহের সন্তান সিংহবাহু। এই সিংহ অর্থে সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী বীরপুরুষ কিংবা সিংহ উপাধিধারী হইবেন নতুবা সিংহের সহিত মানবীর বিবাহ কি করিয়া সম্ভব হইবে ? আর, এইরূপ প্রবাদটি সম্ভবতঃ তৎকালীন প্রচলিত একটি অন্ধ 'বিশ্বাসের দৃষ্টান্তও হইতে পারে। কারণ, সমসাময়িক গ্রীক ইতিহাসেও দেখা যায়, গ্রীকরাজা পেরিক্লিস (খৃঃ পুঃ ৪৭৯-৪৩৯)

সিংহের সন্তান ছিলেন। তাঁহার মাতার সহিত একটি সিংহের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া অনুরূপ প্রবাদ আছে।

ঐতিহাসিক বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার হুগলী হাওড়ার ইতিহাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান সিঙ্গুর, সিংহবাহুর রাজধানী ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই সিঙ্গুর হইতে চারি মাইল উত্তরে সিংহের ভেড়ী নামক স্থানে যে সিংহবাহুর রাজধানী ছিল তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে এবং তদনুযায়ী বর্ত্তমান সিঙ্গুর উক্ত রাজধানীর দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত হইতেছে। প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের প্রধান উপাদান কিংবদন্তী এবং নগর ও অট্টালিকা প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ। ঐগুলি ঐ স্থানে জীবন্ত জ্বলন্ত অবস্থায় বিদ্যমান। যিনি ঐ স্থানটি দেখিবেন তিনি ঐ স্থানের কিংবদন্তী সকল শুনিয়া এবং বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাসমূহের মৃত্তিকা গ্রোথিত ভিত্তি সকল দেখিয়া এবং সিংহলের মহাবংশে বিজয় সিংহের পিতৃরাজ্য সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ উল্লেখ আছে সেগুলির সহিত হুবহু মিল দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

সিংহলের মহাবংশে উল্লেখ আছে, গঙ্গার সমীপে রাঢ়দেশে সিংহ বাহুর রাজধানী ছিল। ঐ স্থানটিও গঙ্গার সমীপবর্ত্তী রাঢ়দেশে অবস্থিত। মহাবংশে উল্লেখ আছে, লঙ্কার নাম সিংহল হইয়াছে বিজয় সিংহের পিতৃরাজ্যের নামানুসারে—বর্ত্তমানেও ঐ স্থানটি সিংহল পাটন নামে পরিচিত। অনেকে অনুমান করেন, সিংহ্‌বংশের রাজ্য বলিয়া লঙ্কার নাম হইয়াছে সিংহল। কিন্তু যেহেতু বিজয় সিংহের পিতৃরাজ্যের রাজধানীর নাম দেখা যায় সিংহল পাটন তখন মনে হয়, বিজয় সিংহ পিতৃরাজ্যের নামানুসারে লঙ্কার নাম রাখিয়াছিলেন সিংহল। নতুবা সিংহল এই একই নাম দুইটির বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান থাকার কি অর্থ হইতে পারে?

["প্রবাদ আছে ; পূর্বে সিঙ্গুরে সিংহবাহু রাজা বাস করিতেন। তৎপুত্র বিজয় সিংহ সমুদ্রপথে লঙ্কা বা তাম্রপর্ণী দ্বীপে গিয়া তাহা জয় করিয়া সিংহল নাম রাখেন ; এখনও সেই নাম চলিতেছে। সিঙ্গুরে সিংহের ভেড়ী রতনপুর, দক্ষিণ মসাট (মশান) প্রভৃতি গ্রামগুলি পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দেয়। সিংহদিগের রাজত্বস্থান যে পূর্ব্বে একটি দ্বীপ ছিল এবং প্রথমে তাঁহারা রাজ্য স্থাপনের সময়ে উহার নাম সিংহল দ্বীপ রাখিয়াছিলেন, তাহা প্রচলিত কবিতা হইতে জানা যায়। পরে বিজয় সিংহ যখন লঙ্কাদ্বীপে বিজয়পতাকা উড্ডীন করেন, তখন নিজের বাসভূমির আদর্শে তাহারও নাম সিংহল দ্বীপ রাখেন, ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।" যশোহর খুলনার ইতিহাস—১৩৮ পৃঃ সতীশচন্দ্র মিত্র. বি. এ.]

["হুগলী জেলার বন্দিপুরের চারি মাইল ঈশানকোণে সিংহল পাটন গ্রাম আছে। এখন লোকে তাহাকে সিংহের ভেড়ী বলে। সেখানে ঘেয়া নদীর ধারে ইষ্টক নির্ম্মিত একটি স্থান (Jetty), আছে সেই স্থানে নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি বাঁধা থাকিত এরূপ প্রবাদ আছে। গ্রামের মধ্যে একটি জঙ্গলে ইষ্টকস্তূপ আছে, তাহাই রাজধানী ছিল বলিয়া লোকে দেখাইয়া দেয়। গ্রামে এখনও বড় বড় পুকুর আছে (অর্দ্ধমজা) তন্মধ্যে তালা, ভোমরা উল্লেখ-যোগ্য।" মহানদের ইতিহাস—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৯৫ পৃঃ]

মহাবংশে উল্লেখ আছে বিজয় সিংহ লঙ্কা দ্বীপে গিয়া তত্রস্থ নিম্ন জলাভূমিতে ধান চাষের সুব্যবস্থার জন্য তাঁহার পিতৃরাজ্যের দৃষ্টান্তানুযায়ী বহু বাঁধ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এ দেশেও ঐ সিংহল পাটন রাজধানীর চতুঃপার্শ্বে ঠিক ঐরূপ বহু সংখ্যক বাঁধ আছে। এদেশে অন্যত্র ঐরূপ বহু সংখ্যক বাঁধ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। মহাবংশে উল্লেখ আছে, বিজয় সিংহ বঙ্গাধিপের দৌহিত্রের পুত্র ছিলেন*এবং তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলেন। এ দেশেও তৎকালে তাম্রলিপ্তরাজকেই বঙ্গাধিপ এবং গঙ্গারাঢ়ী বংশীয় বলিত। বর্ত্তমানে সিংহল পাটনের ধ্বংসস্তূপের চতুর্দ্দিকে যে সকল সাহু,

সেনাপতি, সামন্ত প্রভৃতি উপাধিধারি মাহিষ্যগণ বাস করিতেছেন, *যাঁহাদিগকে সিংহ বাহু ও তাঁহার সেনাপতি ও সামন্তগণের বংশধর* বলিয়া সকলের দৃঢ়মত এবং তাঁহারা যে তাম্রলিপ্ত হইতেই আসিয়াছিলেন, তাহারও জাগ্রত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এতদঞ্চলের সকলেই বলিয়া থাকেন যে, "পিতামহদিগের নিকট শুনিয়াছি তমলুক হইতে আগত দক্ষিণ দেশীয় মাহিষ্যগণই, উক্ত সাহু, সামন্ত প্রভৃতিগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ এতদঞ্চলের বৃহৎ বৃহৎ বাঁধগুলি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।" আবার অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, ঐ সকল ব্যক্তি অর্থাৎ ঐ সকল পিতামহগণও তাঁহাদের পিতৃপুরুষদিগের নিকট হইতে ঐরূপ শুনিয়া আসিতেছেন। এইভাবে পুরুষ পরম্পরায় ঐ কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে। ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া যাঁহারা ঐ স্থানটি পরিদর্শন করিবেন, তাঁহারা স্থানীয় পরিবেশ এবং কিংবদন্তীগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ স্থানটিই বিজয় সিংহের পিতৃরাজ্য ছিল।

বিজয় সিংহের বংশধরগণ, তথা বাঙ্গলার প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণ কিভাবে বাঙ্গলার জলাভূমিতে ধানের চাষে মনোনিবেশ করিয়া সম্পূর্ণ একটি কৃষক জাতিতে পরিণত হইলেন, যাহা বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণের ধ্যান ধারণার অতীত, তাহার একটি সুন্দর প্রতিচ্ছবি—সিংহলের একটি প্রাচীন ইতিহাস (যাহা মহাবংশ অবলম্বনে লিখিত) হইতে উদ্ধৃত—নিম্নের বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

["**Ceylon-Tenement—Vol. I.**

Sir James Emerson Tenement

K. C. S. LLD. & C.

Published in 1860

Page 335—Whatever may have been his (Bijoy's) first intention, his subsequent policy was rather that of an agriculturist than an apostle.

In a low level country like the North Ceylon where the *chief subsistence of people is rice—a grain that can only be* successfully cultivated under water, the first requisites of the society are reservoirs and canals. The Buddist Historian extol the father of Bijoy for his judgment and skill in foming villages in situation favourable for irregation.

They took every care for the improvement of agriculture. The king and pretty princes attended the interest which was felt in promotion of agriculture by giving personal attention to the formation of tanks and to the labourers of cultivation.

Page 352—The genius of the Gangatic race which had better possession of Ceylon was essentially adapted to agricultural persuits. Busied with such employments the early colonists had no leisure for military services."]

["পৃথিবীর ইতিহাস শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী ১৫৩ পৃঃ।"

প্রাচীনবঙ্গের গৌরববিভব

সিংহলদ্বীপে প্রাচীনকালের বহু শিল্প সম্পদের ও স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। সিংহলের প্রাচীন সভ্যতার একটি বিশেষ পরিচয়চিহ্ন জলসঞ্চয় ও জলনিঃসরণ ব্যবস্থা। সুবৃহৎ পুষ্করিণী বা কৃত্রিমহ্রদসমূহ। প্রবল বন্যার কবল হইতে সিংহলকে রক্ষা করিয়া কি প্রকারে কৃষির উন্নতি বিধান করিতেছে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। Mr. Afred Deakin (vide Irrigated India) বলিয়াছেন সিংহল দ্বীপের কৃত্রিম জলাশয়গুলির বাঁধের পরিমান মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর জলাশয়গুলির বাঁধের পরিমান যোগ করিলে যে যোগফল হয় তাহা ছয় ফিট উচ্চ প্রাচীরে ভূগোলককে সম্পূর্ণরূপে একবার এবং অর্দ্ধেকভাবে একবার বেষ্টন করা যায়। সিংহলদ্বীপের জলাশয়াদির ও জল সেচনের বিষয় যিনিই আলোচনা করিয়াছেন তিনিই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। এ বিষয়ে আধুনিক স্থপতিগণকেও আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। খ্রীষ্ট জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বাঁধ বাঁধিয়া এইরূপ জলাশয় প্রস্তত হইয়াছিল। কিন্তু এই স্থাপত্যে বাঙ্গলাদেশের প্রভাব পরিদৃশ্যমান অনেকেই বোধহয় তাহা অবগত নহেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণা প্রভাবেই

এখন সে তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিজয় সিংহের সিংহল অধিকারের পূর্ব্বে তথাকার অধিবাসীগণ কৃষিকার্য্যে অনভিজ্ঞ ছিল।"]

কেহ যদি আলোচ্য প্রবন্ধের এতদ্দেশীয় সিংহল পাটন (সিংহের ভেড়ী) ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানগুলি দেখেন তাহা হইলে অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন সেখানকার বাঁধগুলি দেখিয়া। এই বাঁধগুলির অনুকরণেই সিংহলে বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। মাদ্রাজেও যে বাঁধগুলির উল্লেখ করা হইল সেইগুলিও এতদ্দেশীয় বাঁধের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল মনে হয়। কারণ বিজয় সিংহ লঙ্কা দ্বীপ জয় করিবার পূর্ব্বে কিছুকালের জন্য মাদ্রাজে অবস্থান করিয়াছিলেন এই বিষয়টি কোন কোন ইতিহাসে উল্লেখ আছে। তমলুকের ইতিহাস, সেবানন্দ ভারতী ১৫৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

["তামিল দেশে বিজয় সিংহের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল তাহা সেখানকার ইতিহাসে প্রকটিত আছে।" পৃথিবীর ইতিহাস ৪র্থ খণ্ড ১৬০ পৃঃ শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী]

মনে হয় প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাম্রলিপ্ত রাজের সহিত বিজয় সিংহের এই সম্বন্ধটুকু স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণের বিষয়ে উল্লিখিত ঐ সকল তত্ত্বও সবিশেষ অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু আর্য্য ক্ষত্রিয়গণের চাষী কৈবর্ত্ত নাম প্রচলনের কারণ ব্যাপারে তাদৃশ মনোযোগ না দিয়াই উহাদের সহিত মহাভারতে উল্লিখিত ক্ষত্রিয়গণের সম্বন্ধ স্থিরিকরণের জন্য নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন।

["বাঙ্গলার ইতিহাস ৺রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম খণ্ড ২৪ পৃঃ— প্রাচীন সাহিত্যে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক মগধ ও বঙ্গবিজয়ের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং কোন্ সময়ে আর্য্যগণ মগধও বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সিংহলের ইতিহাসে জানিতে পারা যায় যে খৃঃ

পৃঃ ৬ষ্ঠ শতকে বিজয় সিংহ নামক বঙ্গদেশীয় কোন রাজপুত্র সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার মূলে কোন সত্য আছে কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে ইহা যদি প্রকৃত হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে খ্রীষ্টের জন্মের ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে মগধে ও বঙ্গে আর্য্যসভ্যতা প্রচারিত হইয়াছিল। বিজয় সিংহ অনার্য্য নাম নহে। সুতরাং তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে বঙ্গ ও মগধের অধিবাসিগণ পুরাতন রীতি নীতি পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যসভ্যতা ও আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছিলেন।"]

মহাভারতে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে তাম্রলিপ্তরাজের উপস্থিতির উল্লেখ হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে তাম্রলিপ্তরাজ খাঁটি ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজ মতানুযায়ী তিনি তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে প্রথম খণ্ডে ২৫পৃঃ লিখিয়াছেন যে—

["প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায় বড় বড় খাঁটি আর্য্যগণ, এমন কি যাঁহারা আপনাদিগকে খাঁটি ভরতবংশীয় বলিয়া গৌরব করিতেন তাঁহারাও বিবাহসূত্রে বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।"]

এইরূপ মন্তব্য হইতে মনে হয় তাঁহার মতে তৎকালেও বঙ্গেশ্বর অনার্য্য ছিলেন এবং আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের পূর্ব্বে এ দেশে আর্য্যগণের বাস ছিল না বলিয়া যে প্রবল মতবাদ চলিতেছে তিনি তাহারই সমর্থক। অথচ তাঁহার ন্যায় বাঙ্গলার ইতিহাস উদ্ধারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে অতি অল্প লোককেই দেখা যায়। তাঁহার এক এক খণ্ড বাঙ্গলার ইতিহাস পড়িতে অতি বড় ধৈর্য্যশীল পাঠকেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। "পাষাণের কথা" ও শত শত তাম্রশাসনের বিবরণ পাঠ করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া পাঠকের পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। কিন্তু তাঁহার এই কঠোর পরিশ্রমের দ্বারাও বাঙ্গালী জাতির সত্য ইতিহাস যে সম্যক্ উদ্ধারপ্রাপ্ত হয় নাই এবং এ বিষয়ে তৎপরবর্ত্তী গবেষণা

অবান্তর বা নিষ্প্রয়োজন নয়, ক্রমবিকাশমান তথ্যাদি হইতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। একটি সুপ্রাচীন জাতির অতীত ইতিহাস উদ্ধার কোন একজনের দ্বারা সমাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। ইহা বহু সময় ও শ্রম সাপেক্ষ। জাতির বিগত কীর্ত্তি-কাহিনী তাহার সুপ্ত শক্তিকে সচেতন করে এবং গৌরবময় ঐতিহ্য রক্ষার প্রেরণা দান করে। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সাদৃশ্য বিশ্লেষণ ও যোগসূত্র প্রদর্শনও ঐতিহাসিকের অন্যতম কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ দেশের অতি অল্প ঐতিহাসিকই এই ধারণা সম্যক্ নিষ্ঠা সহকারে পোষণ করিয়া সত্য উদ্ঘাটনে আবশ্যকীয় শক্তি ও সাহস প্রদর্শন করেন।

এই কারণেই আমাদের অধিকাংশ ইতিহাস যেন "ঠাকুরমার ঝুলির" রাক্ষসদের গল্পের মত। কোন সুদূর অতীতে তাহারা বিদ্যমান ছিল এবং "স্ফটিক স্তম্ভের ভ্রমরের" মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সুদূর অতীতেই তাহারা লোপ পাইয়াছে। বর্ত্তমানে যে সমস্ত জাতি বিদ্যমান আছে তাঁহাদের সহিত অতীত যুগের দেশবাসিগণের যেন কোন সম্বন্ধই ছিল না। যদি বিজয়সিংহের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশের সমগ্র রাজন্যবর্গ অনার্য্য ছিলেন এই মত সমর্থন করিতে হয়, তাহা হইলে কোন্ জাতি বর্ত্তমানে তাহাদের বংশধর, তাহা কি নির্দিষ্টভাবে দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল না? সে দিকে কেহই উদ্যোগী নহেন। অত বড় অতীত গৌরব কাহাদের প্রাপ্য হইবে? তারপর যদি সে কাল আর্য্য-শাসনের কাল প্রমাণিত হয় তাহা হইলে সেই আর্য্য বর্ত্তমানে কাহারা? রাখাল দাস বাবু বলিয়াছেন, খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে আর্য্য সভ্যতা প্রচারিত হইয়াছিল। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে না কি, যে আর্য্যগণ কিভাবে আর্য্য সভ্যতা এদেশে প্রচার করিয়াছিলেন? তাঁহারা কি এ ক্ষেত্রে মহর্ষি নারদের হরিনাম

প্রচারের নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন? বগলে আনন্দলহরী লইয়া আর্য্যগুণগান কীর্ত্তন করিয়া আর্য্য সভ্যতা প্রচার করিয়াছিলেন? ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে ভাবে আর্য্য ক্ষত্রিয়গণ অসি হস্তে দেশ জয় করিয়া আর্য্য সভ্যতা ও প্রাধান্য স্থাপিত করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশে কি তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল? আর, যদি উক্ত ব্যতিক্রমেরই প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহা হইলে পুরাণে বর্ণিত অসংখ্য দেব-দৈত্যগণের সংগ্রামগুলির, যথা—গয়ায় গয়াসুরের, পুণ্ড্রবর্দ্ধনে বলি রাজার বর্ণনা কি কেবলমাত্র আষাঢ়ে গল্প, না তাহার কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে? এ সম্বন্ধে পৃথিবীর ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত নিম্নের বিবরণগুলি দেওয়া হইল।

[পৃথিবীর ইতিহাস—শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী। ৪র্থ খণ্ড ১৪১ পৃঃ—প্রাচীন বঙ্গের গৌরব বিভব।

"সমষ্টিভাবে বিচার করিতে গেলে পুরাবৃত্তে ভারতবর্ষের যেমন গৌরব গরিমার অবধি নাই, ব্যষ্টিভাবে বিচার করিতে গেলে ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত এই বাঙ্গলাদেশের তেমনি তুলনা নাই। সমষ্টিভাবে তুলনা করিতে গেলে ভারতবর্ষের সভ্যতার প্রাচীনত্ব যেমন পৃথিবীর সকল দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, ব্যষ্টিভাবে বিচার করিতে গেলে বঙ্গদেশকেও তেমনি সভ্য জনপদের অঙ্গীভূত বলিয়া বুঝা যায়। এ কথায় হয়তো এক সম্প্রদায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন, "বঙ্গদেশ সবেমাত্র সেদিন সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে, বঙ্গদেশের আবার প্রাচীনত্বের গৌরব গরিমা কি আছে? তাঁহারা আরও বলিবেন, এ একটা অনার্য্য দেশ, এদেশে আসিতে হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ইহার আবার গৌরব গরিমা কি আছে, কি জানি কি কারণে, কি জানি কাহার কোন উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এ সকল কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলে, একটু গবেষণা করিলে, বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এ সকল ভ্রান্ত ধারণা অনায়াসে দূর হইবে।"]

পৃথিবীর ইতিহাস লেখকের উপরোক্ত মন্তব্য—"কি জানি কি কারণে, কি জানি কাহার কোন উদ্দেশ্য ব্যপদেশে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এই সকল কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে"।

এই কারণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখক নিজমত প্রকাশে ইতস্ততঃ করিলেও যাঁহারা প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন, ইহা সেই বল্লালী বিষোদগারের জের যাহা এক শ্রেণীর সুবিধাবাদীরা এখনও আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। যতই বাঙ্গলার ইতিহাস উদ্ধারের নব নব দ্বার উদ্ঘাটিত হউক, যতই সিংহলের মহাবংশ, অজন্তার গিরিগুহা, যাভা সুমাত্রার প্রাচীন ইতিহাস, তিব্বতে ও নেপালে সংরক্ষিত রাশি রাশি বৌদ্ধগ্রন্থ তাহার জীবন্ত জ্বলন্ত প্রমাণ দিক না কেন, সবই ভস্মে ঘৃতাহুতির অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। এখন আবার কোন কোন বাঙ্গালী পণ্ডিত আবিষ্কার করিতেছেন, বিজয় সিংহের জন্মভূমি ছিল পশ্চিম ভারতে, গুজরাটে; যদিও বোম্বাই গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে পূর্ব্ব ভারতীয় উপকূলের অধিবাসিগণই ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপ সকলে উপনিবেশ স্থাপনকরিয়াছিলেন।

["Journal, Bombay Branch of R. A. S. XVII,
তমলুকের ইতিহাস—সেবানন্দভারতী, ১৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।"]

["ভারতবর্ষ যখন সভ্যতার উচ্চচূড়ায় সমারূঢ়, জ্ঞানসূর্য্য যখন ভারতবর্ষে মধ্যাহ্নকিরণ বিকিরণ করিতেছে, এই বঙ্গদেশও তখন সর্ব্ববিষয়ে সমুন্নত ছিল। জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র স্বরূপে পরিগণিত হইত। পবিত্রভূমি পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারিত। আমার জন্মভূমি বলিয়া অযথা গৌরব খ্যাপন করিতেছি না। জগতের বিভিন্ন প্রদেশের কীর্ত্তিকাহিনী কীর্ত্তন করিয়া যে দুই চারিটি বিষয়ের সন্ধান পাইতেছি তাহাতেই প্রকৃত বিষয় উদ্ঘাটিত হইবে। প্রাচীন বঙ্গের গৌরব বিভবের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

অধুনা সংহিতার একটি শ্লোকে দৃষ্ট হয়—

"অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।
তীর্থ যাত্রা বিণাগচ্ছন পুনঃসংস্কারমর্হতি।"

মনুসংহিতার ঐ শ্লোকটি যে প্রক্ষিপ্ত, বঙ্গদেশের প্রতি বিদ্বেষ বিশিষ্ট কোন পণ্ডিতদ্বারা রচিত হইয়া মনুসংহিতায় প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, একথা পুনঃ পুনঃ আমরা বলিতেছি। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি মনুসংহিতায় কোন্ সময়ে, কেমনভাবে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহাও আজ প্রদর্শন করিতেছি। ইউরোপীয়গণ যে সকল সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে জার্মানির প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডকৃটর জুলিয়াস জলি কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ অসংখ্য পাণ্ডুলিপি দৃষ্টে সঙ্কলিত হইয়াছিল। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে লণ্ডন সহরে যে গ্রন্থ প্রকাশিত ও মুদ্রিত হয়, বলা বাহুল্য ঐ গ্রন্থে "অঙ্গ. বঙ্গ, মগধেষুচ-ইত্যাদি শ্লোকটি নাই। প্রাচ্যের পবিত্র পুস্তক সংক্রান্ত গ্রন্থখানিতে অধ্যাপক ডি. বুলার মনুসংহিতার যে সংস্করণ প্রকাশ করেন তন্মধ্যেও ঐ শ্লোকটি দৃষ্ট হয় না। রাওসাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মাণ্ডলিক সি. এস. আই. মহোদয় ষড়বিংশ টীকা সমন্বিত যে সংহিতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও ঐ শ্লোকটি নাই। ফলতঃ নিরপেক্ষ ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রাচীন কোন মনুসংহিতার মধ্যে ঐ শ্লোক পাওয়া যায় না। সুতরাং পূর্ব্বে কোন পুঁথিতে ছিল না বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পরবর্ত্তীকালে কোন দুরভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক শ্লোকটি মনুসংহিতার পুঁথির মধ্যে সংযোজিত হইয়াছিল। মহর্ষি মনু আর্য্যাবর্ত্তের পবিত্র স্থানের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন হিমালয়ের দক্ষিণস্থিত বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর, পূর্ব্ব পশ্চিমে সাগর বেষ্টিত যে ভূখণ্ড। তিনিই আবার উহাকে অপবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিবেন, ইহার অধিক বিসদৃশ আর কি হইতে পারে?

অঙ্গ বঙ্গ, কলিঙ্গ সকল স্থানেই পীঠস্থান আছে। ইহাদের অধিকাংশের মধ্য দিয়া সুরধুনি পতিতপাবনী জাহ্নবী প্রবাহিতা, এই সকল স্থান কি অপবিত্র হইতে পারে?

"পৃথিবীর ইতিহাস—শ্রীর্গাদাস লাহিড়ী ৪র্থ খণ্ড ১৪২ পৃঃ।"]

মহাবংশে উল্লেখ আছে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে অর্ণবপোত আরোহণ করিয়া বিজয় সিংহ সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন।

["প্রাচীন বঙ্গের যতই ঐশ্বর্য্য বিভব থাকুক, অনেকেরই হৃদয়ে বদ্ধমূল বিশ্বাস বঙ্গ কখনও শৌর্য্য বার্য্যে গৌরব সম্পন্ন ছিল না। কি মানুষ, কি প্রকৃতি, সকলেই বঙ্গের প্রতি এতই বিরূপ যে প্রাচীন বঙ্গের স্মৃতিটুকু মুছিয়া ফেলিবার পক্ষে কেহই ত্রুটি করেন নাই। একদিকে প্রকৃতি বিপর্য্যয়, অন্যদিকে ধর্মবিপ্লব। উভয় প্রকারে বঙ্গের সকল গৌরব ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। সে পরিচয় সন্ধান করিবার জন্য বাঙ্গালীকে এখন আসমুদ্র হিমাচল আলোড়ন করিয়া বেড়াইতে হইতেছে। কোথায় কাশ্মীর, কোথায় সিংহল, কোথায় যবদ্বীপ, কি চিহ্ন কোথায় বিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে তাহাই অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে হইতেছে।

বৌদ্ধ সম্প্রদ্রায় নিপীড়নের একশেষ সহ্য করিয়া সুদূর সিংহল দ্বীপে আশ্রয় লইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ তাহাদের সহিত স্থান পাইয়াছিল। তাহারই একখানি গ্রন্থে, মহাবংশে, আমরা প্রমাণ পাইতেছি যে, খৃঃ জন্মের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের যুবরাজ বিজয় সিংহ বাহুবলে সিংহল দ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন। বিপুল আয়তন অর্ণবপোতে সপ্তশতক অনুচর সহ তিনি উপনীত হন। সিংহল বঙ্গের যুবরাজের অধিকারভুক্ত হয়। বিজয় সিংহের এই সিংহল বিজয়বার্ত্তা যদি মহাবংশে স্থান না পাইত, আর যদি ভারতের অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের ন্যায় মহাবংশের পাণ্ডুলিপি বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হইত, তাহা হইলে বাঙ্গালীর এ পরিচয় আর কোথাও পাইতাম না। বাঙ্গলার সে পরিচয় আর কোথাও পাইবার উপায় নাই। বাঙ্গলার উপর দিয়া এমনি বিপ্লবের বহ্নি বহিয়া গিয়াছে। সে পরিচয় প্রধানতঃ মহাবংশে আর বিদ্যমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অজন্তার গিরিগুহায়। গিরিগহ্বরের প্রাচীর গাত্রে, চিত্রাবলীর মধ্যে কতকাল পূর্ব্বে বিজয় সিংহের সিংহল বিজয় চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। আজ সেই চিত্র দেখিয়া, মহাবংশের বর্ণনার সহিত সেই চিত্র মিলাইয়া, পূর্ব্ব গৌরব স্মরণে আমরা উল্লাসে উৎফুল্ল

হই। বিজয় সিংহের সিংহল অবতরণে কি জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যই প্রকটিত হইয়াছে। সুসজ্জিত হস্তাসমূহ পোত হইতে তীরে অবতরণ·করিতেছে। যুদ্ধার্থ বিরাট উদ্যোগপর্ব্ব, সুদূর বঙ্গদেশ হইতে হয়, হস্তী সমন্বিত সৈন্যপরিপূর্ণ অর্ণবপোতসমূহ ভীষণ সমুদ্র পার হইয়া সিংহলে আপনাদের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিতেছে। ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই ঘটনার চিত্রে বাঙ্গালীর নৌবল, বাহুবল, রণকৌশল, অর্ণবপোত পরিচালনা প্রভৃতি নানারূপে বিবিধ বিভিন্ন শক্তির পরিচয় দেদীপ্যমান নহে কি? পৃথিবীর ইতিহাস—দুর্গাদাস লাহিড়ী ৪র্থ—১৬০ পৃঃ।"]

["আপনার সীমার বাধা যে ভাঙতে পেরেছে, বাহিরের দুর্গম ভৌগোলিক বাধাকেও সে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। সেইজন্য সত্যের ঐশ্বর্য্যকে জানতে হোলে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে বসে ধুলি কলুষিত আবহাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাবো ভারতবর্ষের বাহিরে থেকে। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"]

["প্রায় ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসর হইতে চলিল গৌড়ে-ব্রাহ্মণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। বঙ্গের জাতিয় ইতিহাস ব্রাহ্মণ কাণ্ড, প্রথম ভাগ ৬০ পৃঃ ৺নগেন্দ্রনাথ বসু।"]

["কুরুপাণ্ডবদের সময় বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। কিন্তু তাহারা কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহা জানিবার উপায় নাই।—ঐ পুস্তক ৫৫ পৃঃ"।

"প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের উপর হইতে চলিল বৈদিক মার্গ প্রবর্ত্তক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের পদার্পণে অসভ্য নিবাস বঙ্গভূমি পবিত্রতা লাভ করিয়াছে। পাণিনির সময় হইতে গৌড় নাম সুপরিচিত এবং সুরম্য পুরাদি সুশোভিত ছিল। গৌড়দেশে যে সকল ব্রাহ্মণ আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন পরে তাঁহারাই গৌড়ব্রাহ্মণ নামে সমাজে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছিলেন।

ঐ পুস্তক ৭১ পৃঃ।"]

এখন কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে ৺রাখাল দাস বাবু তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন "যে প্রাচীন আর্য্যগণ কর্ত্তৃক

মগধ বঙ্গ বিজয়ের কোন উল্লেখ দেখা যায় না এবং সিংহলের ইতিহাসে জানিতে পারা যায় খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতকে বিজয় সিংহ নামক কোন রাজপুত্র সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এই ঘটনার মুলে কোন সত্য আছে কিনা ঠিক বলিতে পারা যায় না।” ইত্যাদি কথার অর্থ কি? উপরিল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি অপেক্ষা বাঙ্গলার, ইতিহাস সম্বন্ধে আর কি উজ্জ্বল প্রমাণ থাকিতে পারে?

[“বিজয় সিংহ অনুরাধা নামক এক দক্ষিণ ভারতীয় রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ক্রমে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হোল। লঙ্কাদ্বীপের মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড সহর বানালে। তার নাম দিলে অনুরাধা পুরম্। এখনও সে সহরের ভগ্নাবশেষ দেখলে আক্কেল হয়রান হযে যায়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তুপ, ক্রোশ ক্রোশ ভাঙ্গা বাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।” [পরিব্রাজক—স্বামী বিবেকানন্দ ৫৬ পৃঃ।]

বৈদিক যুগের প্রথমে বাঙ্গলা দেশ আর্য্য অধিকারের বাহিরে ছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ দুই একটি বৈদিক সূক্তের (ঐতরেয় ব্রাহ্মণের) প্রমাণের উল্লেখ দেখাইয়া আদিশূরের কিংবা সেন বংশীয় যুগ পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় আর্য্যগণের বসতি ছিল না বলার সার্থকতা কি? বাঙ্গলা দেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ তো এককালে আর্য্য-বসতির বাহিরে ছিল। সুতরাং বঙ্গদেশের পক্ষে কেবল মাত্র সেই প্রমাণের পুনঃপুনঃ উল্লেখ করার প্রয়োজন কি? মহাভারতীয় যুগের বহু পূর্ব্বে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে আর্য্যাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার অসংখ্য প্রমাণ মহাভারতেই আছে। সুতরাং সেগুলিতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলার ইতিহাসকে কুয়াসাচ্ছন্ন করার সার্থকতা কি?

কবিগুরুর নিম্নলিখিত বাণীটি স্মরণ করা উচিত—

“তোমার লেখনী যেন ন্যায়দণ্ডধরে,
শত্রু মিত্র নির্বিভেদে সকলের 'পরে।

স্বজাতির সিংহাসন উচ্চো করি গড়ো ;
সেই সঙ্গে মনে রেখো সত্য আরও বড়ো।
স্বদেশের চাও যদি তারও উর্দ্ধে উঠো
কোরোনা দেশের কাছে মানুষেরে ছোটো।"

["সিংহল বিজয় :—সিংহলের ইতিহাসে বাঙ্গলার প্রথম প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাতে লেখা আছে যে বাঙ্গলা দেশে সিংহবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয় প্রজাপীড়ন দোষে নির্ব্বাসিত হইলে সাতশত অনুচর লইয়া অর্ণবপোত আরোহণপূর্ব্বক সমুদ্রযাত্রা করেন। অনন্তর অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন এবং তত্রস্থ অধিবাসীগণকে পরাজিত করিয়া সেখানকার রাজা হন। পরে বিজয়ের মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতষ্পুত্র পাণ্ডুবাস বঙ্গদেশ হইতে যাইয়া লঙ্কার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। পাণ্ডুবাসই লঙ্কার রাজবংশের আদিপুরুষ এবং সিংহবংশের রাজা বলিয়া উক্ত দ্বীপের নাম হইয়াছে সিংহল। কথিত আছে, যে বৎসর বুদ্ধদেব মানবলীলা সংবরণ করেন সেই বৎসরেই বিজয় সিংহলে উপস্থিত হন। সুতরাং জানা যাইতেছে যে খৃষ্ঠজন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আর্য্যদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহারা বর্ত্তমান ইংরাজদিগের ন্যায় সমুদ্রপথে যুদ্ধযাত্রা করিয়া বিদেশ জয় করিয়াছিলেন।" প্রাথমিক বাঙ্গলার ইতিহাস—৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, M.A. B.L.—৮ পৃঃ]

বঙ্কিমবাবু উক্ত ইতিহাসখানির জন্য রাজকৃষ্ণবাবুকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ইতিহাসখানি সংক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য বঙ্কিমবাবু দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "রাজা আমাদিগকে মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া বিদায় দিয়াছেন।" পক্ষান্তরে ইতিহাসেয় সার বস্তুর জন্য সুবর্ণ মুষ্টি বলিয়াও প্রশংসা করিয়াছেন।

সিংহবাহুর রাজধানী সিংহল পাটন নগরটি কত দিনে, কি ভাবে কালের করালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল তাহার সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। উক্ত নগরটি যে কুন্তী নদী ও তাহার উপনদীগুলির বন্যায়

নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, কুন্তী নদীর উপনদী ষেয়া ও জুলকিয়া নদীর সঙ্গমস্থলে মাটির নীচে সিংহল পাটন নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।

প্রাচীন সিংহল পাটন নগরটি যে কানা নদীর বন্যা দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে সেই কানা নদীটি দামোদর নদের তৃতীয় প্রবাহ ছিল। প্রথম প্রবাহটি মজিয়া গিয়া যে ক্ষীণ স্রোতস্বতীতে পরিণত হইয়াছে তাহা এখন বেহুলা নদা নামে পরিচিত। দ্বিতীয় প্রবাহ ছিল মহানদ। বর্ত্তমান মহানদ গ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল তাহা এখন সম্পূর্ণরূপে মজিয়া গিয়াছে। তৃতীয় প্রবাহ কানা বা কুন্তী নদী (নিম্নাংশ কুন্তী এবং ঊর্দ্ধাংশ কানা নদী নামে খ্যাত)। এই প্রবাহটি অপেক্ষাকৃত মজিয়া গেলে চতুর্থ প্রবাহ বর্ত্তমান দামোদর নদ, চাঁপাডাঙ্গার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রবাহটিও ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া পড়ায় পঞ্চম প্রবাহের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহা মুণ্ডেশ্বরী নামে খ্যাত হইয়াছে।

দামোদর নদ যখন তাহার দ্বিতীয় প্রবাহ, মহানদ নামক খাতটি দিয়া প্রবাহিত ছিল তখন সিংহল পাটন নগরটি ধনে জনে পরিপূর্ণ ছিল। কুন্তী নদী কয়েক বৎসর প্রবাহিত হইবার পর অপেক্ষাকৃত উচ্চ তটভূমি গড়িয়া লইলে বন্যাপ্লাবিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সিংহল পাটনের অধিবাসিগণ ঐ উচ্চভূমিতে গিয়া আশ্রয় লন। এইভাবে গোপাল নগর, আনন্দ নগর প্রভৃতি গ্রামগুলির সৃষ্টি হয়। বিশেষ অনুসন্ধান ও পর্য্যালোচনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উক্ত অঞ্চলস্থিত প্রাচীন সাহু বংশগুলিই সিংহ বাহুর বংশধর। সিংহবাহুর অপভ্রংশে সাহু শব্দে পরিণত হইয়াছে।

সমতটরাজ্য

চন্দ্রবংশীয় বলিরাজের পঞ্চপুত্রের নামে পঞ্চরাজ্যের মধ্যে অঙ্গ ও কলিঙ্গ বর্ত্তমান বাঙ্গলা হইতে বাদ পড়িয়াছে। বর্ত্তমান বাঙ্গলার মধ্যে পড়ে পুণ্ড্র সুহ্ম ও বঙ্গ। তন্মধ্যে পুণ্ড্র রাজবংশটি অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে লোপ পাইয়াছিল। পরবর্ত্তীযুগে পুণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী গৌড়ের নামানুসারে গৌড়রাজ্য নামে খ্যাত হইয়াছিল। সেই রাজবংশ লোপ পাওয়ায় বঙ্গরাজ (সমতটরাজ) রাজভট্ট বংশীয় গোপালদেবকে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। তাঁহারই বংশকে পালবংশ বলা হয়।

সুহ্ম ও বঙ্গ এই দুইটি রাজবংশ বৈদিকযুগ হইতে অবিমিশ্র শোণিত ধারায় অদ্যাপি বিদ্যমান। পৃথিবীর প্রাচীন রাজবংশগুলির মধ্যে যে গুলি আজও বর্ত্তমান আছে তন্মধ্যে এই দুইটি রাজবংশ প্রাচীনতম বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহাদের যেরূপ সম্মান পাওয়া উচিত ছিল বর্ত্তমান বাঙ্গালীদের নিকট ঠিক তাহার বিপরীত ব্যবহার পাইতেছে। এই প্রাচীন বঙ্গরাজবংশটিও তমলুক রাজবংশের ন্যায় ইতিহাস সৌরজগতে রাহুগ্রস্থ। বর্ত্তমান ইতিহাস গুলির পৃষ্ঠায় ইহাদের নামেরই উল্লেখ দেখা যায় না। অথচ বৌদ্ধ যুগে এই দুইটি বংশের অবদানে ভারতবর্ষ সমগ্র বিশ্বের নিকট গৌরবান্বিত। সমতটরাজবংশের শাখা পালবংশের শাসন বাঙ্গলার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ যুগ। এই বংশেরই শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত ও অতীশ দীপঙ্করের নিকট সমগ্র পৃথিবীর বিদ্বৎ সমাজ শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিয়াছে।

["বৌদ্ধযুগে ক্ষত্রিয়গণই নরশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন।" হাওড়া হুগলির ইতিহাস ১২৭ পৃঃ ৺বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য।]

["It is interesting to note that Buddhism first took root in Magadha, a part of nothern India, where Brahminism was weak. It spread gradually west and north and many Brahmins •joined it. To begin with, it was essentially a khatria movement but with a popular appeal. Discovery of India (page 141) Pandit J. L. Neheru"]

সমতটরাজবংশ সম্ভূত শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত ও অতীশ দীপঙ্কর ভিন্ন আরও বহু মনীষী ও কীর্ত্তিমান পণ্ডিত প্রাচীন বাংলার ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশ উত্তর বরেন্দ্রের রাজবংশগুলির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রগোমী, উড্ডিয়ানরাজ ইন্দ্রভূতির পুত্র পদ্মসম্ভব এবং জগদ্দল বিহারের প্রধান আচার্য্য বিভূতি চন্দ্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

["চন্দ্রগোমী কেবল বাঙ্গলা নয়, একদা এই বৌদ্ধ পণ্ডিতের নিষ্কলঙ্ক যশের সৌরভ নাকি সমগ্র জম্বুদ্বীপকে আমোদিত করিত। তিনি ছিলেন একাধারে বৈয়াকরণ, কবি, নাট্টকার, নৈয়ায়িক এবং বৌদ্ধতন্ত্রের একজন শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা ও লেখক। তাহা ছাড়া তিনি জ্যোতিষ, সঙ্গীত, নানা সুকুমার কলা, আয়ুর্বেদ প্রভৃতিতে ও বুৎপন্ন ছিলেন। এক জীবনে এতগুলি বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করা বড় খেলা কথা নয়। বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম।" শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত—৫৮ পৃঃ]

["সাহুর রাজবংশ সম্ভূত শান্তরক্ষিতের ভগ্নীর সহিত উড্ডিয়ানের রাজা ইন্দ্রভূতির পুত্র পদ্মসম্ভবের বিবাহ হইয়াছিল। শান্তরক্ষিতের সহিত পদ্মসম্ভবও তির্ব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্ম—১৪৮ পৃঃ]

পদ্মসম্ভবের জন্মস্থান উড্ডিয়ান সম্বন্ধে নানা পণ্ডিতের নানা মত দেখা যায়। কেহ পশ্চিম ভারতে, কেহ উত্তর পশ্চিম ভারতে বলিয়াছেন। শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্তের মতে উত্তর বঙ্গ হওয়াই যুক্তিযুক্ত (বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম ১৪৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। যেহেতু শান্তরক্ষিতের ভগ্নীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল তখন তিনি নিশ্চয়ই বাঙ্গালী হইবেন। তৎকালে অবাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালীর বিবাহ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। এই উড্ডিয়ানেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের বজ্রযান মতের উদ্ভব বলিয়া বর্ণিত আছে। জগদ্দল বিহারের প্রধান আচার্য্য বিভূতিচন্দ্র রাজপুত্র ছিলেন। তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের টিকা-টিপ্পনী লিখিয়াছিলেন। (বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম—১৮০।৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

উপরে যে ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত পণ্ডিতগণের নাম উল্লেখ করা হইল তাঁহারা সকলেই মাহিষ্য ক্ষত্রিয়। কারণ তৎকালে বরেন্দ্রভূমিতে ক্ষত্রিয় বলিতে একমাত্র মাহিষ্য ক্ষত্রিয়গণকেই বুঝায়। শান্তরক্ষিতের ভগ্নীর সহিত পদ্মসম্ভবের বিবাহ তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

["হুয়েন সাং মগধ হইতে বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন সম্ভবত: ৬৩৯ খৃঃ অব্দে। তিনি সমতটে দুই হাজার স্থবিরবাদী ভিক্ষুকে অবস্থান করিতে দেখিয়াছিলেন। বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম ৪৯ পৃঃ' শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত।

"সমতটে তখন ছিলেন এক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত। এই বংশে জন্মিয়াছিলেন বাঙ্গলার অন্যতম গৌরব শীলভদ্র। ঐ পুস্তক ৫৪ পৃঃ"

"হুয়েন সাংএর ভারত ত্যাগের পর এবং ৬৭৩ খৃঃ অব্দে ই-ৎসিংয়ের ভারতে আগমনের পূর্ব্বে যে বহুসংখ্যক চৈনিক পর্য্যটক আসিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ৫৬ জনের উল্লেখ ই-ৎসিং করিয়া গিয়াছেন; এবং তাহাদের মধ্যে সেঙ্গচি নামে জনৈক শ্রমণ-সমতটে আসিয়া তথাকার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা সেখানকার তৎকালীন বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের পক্ষে মূল্যবান। তিনি

বলিয়াছিলেন সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে আসিয়া সেখানে এক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বীকে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিলেন। ঐ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে আসিয়া এক বৌদ্ধকে দেখেন। ইহাতে মনে হয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী রাজ-বংশই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। চীনা ভাষায় রাজার নাম "রাজভট্ট" বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্ম—৬৫ পৃঃ।"

"বাঙ্গালী অতীশ দীপঙ্করের প্রসঙ্গেও তিনি সাহুরের রাজবংশোদ্ভূত বলিয়া একটা উল্লেখ রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয় পাইয়াছেন বলিয়াছেন। ঐ পুস্তক ১৪৯ পৃঃ।" "বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তরক্ষিতও সাহুরের রাজবংশ সম্ভূত বলিয়া উল্লেখ আছে। এই শান্তরক্ষিতই প্রথম তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে যান। ঐ পুস্তক ১৪৮ পৃঃ।

"তিব্বতীয় এক বিবরণ অনুসারে অতীশ দাপঙ্কর বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ৯৮০ খৃঃ অব্দে বজ্রাসনের পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশে বিক্রমপুরের গৌড়ের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পগ-সাম-জোন-জ্যঙ্গের সাক্ষ্যেও তিনি পূর্ব্বভারতের বাঙ্গলার বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন গ্রন্থে অতীশের জন্ম সাহুরে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ঐ পুস্তক ১৬৮ পৃঃ।"

"পগ-সাম-জোন-জ্যঙ্গের মতানুসারে শান্তরক্ষিত যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন অতীশও সেই বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ পুস্তক ১৬৯ পৃঃ।"]

অতীশ দীপঙ্কর বজ্রাসনের পূর্ব্বে সাহুরের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন, তির্ব্বতের ইতিহাস সকলের এই বিবরণ হইতে পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন, বার্জাসনের পুর্ব্বে এই উল্লেখ হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ঐ সাহুর বিহারের কোন স্থান হইবে। কারণ সাধারণত লোকে বুদ্ধগয়াকেই বজ্রাসন বলিয়া থাকেন, বাঙ্গালা দেশে সাহুরের ৬ মাইল পশ্চিমে বর্ত্তমান নায়ার গ্রামে যে বজ্রাসন বিহার ছিল, যাহার ধ্বংস স্তূপকে লোকে এখনও বাজাসনের ভিটা বলেন, তাহার বিষয় পণ্ডিত সাংকৃত্যায়ন বোধ হয় অবগত না থাকার জন্য ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

["বাজাসন হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী সাভার পর্য্যন্ত একটি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ ছিল। তাহাতে সাভারের লোক অনায়াসে ঐ বাজাসন বিহারে যাতায়াত করিতে পারিত।"—বিক্রমপুরের ইতিহাস, ১২৩ পৃষ্ঠা, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।]

এই বাজাসন বিহারেই অতীশের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল এবং এই বাজাসন বিহারের উল্লেখ হইতেই অতীশের জন্মস্থান বজ্রযোগিনী গ্রাম বলিয়া অনেকে মনে করেন।

এই সাভার রাজবংশ পরে বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। এই বংশোদ্ভব রাজা রামপাল বজ্রযোগিনীর পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার নামানুসারে উক্ত রাজধানীর নাম হয় রামপাল। এই রামপালের উত্তরাধিকারী, সেন বংশের আদি পুরুষ, বিজয় সেন। দুর্গাদাস সান্যাল মহাশয়ের সামাজিক ইতিহাসে ৯।১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে—

"রাজা রামপাল পুত্রশোকে কাতর হইয়া শিবভক্ত বিজয় সেনকে স্বীয় রাজ্য দান করেন। সেই হইতে বঙ্গদেশে বৈদ্য রাজত্বের সূত্রপাত হয়।"

এই উল্লেখ হইতে মনে হয়, রাজা রামপাল বিজয় সেনকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই মূল সাভার রাজবংশ শেষ হিন্দু যুগ পর্য্যন্ত আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। পরে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া করদ রাজারূপে রাজত্ব করিতে থাকেন। সেনবংশের রাজ্য বিক্রমপুর পরগণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহারা যে সাভার রাজ্য অধিকার করিতে পারেন নাই তাহা বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

ক্রমশঃ এই বংশের অবনতি ঘটে। বহু অধস্তন পুরুষ তরুরাজ নবাব সরকার হইতে খাঁ উপাধি লইয়া হুগলীর ফৌজদার হন। তাঁহার পরবর্ত্তী পুরুষ যশোবন্ত রায় ঢাকার দেওয়ান ছিলেন। এই

প্রাচীন রাজবংশটি এখনও ঢাকা জেলার রাজকোণ্ডা, গান্ধারিয়াগড় ও ভাকুর্ত্তা গ্রামে বাস করিতেছেন।

["সাভাররাজ হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর তদীয় ভগ্নী রাজেশ্বরীর গর্ভজাত দামোদর মাতুলের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রাজা হরিশ্চন্দ্র হইতে একাদশ অধস্তন পুরুষ রাজা শিবচন্দ্র। রাজা শিবচন্দ্রের পর হইতে এই বংশের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। উহারা সর্ব্বেশ্বর নগর (সাভার) পরিত্যাগ করিয়া কোণ্ডা, গান্ধারিয়া ও চান্দুলিয়া প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে থাকেন। হরিশ্চন্দ্রের দুই কন্যা অদুনা ও পদুনা। ইহাদের সহিত গোবিন্দচন্দ্রের বিবাহ হয়।"—ঢাকার ইতিহাস—পৃষ্ঠা ২৭, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।]

আজকাল কোন কোন ইতিহাসে দেখা যাইতেছে যে, "সমতটে এক ব্রাহ্মণ বংশ রাজত্ব করিতেন। এই বংশের শীলভদ্র তাঁহার সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন।"

হুয়েন সাং বলিয়াছেন, "সমতটে এক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। পরে সেই রাজবংশ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন।"

এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী হইতে 'ব্রাহ্মণ' শব্দে দাঁড়াইয়াছে। আরও একশত বৎসর পরে এই 'ব্রাহ্মণ' কথাটাই একটা বড় রকমের ঐতিহাসিক নজির হইয়া দাঁড়াইবে, অথচ এই বংশ এখনও বিদ্যমান এবং তাঁহারা মাহিষ্য (প্রাচীন ক্ষত্রিয়) বলিয়াই পরিচিত।

৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "প্রাচীন বাংলার গৌরব" নামক পুস্তকে (৩০পৃঃ) লিখিয়াছেন, "শীলভদ্র সমতটের রাজার ছেলে, তিনি নাকি এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন।"

এখানে একটু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয় আছে। একদিকে শাস্ত্রী মহাশয়,—যাঁহাকে দেশবাসী বর্ত্তমান বাঙ্গলার ইতিহাসের জনক স্বরূপ মনে করেন—আর অপরদিকে সমতট রাজবংশের ন্যায় বাঙ্গলার একটি বিখ্যাত প্রাচীন রাজবংশ। আবার

একদিকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ নহে, পূর্ণ ঐতিহাসিক যুগ, সপ্তম শতাব্দী, অন্যদিকে পৃথিবী-বিখ্যাত পণ্ডিত শীলভদ্র। এখানে সঠিক জাতি নির্ণয় সম্ভব হইল না, 'না-কি' বলিবার প্রয়োজন হইল। ইহা হইতে মনে হয় যে এক শ্রেণীর চক্রান্তকারীর দল বাঙ্গালার ইতিহাসকে ঢাকিয়া রাখিতে চান, তাঁহাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়ার ফলেই এইরূপ হইয়াছে। অথচ মিথ্যার আশ্রয় না লইয়া দুই তত্ত্ব বজায় রাখা ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি হইতে পারে? যুধিষ্ঠিরের "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" কথার ন্যায়। আর চক্রান্তকারীর দল এইটাকেই তাঁহাদের ব্রহ্মাস্ত্র করিয়া লইলেন। হুয়েন সাং এবং ই-ৎসিং এর বিবরণে পাওয়া যায়, "সমতটের পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী রাজবংশ বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন রাজার নাম ছিল রাজভট্ট।" পাল বংশের আদিপুরুষ গোপালদেবও এই রাজভট্ট বংশীয় বলিয়া উল্লেখ আছে। ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে তিনি রাজভট্ট বংশীয় বলিয়া উল্লিখিত এবং প্রায় সকল ঐতিহাসিকই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আর পালবংশীয়গণ যে ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহার উল্লেখ প্রায় সকল ইতিহাসেই পাওয়া যায়।

[কমৌলি লিপি—বঙ্গানুবাদ :—

(২) সেই (শ্রীহরির) দক্ষিণনয়নরূপী সূর্য্যদেবের বংশে পুরাকালে সকল গুণগরিষ্ঠ বিগ্রহপাল নামক নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"পাদটিকা :—বৈদ্য দেব এই শাসনলিপিতে পালরাজগণকে স্পষ্টাক্ষরে সূর্য্যবংশসম্ভূত অর্থাৎ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গৌড় লেখমালা, পৃষ্ঠা ১৩৭, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়"]

সুতরাং শীলভদ্রকে টানাটানি করিয়া ব্রাহ্মণবংশে লইয়া যাওয়া কিরূপে সম্ভব হইবে? তাহাছাড়া, বাঙ্গলাদেশের মধ্যভাগের কতকাংশ সেন বংশ (বৈদ্য ব্রাহ্মণ) ৪।৫ পুরুষ মাত্র, আর মধ্যরাঢ়ে শূরবংশ

(সদ্‌গোপ) এর কয়েক পুরুষের রাজ্য ছাড়া সমগ্র বাঙ্গলাদেশে বৈদিকযুগ হইতে মুসলমান যুগের পূর্ব্ব পর্যন্ত মাহিষ্য ক্ষত্রিয়গণই শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন। "মঞ্জুশ্রী মূল কল্প" নামক এক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। উক্ত পুস্তকে উল্লেখ আছে, পালবংশ দাসজীবিন এবং "দাসেতু কৃষিকর্ম্মণি"। পূর্ব্ববঙ্গের মাহিষ্যগণ পরবর্ত্তীযুগে কৃষিবিজ্ঞানের আদি প্রবর্ত্তক পরাশর ঋষির নামানুসারে আপনাদিগকে "পরাশর দাস" বলিয়া পরিচিত করেন। এই কৃষি বৃত্তির জন্য তাঁহারা হালিক দাস নামেও অভিহিত হন।

নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন তথ্যগুলি মিল করিলেই সাভার রাজবংশ এবং পাল বংশ যে অভিন্ন তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

["কাহারও মতে সাহোর ঢাকা জেলার সাভার, এই দুই নামের সাদৃশ্য হেতু সাভারই সাহোর,"—বাঙ্গলার বৌদ্ধ ধর্ম্ম—নলিনীনাথ দাসগুপ্ত, ১৪৯ পৃঃ।]

["তিব্বতীয় অপর এক জনশ্রুতিতে ধর্ম্মপালকে সাহুরের রাজা বলিয়া উল্লেখ আছে।" (যেহেতু ধর্ম্মপাল দেবের পিতা গোপালদেব সাভারের রাজবংশোদ্ভূত এবং সাভার হইতেই গিয়া বরেন্দ্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন)—ঐ পুস্তক ১৪৯ পৃঃ।]

["তিব্বতীয় এক বিবরণ অনুসারে অতীশ দীপঙ্কর বিক্রমপুরে গৌড়ের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন।" ঐ পুস্তক ১৬৮ পৃঃ।]

অতএব সাহুর রাজবংশ এবং গৌড় রাজবংশ অভিন্ন, এই প্রমাণও পাওয়া গেল।

এই সাহুর রাজবংশীয়, অতীশদীপঙ্করের পরবর্ত্তী বংশধর (আনুমানিক ৫।৬ পুরুষ অধস্তন) রাজা হরিশ্চন্দ্রের দুইটি কন্যা অদুনা পদুনার সহিত ত্রিপুরা জেলাস্থ প্রাচীন কমলাঙ্ক রাজবংশীয় মাণিক চন্দ্রের পুত্র গোপীচাঁদের বিবাহ হইয়াছিল।

কমলাঙ্ক রাজবংশ মহাভারতে উল্লিখিত প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজবংশ। এই রাজবংশের বংশধর এখনও বিদ্যমান এবং বর্ত্তমানে মাহিষ্য ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত। যথাস্থানে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

পৌণ্ড্র রাজ্য

বাঙ্গলার ইতিহাস নাই, ইহাই একটা প্রচলিত মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু এই মত সঙ্কীর্ণভাবাপন্ন মানুষের অপপ্রচার মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাহার বিপরীত দৃষ্টান্তই দেখা যাইতেছে। এইরূপ জীবন্ত ইতিহাস বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন দেশের নাই। বঙ্গ ও সুহ্মের প্রাচীন রাজবংশের ন্যায়, বোধ হয় পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও কোন প্রাচীনতম রাজবংশ নাই। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহাদের জাতিগত এবং বংশগত মিল অটুটভাবে বিদ্যমান।

প্রাচীন পুণ্ড্ররাজের বংশধর না থাকায় সমতট (বঙ্গ) রাজবংশীয় গোপালদেব পুণ্ড্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এক্ষণে বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয় আছে যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রজাবৃন্দ সকলে মিলিয়া বঙ্গের রাজপুত্র গোপালদেবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন কেন? কেন তাঁহারা পুণ্ড্রবাসীগণের মধ্য হইতেই একজনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন না? ভিন্নদেশীয় রাজপুত্রকে আনার কি প্রয়োজন হইয়াছিল? মহাভারতে উল্লেখ আছে, চন্দ্রবংশীয় রাজা বলির পঞ্চপুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গের নামানুসারে পাঁচটি প্রদেশের সৃষ্টি হইয়াছিল। বঙ্গ ও সুহ্মের বংশধরগণের জাতিগত মিল হইতে জ্ঞাতিত্ব বজায়ের কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই হিসাবে

পুণ্ড্রের বংশধরগণের সহিত মিল থাকা প্রয়োজন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পুণ্ড্ররাজবংশের সহিত এরূপ একটা নিকট সম্বন্ধ বজায় থাকার জন্য উত্তরাধিকারী সূত্রে বঙ্গরাজপুত্র পুণ্ড্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

["বৌদ্ধ ঐতিহাসিক লামা তারানাথ গোপালদেবের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড়রাজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রতিদিন একজন রাজা নির্ব্বাচিত হইতেন, কিন্তু ভূতপূর্ব্ব রাজার পত্নী রাত্রিতে তাঁহাকে সংহার করিতেন। গোপালদেব রাণীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আমরণ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তারানাথের কথা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও উহা হইতে তৎকালীন অরাজকতার কাহিনী জানিতে পারা যায়।" বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—১৬৫ পৃঃ।]

লামা তারানাথের উক্ত কাহিনীটি ঠিক ঐ ভাবে বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও উহার মধ্যে অন্যরূপ ভাবে গভীর ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। মনে হয় তখন হইতেই উত্তরবঙ্গে প্রজাশক্তির একটা প্রাধান্য স্থাপিত হইতেছিল এবং তজ্জন্য প্রজাগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে রাজা নির্ব্বাচিত করিতেন; কিন্তু প্রাচীন রাজশক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী থাকায় রাণী তাহা অগ্রাহ্য করিয়া দমন করিয়া দিতেন। আর যেহেতু গোপালদেব রাজবংশসম্ভূত, সেই কারণে মনে হয় তিনি রাণীর কোন নিকট আত্মীয় হইতেন। এ ক্ষেত্রে রাজা নির্ব্বাচন রাণীর সম্মতিক্রমে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

বর্ত্তমানে কোন কোন ঐতিহাসিক এতদঞ্চলের পুঁড়া নামক একটি তপশীলভুক্ত জাতিকে চন্দ্রবংশীয় বলিরাজপুত্র পুণ্ড্রের বংশধর বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। কি জন্য পুণ্ড্ররাজবংশধরগণ ঐরূপ তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ে পরিণত হইলেন? তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়গণ

ইতিপূর্ব্বে অন্ত্যজ সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য হইতেন। এই অন্ত্যজ সম্প্রদায়ে-গণ্য হওয়ার ঐতিহাসিক অর্থ বিজিত হওয়া। কাহাদের দ্বারা তাহারা বিজিত হইয়াছিলেন? হিন্দুযুগের সর্ব্ব শেষ রাজবংশ নিশ্চয়ই বিজেতাগণের বংশধর এবং সেই বংশধর যদি বিদ্যমান না থাকেন তাহা হইলে রাজধানীর চতুঃপার্শ্বস্থ যে সকল উচ্চ জাতি আছেন তাঁহাদের মধ্যে কোন জাতি শাসনক্ষমতার অধিকারী হওয়া সম্ভব এবং তাঁহাদের সহিত বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনার অধিকারী জাতির সহিত মিল করিয়া তাহাদের জাতি নিরূপণ করিতে হইবে। মনুসংহিতায় বৃষলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে পুণ্ড্রজাতির উল্লেখ আছে এবং অনেকে ইহাদিগকে বিশ্বামিত্র বংশীয় সেই বৃষলত্বপ্রাপ্ত পুণ্ড্রজাতির বংশধর বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু খাঁটি ঐতিহাসিকমতে এইরূপ বৃষলত্ব-প্রাপ্ত যুক্তির কোন মূল্য নাই। ইতিহাসে একমাত্র যুক্তি বিজেতা বিজিতগণকে সংস্কারচ্যুত করিয়া অন্ত্যজ পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। উক্ত তপশীলভুক্ত পুঁড়াজাতি যদি বৃষলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় বংশধর হন তাহা হইলে বৈদিক আর্য্যগণের দ্বারা বিজিত দৈত্যরাজ বলি ও তাহার স্বজাতীয়গণের বংশধর এতদঞ্চলে কাহারা হইবেন? মহাভারতে উল্লিখিত পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজা বলির পুত্র পুণ্ড্র এবং ঐ পুঁড়া জাতি যাহাদিগকে কোন কোন ঐতিহাসিক পুণ্ড্রজাতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন, ঐ দুইটি নামের সমন্বয় কোন ঐতিহাসিকই করিতে পারিতেছেন না। যদি মহাভারতের সত্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে পুঁড়া নাম পুণ্ড্র হইতে স্বতন্ত্র কিংবা পুণ্ড্রদেশের অধিপতি (যদি পুঁড়া জাতিকে পৌণ্ড্রজাতি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়) বলিয়া বলিরাজার প্রথম পুত্র, যিনি ঐ দেশের শাসনভার লইয়াছিলেন তিনি পুণ্ড নামে আখ্যাত হন। এইরূপে বলিরাজের অপর পুত্রগণও বঙ্গ, সুহ্ম, প্রভৃতি সেই দেশের অধিপতি হিসাবে,

(দেশবাচক নাম ব্যক্তিবাচকে পরিণত হওয়ায়) উক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকিবেন।

মনুসংহিতায় যে বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়গণের কথা বলা হইয়াছে, মনে হয়, তাহা বৌদ্ধযুগে ক্ষত্রিয় সংস্কারত্যাগী ক্ষত্রিয়গণের কথা হইবে। আর, যদি একান্ত বিশ্বামিত্রের বংশধর কিংবা পুণ্ড্ররাজের বংশধরগণ বৃষলত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই মতের সমর্থন করিতে হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে পুণ্ড্রক বাসুদেব দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন তিনি নিশ্চয়ই পবিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, প্রথম যে সকল ক্ষত্রিয় আসিয়াছিলেন পুণ্ড্রদেশে তাঁহারা বৃষলত্বপ্রাপ্ত হইলে পরে আর একদল ক্ষত্রিয় আসিয়াছিলেন যাঁহাদের বংশধর পুণ্ড্রক বাসুদেব। আর পুঁড়া জাতি বৈদিক আর্যগণ-দ্বারা বিজিত অবৈদিক আর্য্যজাতি (দৈত্য জাতি) না হইয়া পরবর্ত্তী বৈদিক আর্য্যগণ (ক্ষত্রিয়) দ্বারা বিজিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক আর্য্য (ক্ষত্রিয়) বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। কিন্তু (বাঙ্গালার) ইতিহাসে একই সম্প্রদায়ের মধ্যে অতখানি ব্যবধান দেখা যায় না।

ইক্ষুর অপর নাম পুণ্ড্র। কথিত আছে, উত্তর বঙ্গে সর্ব্বপ্রথম ইক্ষুর চাষ হইত'বলিয়া ঐ দেশ পুণ্ড্র নামে অভিহিত হয়। আবার, ইক্ষুর গুড়ের জন্য গৌড় নামও প্রসিদ্ধি লাভ করে। দেশের নামানুসারে অধিবাসিগণের নাম হয় পুণ্ড্র, এবং তদ্দেশীয় রাজা পুণ্ড্ররাজ নামে অভিহিত হন। এতদ্ব্যতীত ঐ দুইটি বিভিন্ন জাতির নামের সমন্বয় আর কি হইতে পারে? পুঁড়াজাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় জাতি হইতে পারে কি-না এতক্ষণ এই আলোচনা করা হইল। এইবার অনুসন্ধান করিতে হইবে, পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব এবং তাহার স্ব-সম্প্রায়ের বংশধর বর্ত্তমানে কি নামে পরিচিত। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে

যে তাম্রলিপ্ত (সুহ্ম) বঙ্গের (সমতটের) প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণ চাষী কৈবর্ত্ত নামে পরিচিত। পুণ্ড্রবর্দ্ধনে তাহার ব্যতিক্রম হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? বাস্তবেও তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে না। ইহা সর্ব্বজনবিদিত প্রচলিত প্রবাদ এবং সকল ইতিহাসেও দেখা যায় যে সমতট রাজপুত্র গোপালদেব বরেন্দ্রীর প্রজাবৃন্দ কর্ত্তৃক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। বরেন্দ্রীর শ্রেষ্ঠ প্রজাবৃন্দ যাঁহারা তৎকালে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা রাখিতেন তাঁহারা রাজারই জাতি, চাষী কৈবর্ত্ত। রাজবংশ লোপ পাইলে অন্যান্য রাজপুরুষেরা স্বজাতীয় যুবরাজ গোপালদেবকে (সম্ভবতঃ পুণ্ড্ররাজের নিকট আত্মীয়) পুণ্ড্রের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

পুরুবংশীয় বলিরাজ পুত্র পুণ্ড্রের বংশধরগণ যে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হন নাই, এই যুক্তির অনুকূলে আর একটি সত্য প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমান বাঙ্গলায় বলিরাজপুত্র পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ—এই তিন জনের তিনটি রাজ্যের মধ্যে দুইটির—সুহ্ম ও বঙ্গের প্রাচীন রাজবংশ বিদ্যমান এবং তাহারা চাষী কৈবর্ত্ত নামে পরিচিত। আর, পুণ্ড্র রাজবংশ বিদ্যমান না থাকিলেও সেখানে রাষ্ট্রপরিচালনার ভার চাষী কৈবর্ত্তগণের হস্তেই ছিল, তাহা বহু পরবর্ত্তী যুগেও প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, তিনটি রাজবংশ এবং তাহাদের স্বজাতীয়গণ কেহই বৃষলত্ব প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব অটুট রাখিয়াছিলেন এবং ঐ পুঁড়াজাতির সহিত বলিরাজপুত্র পুণ্ড্রের কোন সম্বন্ধ ছিল না। পুণ্ড্রজাতির বৃষলত্ব-প্রাপ্তির অনুকূলে যে যুক্তি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

["বলিরাজপুত্র পুণ্ড্রকর্ত্তৃক পৌণ্ড্ররাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও তথায় আর্য্য সভ্যতা বিস্তারের পূর্ব্বে এতদঞ্চলে অন্য একপ্রকার পুণ্ড্রজাতি বাস করিত বলিয়া বোধ হয়। ঋগ্বেদে ঐতরেয় ব্রহ্মণে ঐ পুণ্ড্রগণকে বিশ্বামিত্র বংশীয় অনার্য্য,

অন্ধ্র, শবরাদি নিকৃষ্ট জাতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত ও হীনাচারী বলিয়া বর্ণনা করা আছে” যথা :—

“অন্তান্ বঃ প্রজাভক্ষীষ্টেতি ত এতেহন্ধ্রা পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ

পুলিন্দা মুতিবা ইত্যুদন্তা বহবো ভবন্তি বৈশ্বামিত্রা

দস্যুনাং ভূয়িষ্টা”।

অর্থাৎ বিশ্বামিত্র ঋষি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রগণকে অভিশাপ দিলেন যে তোমাদের বংশধরগণ পৃথিবীর শেষপ্রান্ত উপভোগ করুক। ইহারাই অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, মুতিব, পুলিন্দ ইত্যাদি নীচ জাতি। এইরূপে বিশ্বামিত্র-পুত্রগণ হইতে দস্যুগণ উৎপন্ন হইয়াছে।” বগুডার ইতিহাস, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৯ শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা বি. এল -প্রণীত।]

এখানে পুণ্ড্র, শবর ও পুলিন্দ একই শ্রেণীভুক্ত উল্লেখ আছে। যাহারা ঐ পৃথিবীর শেষপ্রান্ত ভোগের কারণ এবং শবর, পুলিন্দ জাতির পরিচয় জানেন তাহারা ঐ পুণ্ড্রগণের জাতি নির্ণয় করিতে পারিবেন। শবরগণকে পতিত ক্ষত্রিয় বলায় এবং বলিরাজপুত্রকে তাহাদিগের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বলিয়াই মনে হয়। যদি মনুসংহিতায় কিংবা বেদে থাকে তাহা যে বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পালরাজবংশ

পালরাজবংশ—কিছুকাল প্রাচীন গৌড় রাজ্যে রাজা না থাকায় বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে ও অত্যাচারে গৌড়বাসিগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন। অবশেষে সমগ্র গৌড়বাসিগণ সমবেত হইয়া এই নিদারুণ অবস্থার প্রতিকার কল্পে সমতট রাজবংশীয় গোপালদেবকে গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

["উত্তরবঙ্গে মাৎস্যন্যায় দূর করিবার জন্য সমতটরাজ রাজভট্টবংশীয় বপট্টের পুত্র প্রবল পরাক্রান্ত প্রজারঞ্জক গোপালকে গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন"—হুগলী হাওড়ার ইতিহাস—শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য, ১২৩।২৪ পৃঃ]

গোপালদেবের রাজনীতিকুশলতায় অচিরেই উত্তর বঙ্গে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। গোপালদেব মগধ জয় করিয়া রাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত করিলেন। গোপালদেবের বংশ ইতিহাসে পালবংশ নামে খ্যাত হইয়াছে।

আধুনিক যুগের অধিকাংশ ইতিহাসেই দেখা যায়, "গোপালদেবের বংশ পরিচয় বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না"। এই প্রকারের অপপ্রচার বা মিথ্যাপ্রচার আজকালকার বহু ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ। সত্যের অপেক্ষা যেখানে স্বার্থের প্রাবল্য, সেখানে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি আশা করিতে পারা যায়? অনেকে, তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। বৌদ্ধ কি একটা জাতি? বাঙ্গলা দেশে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ছাড়া আর্য্যগণের অবশিষ্টাংশ সকলেই তো বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে বৈদ্যসম্প্রদায় ছাড়া সকলেই তদবস্থায় আছেন। অথচ সকলেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত। সেনবংশের সম্বন্ধে কেন বলা হয় তাঁহারা বৈদ্য ছিলেন? তাঁহারাও কি বৌদ্ধ হন নাই? কি জন্য তাঁহাদিগকে অধিকাংশ সংহিতায় শঙ্কর শূদ্র জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে? আজকাল আবার সেনবংশ সম্বন্ধে নূতন মত দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারা ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন। যদি তাহাই হয়, সেখানে হিন্দু বলিলেই তো যথেষ্ট হইত।

কিছুকাল (প্রায় ত্রিশ বৎসর) পূর্ব্বে কলিকাতার এক আদালতে, এক দেশবিখ্যাত মামলা ঘটে। কোন এক অধ্যাপক, কোন এক বিখ্যাত নেতার (পরবর্ত্তীকালে মন্ত্রী) নামে এক মামলা দায়ের করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক মহাশয়কে তাঁহার জাতি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন "ব্রাহ্ম"। সেই কথা শুনিয়া আদলত উচ্চ হাসিতে আলোড়িত হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতাস্থ তৎকালীন সংবাদপত্রগুলিতে সেই হাসির নানারূপ বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিহাসে এইরূপ জাতি পরিচয় দিবার প্রসঙ্গে "বৌদ্ধ" কথার উল্লেখে কেহ তো হাসেন না, যেখানে সমর্থকগণ সংখ্যাধিক সেখানে এইরূপই হয়। গোপালদেব সমতটরাজবংশীয় এবং তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন, সে প্রমাণের অভাব আছে কি? স্বার্থের খাতিরে অন্য ঐতিহাসিকগণের নিকট অভাব হইতে পারে; কিন্তু এই ইসিহাসে তাহার ভূয়সী প্রমাণ পাঠ করিতে করিতে পাঠকগণ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িবেন। তিনি উদন্তপুর 'বিহার' প্রতিষ্ঠা করেন।

ধর্মপালদেব—গোগালদেবের পর তৎপুত্র ধর্মপালদেব গৌড়ের সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তিনি কনৌজ জয় করেন। মগধের বিক্রমশীলা বিহার এবং বাংলাদেশে সোমপুর বিহার তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। এই সোমপুর বিহারকে বাংলাদেশের নালান্দা বলিত। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে মাটি খুঁড়িয়া যে ত্রিতল বিহারের ধ্বংসাবশেষ বাহির করা হইয়াছে তাহাকেই সকলে প্রাচীন সোমপুর বিহার বলিয়া অনুমান করেন।

দেবপালদেব—ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল পালবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তাহার সেনাপতি লাউসেন কামরূপরাজ্য ও কলিঙ্গরাজ্য জয় করেন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্য প্রধানতঃ এই বীর লাউসেনের কীর্ত্তি-কাহিনী লইয়া রচিত। সমগ্র উত্তর ভারত এবং দাক্ষিণাত্যের কতকাংশে তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। সমসাময়িক ভারতবর্ষে এতবড় সাম্রাজ্য আর কোন সম্রাট স্থাপন করিতে পারেন নাই।

মহীপাল ও নয়পাল—দেবপালদেবের পর কয়েক পুরুষ ধরিয়া পালবংশের অবনতি ঘটে। মাঝে মাঝে বহু বৈদেশিক শত্রু উত্তর বঙ্গ আক্রমণ করেন। নবম রাজা মহীপাল ঐ সকল বৈদেশিক শত্রুকে বিতাড়িত করিয়া পালবংশের পূর্ব্বগৌরব অনেকাংশে ফিরাইয়া আনেন।

["গৌড় ভিন্ন মিথিলা, মগধ ও বারাণসী প্রদেশও মহীপালের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।" মহীপালের সারনাথ লিপি—হুগলী হাওড়ার ইতিহাস —১৫৯ পৃঃ ৺বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য]

মহীপালের পুত্র নয়পাল ও পিতার ন্যায় তেজস্বী সম্রাট ছিলেন।

[" নয়পাল যখন গৌড়সিংহাসনে তখন নিয়ালতিগীন বারানসী আক্রমণ করিয়াও গৌড়সেনার পরাক্রমে ছয়ঘণ্টার বেশী তিষ্ঠিতে পারেন নাই।"
বঙ্গদেশের ইতিহাস—শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুহ, পৃঃ ১৯]

উক্ত ঐতিহাসিক আরও মন্তব্য করিয়াছেন, "সে সময় নয়পাল যদি পশ্চিমের রাজন্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া মুসলমানদিগকে বাধা দিতেন তাহা হইলে ভারতের ঐতিহাস অন্যরূপ হইত। কিন্তু নয়পাল তাহাদের সহিত মিলিত না হইয়া উদাসীন ছিলেন কেন তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না।"

ঐ বিষয়ে একটু চিন্তা করিলে সহজে কারণ ধরা পড়ে। পালবংশীয়-গণ প্রাচীন ক্ষত্রিয় এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, আর তৎকালীন পশ্চিমের রাজন্যবর্গ শকহূনগণের বংশধর, কনোজ ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞাগ্নিসম্ভূত নবীন ক্ষত্রিয়। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের শিষ্যসম্প্রদায় তৎকালে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী-দিগকে সায়েস্তা করিবার জন্য আবার তাঁহাদিগকে পাষণ্ডদলন নামে অভিহিত করিয়াছেন, আর তাঁহারাও ঐ উপাধি পাইয়া আহ্লাদে আত্মহারা! সুতরাং পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ হইবে কিরূপে? ফলে, ভারত সাম্রাজ্য বিড়ালের পিষ্টকবণ্টনের অবস্থা প্রাপ্ত হইল। অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকা অবিলম্বেই ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হইতে লাগিল।

সম্রাট নয়পালের উৎসাহেই অতীশ দীপঙ্কর বিক্রমশীলার বৌদ্ধ মঠ হইতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে যান।

দ্বিতীয় মহীপাল—সম্রাট নয়পালের পৌত্র, তৃতীয় বিগ্রহপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল অত্যাচারী নরপতি ছিলেন। তাহার অত্যাচারে সমগ্র উত্তরবঙ্গের সামন্তচক্র বিদ্রোহী হইয়া মহীপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে দ্বিতীয় মহীপাল পরাজিত ও নিহত হন এবং সম্মিলিত সামন্তচক্র দিব্যপাল নামক তাঁহারই এক জ্ঞাতি জননায়ককে বরেন্দ্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

বর্ত্তমানে অধিকাংশ ইতিহাসে ঐ ঘটনাটিকে কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। তাঁহাদের লেখার ভঙ্গী হইতে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যেন একজন নিষ্ঠাবান আদর্শ নৃপতির বিরুদ্ধে একজন কৈবর্ত্ত প্রজার অপকীর্ত্তি! ইহা হইতে স্পষ্টই মনে হয় যে, ইহা চাষী-কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য) বিদ্বেষীগণের অপপ্রচার ভিন্ন আর কিছুই নহে। উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ প্রজাশক্তি চাষীকৈবর্ত্ত জাতির দ্বারাই গঠিত। বোধ হয় সেই কারণে প্রজাশক্তির পরিচয়প্রসঙ্গের উল্লেখ পাইয়া গূঢ় অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে 'কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ' শব্দে রূপায়িত করিয়াছেন। কিন্তু আসলে তাহার বিপরীত। ইহা বরেন্দ্রের সমস্ত জাতির, সমগ্র প্রজাপুঞ্জের, সমস্ত সামন্তচক্রের বিদ্রোহ। অত্যাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ। উত্তর বঙ্গের অত্যাচারিত প্রজাপুঞ্জ তাহাদের ত্রাণকর্ত্তার স্মৃতিরক্ষার্থে দিব্যস্তম্ভ নামে যে সুদৃঢ় বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা হইতেই তাঁহার কীর্ত্তির গুরুত্ব, তথা দেশবাসীর শ্রদ্ধার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

[গৌড় লেখমালা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১২৭ পৃষ্ঠা, বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন (কমৌলি লিপি) প্রশস্তি পরিচয়।

৪র্থ শ্লোক—"তস্যোর্জ্জস্বল পৌরুষস্য নৃপতেঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ
পুত্রপালকুলাব্ধি শীতকিরণঃ সাম্রাজ্যবিখ্যাতিভাক্।
তেনে যেন জগত্রয়ে জনকভূলাভাৎ যথাবত্যশঃ
ক্ষৌণীনায়ক ভীমরাবণবধাত্ত্যব্ধার্ণবোল্লংনাৎ"।]

এখানে মহারাজ ভীমপালকে কেবলমাত্র ক্ষৌণীনায়ক—অর্থাৎ দেশনায়ক বলিয়া উল্লেখ আছে।

["মদনপাল দেবের তাম্রশাসন (মন্‌হলি লিপি)
প্রশস্তি পরিচয় (গৌড় লেখমালা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ১৫২ পৃঃ)

৬৫ শ্লোক :—এতস্যাপি সহোদরো নরপতির্দ্দিব্যপ্রজানির্ভর
ক্ষোভাহূত বিধৃত বাসবধৃতি শ্রীরামপালোঽভবৎ।

এখানে মাত্র "দিব্যপ্রজানির্ভর" অর্থাৎ দিব্য প্রজাপুঞ্জের নায়ক বলিয়া উল্লেখ আছে।"]

["গৌড় লেখমালা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ১২৮ পৃঃ। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য বিবৃত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের প্রশংসনীয় উদ্যমে নেপাল হইতে গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত 'রামচরিত' নামক কাব্য আনীত হইয়া (এশিয়াটিক সোসাইটির যত্নে মুদ্রিত হইবার পর তাহার সাহায্যে এই তাম্রশাসনোক্ত ৪র্থ শ্লোকের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বোধগম্য হইয়াছে।"

ঐ পুস্তক—১৩৮ পৃঃ ; "এই প্রশস্তিতে (রামচরিতে) কৈবর্ত্তরাজ ভীম ক্ষৌণীনায়ক বলিয়া উল্লেখিত।"]

শাস্ত্রী মহাশয়ের ভীমকে কৈবর্ত্তরাজ বলিয়া উল্লেখ করার অর্থ, তৎপূর্ব্বে কতকগুলি ঐতিহাসিক ভীমকে ঐ নামে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। সর্ব্বত্রই দিব্যের ও ভীমের পরিচয়প্রসঙ্গে ক্ষৌণীনায়ক উল্লেখ আছে, কোথাও কৈবর্ত্তনায়ক উল্লেখ নাই। ইহা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের সামাজিক আন্দোলনের তীব্র কলুষিত আবহাওয়ায় কতকগুলি জাতি বিদ্বেষপরায়ণ ঐতিহাসিকের সৃষ্ট শব্দ (কৈবর্ত্ত

বিদ্রোহ), উদ্দেশ্য, চাষী কৈবর্ত্তগণের সহিত পালবংশের বিভেদ সৃষ্টি করিয়া ইতিহাসে নাবালক দেশবাসীগণকে বিভ্রান্ত করা।

["মাংসভুজোচ্চৈর্দশকেন জনকভূর্দস্যুনোপধিব্রতিনা।
দিব্যাহ্বায়েন সীতা বাসালংকৃতিরহারি কান্তাস্থ"]

(রামচরিত কাব্য—৩৮ শ্লোক)

"মাংসভুজোচ্চৈর্দশকেন" এই কথাটির দ্বারা দিব্যের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত কাব্যের প্রত্যেকটি শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ। একপ্রকার অর্থে কাব্যের আখ্যানবস্তু রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ এবং দশরথ নন্দন রাম কর্ত্তৃক রাবণবধ করিয়া সীতার উদ্ধার। আর অন্য অর্থ অনুসারে কাব্যের আখ্যানবস্তু, দিব্যকর্ত্তৃক বরেন্দ্রী গ্রহণ, গৌড়েশ্বর তৃতীয় বিগ্রহপালের কনিষ্ঠ পুত্র রাম পাল কর্ত্তৃক দিব্যের উত্তরাধিকারী ভীমকে বধ করিয়া বরেন্দ্রী উদ্ধার।

শেষোক্ত অর্থে—মা + অংশ + ভুজঃ + উচ্চৈঃ + দশকেন = লক্ষ্মীর অংশভোগী উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত। জ্ঞাতিগণকেই লক্ষ্মীর অংশভোগী বলা হয়। এই অর্থে দিব্য মহীপালের জ্ঞাতি, উন্নতঅবস্থাপন্ন। অনেকে এই লক্ষ্মীর অংশভোগীব অর্থ করিয়াছেন বেতনভোগী কর্ম্মচারী। শেষোক্ত অর্থ আদৌ যুক্তি সঙ্গত নহে। অন্যত্র দিব্যের উত্তরাধিকারী ভীমের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ভীম পাল বলিয়া। অতএব দিব্য মহীপালের জ্ঞাতি ছিলেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

["শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন ভদ্রেশ্বর নামক জনৈক চিকিৎসক রামপালের সময়ে পাকশালার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এই ভদ্রেশ্বরের পুত্র সুরেশ্বর স্বরচিত বৈদ্যকগ্রন্থে আপনাকে ভীমপালের সভাসদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুরেশ্বর ও ভীমের সময়ও একই বটে। শাস্ত্রী মহাশয় এস্থলে মনে করেন ভীমপাল ও রাজা ভীম এক ব্যক্তি।" ভ্রান্তি বিজয় ১৭২ পৃষ্ঠা হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

[হুরেশ্বর রাজা ভীমপালের বৈশ্য ছিলেন”—বাঙ্গলার ইতিহাস [illegible] মজুমদার—১২৫ পৃষ্ঠা ।]

বর্ত্তমানকালে কোন কোন ঐতিহাসিকের লেখার হঠকারিতা দেখিয়া সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই বিস্মিত হইবেন। কিন্তু ইহা অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকগণের নিকট অসহনীয় হওয়া উচিৎ। মহারাজ দিব্য ও ভীম সম্বন্ধে, বিভিন্ন ইতিহাস ও উপন্যাস প্রভৃতিতে, যে সকল বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে চরমরূপ প্রকাশিত হইয়াছে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসে।

ই ইতিহাসের শেষ ভাগে মহাবাজ দিব্যের বিজয়স্তম্ভেব একটি ছ।বি দেওয়া আছে। তাহার নীচে লেখা আছে মহারাজ দিব্যের বিজয়স্তম্ভের পবিবর্ত্তে “কৈবর্ত্তস্তম্ভ” আব দিবর দীঘিব পরিবর্ত্তে “ধীবর দীঘি”।

মাহিষ্যজাতিব ইতিহাস অনুশীলনে অবহেলাব সম্যক্ সুযোগ লইযা দিব্যকেই তাঁহাদেব একমাত্র বীব নেতা, এই দৃশ্যটি প্রকটিত করিয়া, তাঁহাকে তাঁহার সুনিপুণ বাক্যজালে হেয প্রতিপন্ন করিবার কতরূপ চেষ্টা কবিয়াছেন তাহা বুঝা যায উক্ত ইতিহাসের ৬৫।৬৮ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে। তিনি দিব্যকে মহাপুরুষ বলার কোন কারণ খুঁজিয়া পান নাই বলিয়াছেন। যিনি দিবব দীঘিকে ধীবর দীঘি বলিয়াছেন তাঁহার নিকট সত্যেব আলোক আদৌ উদ্ভাসিত হয় নাই, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। নতুবা দিব্যকে “উপধীব্রতী” বলিয়া সন্ধ্যাকর নন্দী যে গালি দিয়াছেন সেই গালির ছাই ভস্মেব মধ্যেই দিব্যের মহত্ত্বের মণি লুক্কায়িত আছে বুঝিতে পারিতেন। “উপধীব্রতী” অর্থে ভণ্ডতপস্বী। দিব্য সমগ্র দেশবাসিগণের নিকট তপস্বী, দেশের ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত ছিলেন; কেবল মাত্র তাঁহার পরম শত্রু-পক্ষের কবি সেই নামটি বিকৃত করার একান্ত প্রয়োজন বোধে তপস্বীর

(ত্রাণ কর্ত্তার) পরিবর্ত্তে ভণ্ড তপস্বী (ভণ্ড ত্রাণ কর্ত্তা) বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

রামপালের অন্নে প্রতিপালিত কবি সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিত কাব্যে" তাঁহার প্রতিপালকের পরম শত্রুর বিরুদ্ধে যে সম্মান দেখাইয়াছেন মজুমদার মহাশয় দেশের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক হইয়াও তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত কয়িয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী সাতটি শ্লোকে মহারাজ ভীমপালের যে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে উক্ত কাব্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্র মহারাজ ভীমের। আর মজুমদার মহাশয় সেই ভীমের জীবনের শেষ মুহূর্ত্তটিতেও স্বকপোল কল্পিত ঘৃণার কালিমা লেপন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। রামচরিত কাব্যের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৪৮।৪৯ শ্লোকে বর্ণিত আছে যে, রামপাল সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া ভীমকে বধ করেন।

["উৎকৃত্তকণ্ঠ কাণ্ডব্রজনির্য্যদ্ সঙ্কটাজ্জটালস্য। (২।৪৮)
নিহতকুটুম্বস্য পুরোদারুণমাস্কন্দনং কিমপিদধতঃ!
ধৃতচন্দ্রহাসধাম্না লঙ্কারাজঃ কৃতোঽস্য বধঃ" ॥ (২।৪৯) রামচরিত কাব্য।]

আর মজুমদার মহাশয় তাঁহার ইতিহাসে ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,

["ভীমকে বধ্যভূমিতে নিয়া প্রথমেই তাঁহার সম্মুখেই তাঁহার পরিজন-বর্গকে হত্যা করা হইল। তারপর বহু শরাঘাতে ভীমকেও বধ করা হইল। এইরূপে কৈবর্ত্তনায়কের বিদ্রোহ ও ভীমের জীবন অবসান হইল।"]

মহারাজ দিব্যপালের পর তাঁহার ভ্রাতা রুদ্রপাল এবং তৎপরে রুদ্রপালের পুত্র ভীমপাল রাজা হন। ভীমপালের সুশাসনে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

দ্বিতীয় মহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল পিতৃসিংহাসন পুনরুদ্ধারের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বরেন্দ্রভূমি ভিন্ন ভারতের

অন্যান্য প্রদেশের রাজন্যবর্গ বাঙ্গলার এই গণতন্ত্রকে আদৌ সুচক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং তাহাদের আন্তরিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। রামপাল সেই সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের সাহায্যে পিতৃসিংহাসন পুনরুদ্ধার করিলেন। ভীমপাল যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন।

রামপাল প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তিনিই পাল বংশের শেষ গৌরবরবি। সামন্তরাজগণকে বশে আনিয়া কতকগুলি বিদ্রোহী সামন্তকে দমন করিয়া তিনি পালবংশের নষ্ট গৌরব অনেকাংশে ফিরাইয়া আনেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র কুমার পাল রাজা হন। কুমার পালের রাজত্বকালে দক্ষিণ বঙ্গে ও কামরূপে বিদ্রোহ হইয়াছিল। কুমার পালের প্রিয়তম বন্ধু ও ব্রাহ্মণ অমাত্য বৈদ্যদেব সেই সকল বিদ্রোহ দমন করেন। বিদ্রোহ দমনের পুরস্কার সরূপ কুমার পাল বৈদ্যদেবকে কামরূপের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কুমার পালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় গোপাল রাজা হন। তাঁহার রাজত্বের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তৃতীয় গোপালের মৃত্যুর পর রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপাল রাজা হন।

মদন পাল অনেকাংশে পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তিনি বহু শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সকল শত্রুকে দমন করিয়া পালবংশের গৌরব কতকাংশে রক্ষা করেন।

কথিত আছে, মদনপালের মৃত্যু হইলে সেনাপতি বিজয় সেন তাঁহার নাবালক পুত্রগণের হস্ত হইতে রাজ্য অধিকার করিয়া লন। মদন পালের রাণী চিত্রমতিকা দেবী নাবালক পুত্রগণসহ মগধে গিয়া আশ্রয় লন। মগধ তখনও পালরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পাল শাসনের যুগ বাঙ্গলার চরম উন্নতির যুগ। এই সময়ে বাঙ্গলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্ম হয়। পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় পুস্তক লেখা

হইত। এই যুগে বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম পুস্তক লেখা আরম্ভ হয়। বৌদ্ধদোহা ও ধর্ম্মমঙ্গলকাব্য তাহারই নিদর্শন।

["পালবংশের প্রতিষ্ঠার সহিত বাঙ্গালী জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠ হইল, রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে যুদ্ধ বিগ্রহে, শাসন পদ্ধতির উৎকর্ষতায়, ধর্ম্মে, দর্শনে, সাহিত্যে ও ভাস্কর্য্যে, চিত্রাঙ্কনে, সঙ্গীতে,—এক কথায় জীবনের সকল আবশ্যক ক্ষেত্রে বাঙ্গালী এত দ্রুত উন্নতি করিল যে শুনিতে বিস্ময় লাগে। স্বাধীনতার পাগলা হাওয়ার ছোঁয়া লাগিয়া সেদিন জড়তার ক্ষয় হইল। সৃষ্টিতে ব্রতী হইয়া বাঙ্গালী সে দিন সুন্দরের মন্দিরে শান্ত যোগাসনে বসিয়া যে দেবতাকে আহ্বান করিল সেই সুন্দর আসিয়া ধরা দিল তাহার কমলকান্ত রচনায়, তাহার শক্তিতত্ত্বে ও প্রেমধর্ম্মে, আর তাব মন্দিরে মন্দিরে স্থাপিত সুঠাম নয়নাভিরাম দেব বিগ্রহের অঙ্গে অঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে।" বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্ম— শ্রীনিলিনীনাথ দাসগুপ্ত, ২৮ পৃঃ]

আদিশূর

আদিশূর ও শশাঙ্ক—এই দুইটি নাম বাঙ্গলার ইতিহাসে দুইটি প্রহেলিকা। ইঁহাদের সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানিবার উপায় নাই। রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা এবং শশাঙ্কের নিকট হর্ষবর্দ্ধনের পরাজয়—এইরূপ দুই একটি ঘটনার উল্লেখ ছাড়া আমরা ইতিহাসে শশাঙ্ক সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারি না। আর, আদিশূরের অবস্থাও তদনুরূপ। কুলজী শাস্ত্রে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন ব্যতীত তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। এ পর্য্যন্ত কোন ইতিহাসে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয়ের উল্লেখ দেখা যায় না। তাঁহার রাজধানীর অবস্থানেরও সঠিক উল্লেখ কোন ইতিহাসে দেখা যায় না। এই সকল কারণে কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না।

রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

মানসী—মাঘ ১৩২১, ২৭৩ পৃষ্ঠা]

["খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে গৌড়ে, মগধে বা বঙ্গে শূরবংশীয় রাজগণের সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।"—বাঙ্গলার ইতিহাস, প্রথম ভাগ; ১৩৯ পৃঃ; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।]

কেবল মাত্র শশাঙ্ক ও আদিশূর কেন, প্রাচীন বা স্বাধীন বাঙ্গলার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত রাজা ও রাজবংশগুলির ইতিহাসও এইরূপ কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। মহাভারতীয় যুগের তাম্রলিপ্ত রাজবংশ বিজয়সিংহ, সাহুর রাজবংশ ও শীলভদ্র, পালবংশ ও গোপালদেব, রাজা দিব্য ও ভীম এবং সর্ব্বশেষ সেনবংশ—ইহাদের কাহারও ইতিহাস স্পষ্ট নহে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সেন বংশকেও বৈদ্য, কায়স্থ ও ব্রহ্মক্ষত্রিয়—এই তিনটি বিভিন্ন গণ্ডীতে টানাটানি চলিতেছে। ইতিপূর্ব্বে উক্ত রাজবংশগুলির পরিচয় দিবার সময়ে এতদ্দেশীয় ঐতিহাসিকগণের উক্তির দৃঢ়তার অভাব সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। দৃঢ়তার অভাবকেই যেন তাঁহারা তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার আসনে বসাইয়াছেন। দৃঢ়চিত্ত হইতে না পারিলে দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাব রোধ করিেত পারা যায় না। খুব কম লোকেই যুগধর্ম্মের প্রভাব এড়াইয়া সত্য পথে চলিতে পারেন। যেহেতু বাঙ্গলার সমস্ত প্রাচীন রাজবংশগুলি বৌদ্ধ প্রভাবে দ্বিজ-সংস্কার বর্জ্জিত, আর সেনবংশ ছাড়া সকলগুলিরই বংশধরগণ বর্ত্তমানে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। সেই সকল কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত রাজবংশগুলির পরিচয় দিতে হইলে প্রচলিত ইতিহাসের মর্য্যাদা নষ্ট হইয়া যায়; সেইজন্য সেইগুলিকে কুহেলিকাচ্ছন্ন ও রোমান্টিক কাব্য সুষমায় মণ্ডিত করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমানের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া কেবল অতীত গৌরব লইয়াই তাঁহাদের বিরাজ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

যে শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণের নাম উল্লেখ করিলাম আমি তাঁহাদের পন্থা অনুসরণ করিতে পারি নাই। বর্ত্তমানের যোগসূত্র না পাইলে আমি ইতিহাসের সার্থকতাই বুঝিতে পারি না। সেইজন্য আদিশূরেরও একটা যোগসূত্র বাহির করিতে চাই। রাঢ়দেশে আদিশূর সম্বন্ধে যেরূপ প্রবল জনশ্রুতি বিদ্যমান, কুলজী শাস্ত্রেও যেরূপ বর্ণনা দেখা যায় এবং পরবর্ত্তী যুগে লক্ষ্মীশূর, অনশূর, রণশূর প্রভৃতি শূর উপাধিধারী রাজগণের বিষয় ইতিহাসে উল্লেখ থাকায় আদিশূরের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। রাঢ়দেশে বিভিন্ন স্থানে পাল নৃপতিগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের উল্লেখ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে রাঢ়দেশেই শূর নৃপতিগণ সীমাবদ্ধ ছিলেন। রাঢ়ের বাহিরে কোথাও তাঁহাদের উল্লেখ দেখা যায় না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "আদিশূর বংশীয় রাজারা হীনভাবে অনেকদিন ধরিয়া রাঢ়দেশের কোন স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন।"

["বল্লাল প্রবর্ত্তিত কৌলিন্য প্রথা প্রথমে রাঢ়দেশে পরে অন্যান্য স্থানে প্রবর্ত্তিত হয়।"—হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস, ২৫০ পৃঃ—৺বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য।]

আদিশূরই কৌলিন্য প্রথার আদি প্রবর্ত্তক এবং তাহা এই রাঢ়দেশেই প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। সুতরাং উপরিলিখিত বল্লাল নামের পরিবর্ত্তে আদিশূরই হইবে। যে কুলশাস্ত্র হইতে আদিশূরের পরিচয় পাওয়া যায় সেই কুলশাস্ত্রের একটি শ্লোকে আছে :—

"তত্রাদিশূরঃ শূরবংশসিংহো
বিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপালবংশম্
শশান গৌড়ং দিভিজান্ বিজিত্য
যথা সুরেন্দ্র স্ত্রিদিব্যং শশান।"

উক্ত শ্লোকে আদিশূরের গৌড়জয়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু কবিকল্পনায় একটু অতিরঞ্জিত হইয়াছে। গৌড়রাজের নিকট হইতে রাঢ় অধিকারের ঘটনাটি গৌড়জয়ে পরিণত হইয়াছে। গৌড়জয় কিরূপে সম্ভব হইল? তৎকালীন পালরাজগণের দুর্ব্বল অবস্থায় যদি আদিশূর গৌড় জয় করেন, তবে কিভাবে তাঁহারই বংশধরগণ পরে সেই পাল নৃপতিগণের দ্বারা উত্তর রাঢ় বিজিত হইলে, দক্ষিণ রাঢ়ে রাজধানী স্থাপন করেন,—ইহার উল্লেখ হইল? বহুবার শূররাজগণ পালরাজগণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস—৺বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য, পৃঃ ১৩৪—১৪৯ দ্রষ্টব্য।

প্রায় সকল ইতিহাসেই বল্লালসেনকে আদিশূরের দৌহিত্র বলিয়া উল্লেখ আছে। শূরবংশের সহিত সেনবংশের এই সম্বন্ধস্থাপনের উল্লেখ হইতে প্রায় সকলেই শূরবংশকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা ভ্রান্ত ধারণা। আদিশূরের জাতি পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায় যে তিনি সৎগোপ জাতীয় ছিলেন। কারণ শূররাজগণের রাজত্ব ছিল মধ্য রাঢ়ে। কখনও মধ্য রাঢ়ের উত্তরাংশে আবার কখনও দক্ষিণাংশে। এই অঞ্চলে শূর উপাধি সাধারণতঃ সৎগোপদিগের মধ্যেই দেখা যায়। আর উক্ত অঞ্চলে যে দুই একটি প্রাচীন সামন্ত রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায় তাহারা সৎগোপ জাতীয় ছিলেন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গলার ইতিহাসে ৩৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, "খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর কোন সময় মহামাণ্ডলিক উপাধিধারী কায়স্থ অথবা গোপজাতীয় সামন্তগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঈশ্বর ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য।"

রাখালদাসবাবু কায়স্থ অথবা গোপ এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু রাঢ় অঞ্চলে কায়স্থ সামন্তের নিদর্শন আদৌ দেখা যায় না। পরন্তু রাঢ়দেশে তুই একটি সংগোপ সামন্তের উল্লেখ দেখা যায়। মানকরের অনতিদূরে বল্লকা নদী তীরে অমরার গড়ে প্রাচীন সংগোপ রাজবংশ বিদ্যমান। লক্ষ্মীশূরের অপার মান্দার (বর্তমান গড় মান্দারন) অঞ্চলেও সংগোপ ভূস্বামী ও সংগোপ জাতির প্রাধান্য বিদ্যমান। দ্বারবাসিনী গ্রামেও এক সময়ে সংগোপ রাজার রাজধানী ছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে। বর্দ্ধমান জেলার জৌগ্রাম রেল ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে কুলীনগ্রাম এবং হুগলী জেলার রাজবলহাট গ্রাম এক সময়ে শূররাজগণের রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান হয়। হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার আবাসগড়ে সংগোপ জাতীয় শূররাজগণের অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে।

ভারতের প্রাচীন ক্ষাত্রশক্তি পরবর্ত্তী যুগে মাহিষ্য, গোপ সংগোপ, ও উগ্রক্ষত্রিয়—এই কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে দেখা যায়। কারণ ভারতের বিভিন্ন অংশে এই কয়েকটি সম্প্রদায়েরই ক্ষাত্রশক্তি বিদ্যমান। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে গোপ সম্প্রদায়ের বিশাল সাম্রাজ্যের নিদর্শন বিদ্যমান। বাঙ্গলা দেশের জলা অঞ্চলে ক্ষত্রিয়গণ কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করায় তাহাদের নাম হইয়াছে চাষী-কৈবর্ত্ত। সমগ্র বাঁঙ্গলা দেশের মধ্যে মধ্যরাঢ় অঞ্চলে সংগোপ জাতির প্রাধান্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন সংগোপ রাজ্যের পত্তন হয়। দেবপালদেবের সময়ে ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইয়া বীরভূম জেলায় অজয় নদের তীরে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। সেই হইতে মধ্যরাঢ়ে সংগোপ রাজত্ব চলিতে থাকে। ইছাই ঘোষ দেবপালদেবের সেনাপতি লাউসেন কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহার রাজ্য পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাঢ়ের এই

নবজাগ্রত রাজশক্তি সাময়িকভাবে প্রতিহত হইলেও তাহা একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। পরবর্ত্তী পালরাজগণের দুর্ব্বলতার সুযোগে তাহার পুনর্জ্জাগরণ হয় এবং স্থায়িভাবে তাঁহাদের রাজ্য স্থাপিত হয়। পরে, পরবর্ত্তী পালবংশধরগণ শক্তিশালী হইলে তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিয়া সামন্তরাজা রূপে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।

["উত্তর রাঢ় শূরবংশীয় নৃপতিগণের হস্ত বিচ্যুত হইলে তাঁহারা পালবংশের সামন্তরূপে দক্ষিণরাঢ়ে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।" হুগলি হাওড়ার ইতিহাস—১০৮ পৃঃ, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য।]

বিভিন্ন কুলজী শাস্ত্রের মত উল্লেখ পূর্ব্বক কোন কোন ইতিহাসে আদিশূরকে অষ্টম শতাব্দীর রাজা বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? নবম শতাব্দীর প্রথম পাদে, দেবপাল দেবের রাজত্বের প্রারম্ভে ইছাই ঘোষ প্রমুখ সৎগোপ রাজশক্তির প্রথম উত্থান দেখা যায়; কিন্তু তাহাও প্রতিহত হইয়া যায় দেবপালদেবের সেনাপতি লাউসেনের পরাক্রমে। দেবপালদেবের পরে পালশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে সেই সময় সৎগোপ রাজশক্তির পুনরুত্থান সম্ভব হইয়াছিল মনে হয়। আবার কোন কোন ইতিহাসে দ্বাদশ শতাব্দীতে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের অভ্যুত্থানের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তাহাই বা সম্ভব হইবে কিরূপে? দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে মধ্যভাগ পর্য্যন্ত (১১২৫—৫৮ খৃঃ অঃ) শূরবংশের উত্তরাধিকারী বিজয় সেনের রাজত্ব কাল। সুতরাং ঈশ্বর ঘোষ তৎপূর্ব্বের লোক ইহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। ঈশ্বর ঘোষ সৎগোপ জাতীয় এবং শূরবংশও সৎগোপ সম্প্রদায়ভুক্ত ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। সম্ভবতঃ ঈশ্বর ঘোষই কিংবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কিংবা পরবর্ত্তী কোন বংশধর আদিশূর নাম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন এবং তাঁহাদের রাজত্বকাল নবম শতাব্দীর শেষভাগ অথবা দশম শতাব্দীর প্রথমভাগ

হইতে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত এই দুই শতাব্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইবে। আদিশূরের পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের কালই তাঁহার রাজত্বকাল জ্ঞাপক।

[নুলো পঞ্চাননের সারাবলীধৃত কুলার্ণবে দেখিতে পাওয়া যায়:—

"বেদবানাহ্নিমে শাকে বিপ্রাঃ পঞ্চ সমাগতাঃ" অনেকে এই মতানুযায়ী ৮৫৪ শকে অর্থাৎ ৯৩২ খৃঃ অব্দে বিপ্রগণ গৌড়ে সমাগত হন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ৯৬৪ খৃঃ অঃ গৌড়মণ্ডলে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন করেন।" হুগলি ও হাওড়ার ইতিহাস, ১১৫।১৬ পৃঃ, ৺বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য]

দ্বারবাসিনী ঃ হুগলী জেলার উত্তরাংশে দ্বারবাসিনী গ্রামটি এক সময়ে শূরবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল, পরে তাহা পাল নৃপতিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় বলিয়া মনে হয়। উক্ত গ্রামটি বহু অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপে পরিপূর্ণ। গ্রামের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন পরিখা বেষ্টিত একটি স্থানকে এখনও অনেকে রাজার ভিটা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পরে মুসলমান বিজয়ের যে কাহিনী ইতিহাসে উল্লেখ আছে তদনুযায়ী মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। প্রবাদ আছে, এখানে সৎগোপ রাজারা রাজত্ব করিতেন। বর্ত্তমানে আদৌ সৎগোপ জাতির বাস নাই। বর্ত্তমানের অধিবাসিগণের অধিকাংশই মাহিষ্য। প্রাচীন পরিখা বেষ্টিত রাজবাটীর ধ্বংসস্তূপের দক্ষিণ পার্শ্বে পাল উপাধিধারী দুইটি প্রাচীন মাহিষ্য পরিবার বাস করিতেছেন। তাঁহারাই যে উক্ত পালরাজাগণের বংশধর ইহা বিশেষ অনুসন্ধানের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

["দেবপাল রাঢ়ের উত্তর অংশ অধিকার করিয়া স্বীয় ভ্রাতা জরপালকে ঐ স্থানের শাসনভার অর্পণ করেন। উত্তর রাঢ় শূরবংশীয় নৃপতিগণের হস্তচ্যুত হইলে তাঁহারা দক্ষিণ রাঢ়ে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।" হুগলি হাওড়ার ইতিহাস—বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য, ১৩৫ পৃষ্ঠা।]

[“দ্বারবাসিনী গ্রামে রাজা দ্বার পালের প্রাসাদ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ স্তূপাকারে দৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে যে, গৌড়েশ্বর মহীপালের তৃতীয় পুত্র দ্বারপাল শ্রদ্ধাবান হিন্দু ছিলেন বলিয়া বৌদ্ধ পিতার বিরাগভাজন হওয়ায় ঐ স্থানে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। রাজার বংশধরেরা অনেকদিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। পাণ্ডুয়া বিজেতা সাহসুফি প্রবল সংগ্রামে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া দ্বারবাসিনী অধিকার করেন।” হুগলি ও দক্ষিণ রাঢ়—শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত, ১১৫ পৃষ্ঠা।]

কুলীনগ্রাম—বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশে, বর্ত্তমান নিউ কর্ড রেল লাইনের (H. B. Chord) জৌগ্রাম ষ্টেশনের দুই মাইল পূর্ব্বে কুলীনগ্রাম এক সময়ে শূরবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান হয়। উক্ত গ্রামের পূর্ব্ব অংশে কেল্লারগড় নামে প্রাচীন পরিখা বেষ্টিত একটি স্থানের নিদর্শন পাওয়া যায়। ঐ স্থানের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে গোপেশ্বর শিব এবং উক্ত শিবমন্দিরের পার্শ্বে মার্ব্বেল পাথরের একটি ষণ্ডমূর্ত্তি বিদ্যমান। উক্ত গোপেশ্বর শিব ও কেল্লার গড় এই দুইটি নাম হইতে মনে হয়, স্থানটি এক সময়ে শূরবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। তাহা ছাড়া, উক্ত গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে শূর ও কুমার উপাধিধারী কতকগুলি প্রাচীন সৎগোপ পরিবার বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগকে শূররাজগণের বংশধর বলিয়া মনে হয়।

প্রবাদ আছে, এদেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অভাব নিবন্ধন আদিশূর কনৌজ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন। এই ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ পরে কুলীন ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত হন। এখনও উক্ত গ্রামের চতুঃপার্শ্বে বহু সংখ্যক কুলীন ব্রাহ্মণের বসতি দেখা যায়। বঙ্গের অন্যত্র এত অধিক সংখ্যক কুলীন ব্রাহ্মণের বসতি দেখা যায় না। উক্ত কুলীন গ্রামটি যেন এতদঞ্চলের কুলীন ব্রাহ্মণগণের

বসতির কেন্দ্ররূপে বিরাজ করিতেছে। কুলীন ব্রাহ্মণগণের বসতির কেন্দ্র হিসাবে এই কুলীন গ্রামটি আদিশূরের রাজধানী বলিয়া স্পষ্ট অনুমান হয়।

আদিশূর কনৌজ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন—এই কথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু এদেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অভাব ছিল, ইহা আদৌ সত্য নহে। মহাভারতের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আদিশূরের সমসাময়িক পালরাজগণের রাজত্বে বহু সাগ্নিক ব্রাহ্মণের যাগযজ্ঞের কথা এবং তাঁহাদিগকে ভূমিদানের অসংখ্য তাম্রশাসনের উল্লেখ প্রায় সকল ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সেগুলির পুনরুল্লেখ করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে নিষ্প্রয়োজন মনে করি। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কি জন্য কনৌজ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের প্রয়োজন হইয়াছিল? যাঁহাদিগের তৎকালীন বাঙ্গলার ইতিহাসে সবিশেষ জ্ঞান আছে তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে পাল-রাজগণের বিখ্যাত পুরোহিতদিগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য এবং সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের সামাজিক মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য উঁহাদের আনার প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, শূরনৃপতিগণ পালনৃপতিদিগের যেমন শত্রু, তেমনি কনৌজ ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞাগ্নিসম্ভূত নূতন রাজপুত ক্ষত্রিয়গণও পাল রাজগণের শত্রু। একই ব্যক্তির বিভিন্ন শত্রুর মধ্যে পরস্পর মিলনের আকর্ষণ স্বাভাবিক। তাই কনৌজরাজ আদিশূরের বন্ধু। একটি সাধারণ প্রবাদ আছে, আদিশূর কনৌজ জয় করিয়া পঞ্চব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন, একথা ভিত্তিহীন। কনৌজরাজগণ তখন শঙ্করাচার্য্যপন্থী, আর পাল নৃপতিগণ সমগ্র এশিয়াখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত। সেই সময় কনৌজরাজ চাহিতেছেন অদ্বৈতবাদ প্রচারের অছিলায় বঙ্গ জয় করিতে, আর আদিশূর বিরাট পাল রাজশক্তির নিকট হইতে মধ্যরাঢ়ের যে ভূমিখণ্ডটি ছিনাইয়া

লইয়াছেন তাহা নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে গলাধঃকরণ করিবার জন্য প্রবল কনৌজরাজের আশ্রয় চাহিতেছেন। পরস্পরের এই স্বার্থের দায়ই পরস্পরের মিতালি স্থাপনের যোগসূত্র। সেই যোগসূত্র স্থাপনের সহায়ক হইলেন কনৌজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ। অন্যপক্ষে, তাঁহারাই পাল-সম্রাটগণের পুরোহিত গৌড় ব্রাহ্মণগণের দর্প চূর্ণ করিবার অব্যর্থ অস্ত্ররূপে পরিগণিত হইলেন।

প্রায় সকল ইতিহাসেই আদিশূরকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়া উল্লেখ দেখা যায় এবং তাঁহাদের সহিত কনৌজের ক্ষত্রিয় রাজাদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের উল্লেখ দেখা যায়।

["বৈদ্যরাজাদের পুত্র কন্যাদিগের সহিত ক্ষত্রিয় রাজাদিগের পুত্র কন্যার বিবাহ প্রচলিত ছিল। আদিশূর কনোজের ক্ষত্রিয় রাজকন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।" সামাজিক ইতিহাস—দুর্গাচন্দ্র সান্যাল ১৭ পৃষ্ঠা।]

আবার কেহ কেহ আদিশূরকে ক্ষত্রিয়ও বলিয়াছেন।

["কেহ, কেহ, আদিশূরকে ক্ষত্রিয় বলেন। যদি তাহারা ক্ষত্রিয় হইতেন তবে তাঁহাদের জ্ঞাতিকুটুম্বগণ তাঁহাদের রাজধানীর চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান থাকিত। তাদৃশ ক্ষত্রিয় বাঙ্গলাদেশে নাই।" ঐ পুস্তক ১৬ পৃষ্ঠা।]

যাহা হউক শূরবংশের সহিত কনৌজরাজের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের উল্লেখ দেখা যাইতেছে। আবার শূরবংশের সহিত পরবর্ত্তী সেনবংশেরও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনেরও উল্লেখ আছে। বিজয় সেন শূররাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং বল্লাল সেন শূরবংশের দৌহিত্র ছিলেন। আর শূরবংশ যদি বৈদ্য না হইয়া ক্ষত্রিয় হন তাহা হইলে এ মতের বিরোধিতা করিবার কিছু না-ও থাকিতে পারে। কিন্তু শূররাজবংশকে যদি সৎগোপ জাতীয় বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা হইলে প্রবল আপত্তি উঠিতে পারে। কারণ সৎগোপ জাতির সহিত বৈদ্যজাতির বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের কথা শুনিলে অধুনা

অনেকে চমকিয়া উঠিবেন। কিন্তু সৎগোপগণ যে প্রাচীন ক্ষত্রিয় এবং বৌদ্ধযুগে দ্বিজ সংস্কারচ্যুত, তাহা বুঝিতে পারিলে আর কোন আপত্তি না-ও করিতে পারেন।

বর্ত্তমানে কোন কোন ইতিহাসে সেনবংশকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার ভিন্ন অর্থও দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বন করায় ব্রহ্মক্ষত্রিয় হইয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় পত্নীর গর্ভজাত সন্তান ব্রহ্মক্ষত্রিয়।

["ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ানীর গর্ভে জন্ম হইলে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়।" সামাজিক ইতিহাস—শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল ৪২৯ পৃষ্ঠা।]

বিজয় সেন বৈদ্য ব্রাহ্মণ, আর শূররাজগণ বাঙ্গলার প্রাচীন ক্ষত্রিয় এবং তাহাদের পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের ফলে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় নাম হওয়ারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

["হুগলি জেলায় পাণ্ডুয়ার অন্তবর্ত্তী আবাসগড়ের সদ্‌গোপ রাজবংশের রাণীর কাগজপত্রাদিতে "দেবী" শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখা যায়।" সিদ্ধান্ত সমুদ্র—স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী,—২৫২ পৃষ্ঠা।]

কোন কোন ইতিহাসে আদিশূর সেন বা শূর সেন উল্লেখ দেখিয়া অনেকে ভ্রমে পতিত হন এবং সঠিক অর্থ বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা শূর সেন অর্থে বিজয় সেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, মনে হয়। রাঢ়দেশের প্রথম আদিশূরের নাম হইতে পরবর্ত্তী যুগে আদিশূর একটা উপাধি বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল মনে হয়। বিজয়-সেন গৌড়ের রাজা হইলে তাঁহাকেও সকলে আদিশূর উপাধিতে ভূষিত করিয়া থাকিতে পারেন। তজ্জন্য তাঁহাকে আদিশূর সেন বলিয়া কোন কোন ইতিহাসে উল্লেখ দেখা যায়।

সেন রাজবংশ

সেন রাজবংশের আদি পুরুষ বিজয় সেন দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট প্রদেশ হইতে আসিয়া গৌড়ের পাল রাজসরকারে সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, রাজা মদন পালের মৃত্যু হইলে, বিজয় সেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজকুমারদিগের হস্ত হইতে রাজ্য অধিকার করিয়া লন।

["কি উপায়ে বিদেশীয় সেনগণ সুদূর কর্ণাট দেশ হইতে আসিয়া বাঙ্গলায় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাবধি সঠিক নির্ণীত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তাঁহারা প্রথমে পালরাজগণের অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষ অথবা অন্য কোন উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরে পালরাজগণের দুর্বলতার সুযোগে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস—শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার, ৮০ পৃষ্ঠা।]

[পাল বংশের শেষ রাজা মন্ত্রীসহ রাণীর বিষ প্রয়োগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেনাপতি শূরসেন রাজ্য অধিকার করিয়া লন।" সামাজিক ইতিহাস—৺দুর্গাচন্দ্র সান্যাল, ৯ পৃষ্ঠা।]

মনে হয়, পরবর্ত্তী বিবরণটি সেনরাজগণের পক্ষসমর্থনকারীগণের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, রাণীর চরিত্রে দোষারোপ করিয়া সেনাপতিকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিবার জন্য। কিন্তু এই মত সমর্থন করিলে সেনাপতিরই যারপরনাই কুৎসিৎ চরিত্র প্রমাণিত হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং রাজ্য অধিকার না করিলে, সাধারণের চক্ষে নির্দ্দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন, নতুবা নহে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে বাঙ্গলা দেশে তিনটি বিভিন্ন স্থানে সেনরাজগণের তিনখণ্ড রাজ্য ছিল। প্রথমটি হইল গৌড়রাজ্য। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হইল। দ্বিতীয়টি হইল ঢাকা

জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে বর্ত্তমান বিক্রমপুর পরগণা। ঐ ক্ষুদ্র রাজ্যটিও বিজয় সেন কিভাবে আয়ত্ব করিয়াছিলেন তাহারও সঠিক কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

["বঙ্গদেশ :—ইহার পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে বরেন্দ্রভূমি, উত্তরে জঙ্গল। এই রাজ্য পালবংশীয়দিগের অধিকারে ছিল। রাজা রাম পাল পুত্রশোকে কাতর হইয়া নিজে গঙ্গাতীরে গিয়া শিব ভক্ত বিজয় সেনকে নিজ রাজ্য প্রদান করত অনশনে প্রাণত্যাগ করেন। এই সময় হইতে বাঙ্গলা দেশে বৈদ্য রাজত্বের সুত্রপাত হয়।" সামাজিক ইতিহাস—দুর্গাচন্দ্র সান্যাল ৯।১০ পৃষ্ঠা।]

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে মনে হয় বিক্রমপুরের রাজা রামপাল এবং গৌড়ের রাজা মদন পাল উভয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। বিজয় সেন একের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইতে উভয় পক্ষে ঘনিষ্ঠতা লাভ করিয়া উভয় রাজ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তৃতীয় খণ্ডটি হইল মধ্যরাঢ়ে নবদ্বীপ রাজ্য। কুলজীশাস্ত্রে উল্লেখ আছে, বিজয়সেন শূররাজবংশের শেষ নৃপতির কন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করিয়া শূর রাজ্য প্রাপ্ত হন। সেই শূররাজ্যই নবদ্বীপ।

অধিকাংশ সাধারণ ইতিহাসে দেখা যায় যে সেনরাজবংশ সমগ্র বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বাস্তবে দেখা যায়, ঐ তিনখণ্ড ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সেগুলির উল্লেখও বিভিন্ন ইতিহাসেই দেখা যায়, যে ইতিহাসগুলিতে প্রত্যেক খণ্ড-রাজ্যগুলির বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত আছে। নিম্নে তাহার দুই একটি উল্লেখ করা হইল।

["দিনাজপুর জেলায় একটি, বগুড়া জেলায় একটি এবং প্রাচীন গৌড় রাজ্যকে কেন্দ্র করিয়া একটি পাল রাজ্য ছিল।" সামাজিক ইতিহাস—৺দুর্গাচন্দ্র সান্যাল ১৬ পৃষ্ঠা।]

["বিজয় সেন রাজ্য গৌড়ের পূর্ব্বাংশ ও দক্ষিণাংশ হস্তগত করিয়াছিলেন। মালদহের পূর্ব্বাংশ, রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা মাত্র তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।" বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত—৺পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—২৫৬।৫৭ পৃষ্ঠা।]

উল্লিখিত স্থানগুলির মধ্যে বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ এবং ঢাকার অধিকাংশ বিজয় সেনের রাজ্যের বহির্ভূত ছিল। ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বগুড়ায় পালবংশীয় এক রাজা রাজত্ব করিতেন। পাবনা তাঁহারই অধিকারভুক্ত হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। ময়মনসিংহ জেলায় ভোগবেতালের রাজা নবরঙ্গ রায়ের বংশ রাজত্ব করিতেন এবং ঢাকা জেলায় মাত্র বিক্রমপুর পরগণা ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমাংশ সাভার রাজবংশের অধিকারভুক্ত ছিল। বর্ত্তমান মালদহ ও রাজসাহী লইয়াই তৎকালীন গৌড়রাজ্য গঠিত ছিল।

["বরেন্দ্র কায়স্থ, বৈদ্য, বৈদিক ব্রাহ্মণ;
বল্লাল মর্য্যদা না নৈল তিন জন। (কুলজীগ্রন্থ)

বল্লাল সেনের অধিকারভুক্ত বাজ্যেই তাঁহার প্রবর্ত্তিত কৌলিন্য প্রথা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যসীমার বাহিরে কেহই তাহা গ্রহণ করেন নাই। এখনও উত্তর বরেন্দ্র, নোয়াখালি ও মেদিনীপুর জেলাবাসী অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান কনোজাগত পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিলেও তাঁহারা বল্লালী কৌলিন্য গ্রহণ করেন নাই।" হুগলি হাওড়ার ইতিহাস—৺বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য ১৫০।৫১ পৃষ্ঠা]

কুলজী গ্রন্থ সকলের উল্লেখ হইতেও সেন বংশের ঐরূপ বাঙ্গলার আংশিক অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে অতটুকু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেন রাজ্যকে (সমগ্র বঙ্গের পরিচয় দিয়া) অত বৃহৎ করিয়া দেখানোর প্রয়োজন কি ছিল?

ঐরূপ মিথ্যা প্রচারের কারণ দেখা যায় মুসলমান যুগের প্রারম্ভে কতকগুলি স্বার্থপরায়ণব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া মুসলমান দিগের সহায়তায় অনেকগুলি প্রাচীন রাজবংশকে ধ্বংস করেন এবং মুসলমানদিগের নিকট হইতে জমিদারীর বন্দোবস্ত লইয়া প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া সমাজে নিজেদিগের কৌলিন্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহাদের অতীত গৌরবের কোনই অবলম্বন ছিল না। সুতরাং নিরুপায় হইয়া অতি ক্ষুদ্র শূর ও সেন রাজ্যকে বৃহৎ করিয়া দেখাইয়া তাহাদেরই কল্পিত ছায়ায় নিজেদিগের নবজাত রুগ্ন, শীর্ণ কৌলিন্য-লতিকাটিকে লালন পালন করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। এই জন্যই উক্ত দুইটি রাজ্যের অধিপতিদিগের নামে নানারূপ মিথ্যা গল্পের সৃষ্টি করিয়া প্রচার কার্য্য চালাইতে থাকেন। ফল হইয়াছে এই যে, একদিকে ইতিহাস অনভিজ্ঞদিগের নিকট হইতে তাঁহারা যেমন ভূয়া সম্মান লাভ করিয়াছেন তেমনি অন্যদিকে উক্ত রাজবংশ দুইটির, বিশেষতঃ সেনবংশের স্কন্ধে কলঙ্কের বোঝা অধিকতর ভারাক্রান্ত করিয়া দিয়াছেন।

বিজয় সেনের পর তাঁহার পুত্র বল্লাল সেন রাজা হন। ইতিহাসে বিজয় সেন অপেক্ষা বল্লাল সেনের নাম অধিক প্রচারিত। সমাজে নানারূপ ভেদনীতি সৃষ্টির এবং গৌড়ব্রাহ্মণ ও সুবর্ণবনিকগণের প্রতি নানারূপ অত্যাচারের কাহিনী বল্লাল সেনের নামে প্রচলিত আছে।

["বল্লাল সেন গৌড় ব্রাহ্মণগণের শাখা পরাশর ব্রাহ্মণগণের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহা বরেন্দ্র কুলতিলক ৺যাদব চন্দ্র লাহিড়ী বি. এল. মহোদয় তাঁহার "কুল কালিমা" গ্রন্থে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছেন।" ভ্রান্তি বিজয় ৺হরিশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী—১৭৫ পৃঃ।]

কিন্তু বল্লাল সেন অপেক্ষা বিজয় সেনের দ্বারাই সেই সকল অত্যাচার হওয়া অধিকতর সম্ভব। কারণ, ঘটনাপরম্পরায় বুঝা

যাইতেছে যে তিনি এক গভীর চক্রান্তের মধ্যে প্রথম রাজ্যলাভ করেন।

সুতরাং পালরাজগণের পুরোহিত ও মন্ত্রী গৌড়াদ্য ব্রাহ্মণগণের তাহাতে অসন্তুষ্ট হওয়া এবং বাধা দেওয়াই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের ধূমায়মান বিদ্বেষ বহ্নির অন্তঃপ্রবাহের সংযোগ থাকাও অসম্ভব নহে। শোনা যায়, বহুসংখ্যক গৌড়-ব্রাহ্মণকে পোড়াইয়া মারা হয় এবং অবশিষ্ট অধিকাংশ সেনরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যান। অনেকে সঠিক সংবাদ না রাখিয়া পালরাজত্বের বৌদ্ধগণের স্কন্ধে এই দোষ চাপাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় বিজয় সেনের রাজত্বকাল এবং পরবর্ত্তী মুসলমান রাজত্বকাল ভিন্ন অন্য কোন সময়েই সেই অত্যাচার সম্ভব হয় নাই।

তৎকালে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা শুনিলে চমকিত হইতে হয়। তাঁহারাই পালরাজগণের পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁহাদেরই তপঃপ্রভাবে বাঙ্গলাদেশ জ্ঞানের চরম শিখরে উঠিয়াছিল। দিনাজপুর জেলায় বাদাল নামক স্থানে গরুড়স্তম্ভের গাত্রে পাল -রাজগণের পুরোহিত ও মন্ত্রীগণের নাম উল্লেখ আছে।

["১৭৮০ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্যার চার্লস উইলকিন্‌স্‌ দিনাজপুরের অন্তর্গত বাদাল নামক স্থানে গরুড়স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ একটি লিপির বিষয় অবগত হন। আট বৎসর পরে ১৭৮৮ খৃঃ তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার প্রথম খণ্ডে এই লিপির একটি ইংরাজি মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করেন, (Asiatic Researches Vol. 1 page 131)। এই সময় হইতেই বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত-চর্চ্চার সূত্রপাত হইল বলিয়া ধরা যাইতে পারে……১৮০৭ খৃঃ এইচ.টি. কোলব্রুক 'এশিয়াটিক রিসার্চেস্‌' পত্রিকায় রণবঙ্ক মল্লদেবের ময়নামতী লিপি (ত্রিপুরা জেলায়) এবং তৃতীয় বিগ্রহ পাল দেবের আমগাছি

* লিপির (দিনাজপুর জেলায়) মূল সংস্কৃত পাঠ ও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। পূর্ব্বোক্ত বাদাল গরুড়স্তম্ভলিপি এবং আমগাছি লিপি থেকেই বাঙ্গলার পাল রাজবংশের ইতিহাসের মূল কাঠামোটি জানা যায়।"—'বাঙ্গলার ইতিহাস সাধনা,'—শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র সেন. ২৬।২৭ পৃষ্ঠা।]

["গরুড়স্তম্ভলিপি—(১) বঙ্গানুবাদ—শাণ্ডিল্য বংশে (বিষ্ণু ?) তদীয় অন্বয়ে বীর দেব তদ গোত্রে পঞ্চাল এবং পঞ্চাল হইতে (তৎপুত্র) গর্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই বংশোদ্ভব গুরব মিশ্র (অষ্টাদশ শ্লোকে) "জমদগ্নিকুলোৎপন্ন" বলিয়া উল্লিখিত থাকায় এই বংশ রাঢ়ী-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের সুপরিচিত শাণ্ডিল্য বংশ হইতে পৃথক্ বলিয়াই বোধ হয়।"—গৌড় লেখমালা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৭৭ পৃষ্ঠা।]

যাঁহারা দেশের প্রকৃত ইতিহাস জানেন তাঁহারা আদৌ বিশ্বাস করিবেন না যে বৌদ্ধগণের দ্বারা ব্রাহ্মণগণের প্রতি নির্ম্মম অত্যাচার সম্ভব হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ সমাজে পৃথক্ শিক্ষা দীক্ষার সৃষ্টি করেন নাই। উপনিষদের মূল নীতিগুলিই বৌদ্ধগণের আসল সম্বল ছিল। সেগুলির জন্য ব্রাহ্মণগণকে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইবে এরূপ কারণ দেখা যায় না। আর পালরাজগণ ব্রাহ্মণগণকে কিরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন এবং সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি দানের দ্বারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে যেরূপ পৃষ্টপোষকতা করিয়াছিলেন তাহা পালরাজগণের পরম শত্রুগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

৺মোহিত লাল মজুমদার মহাশয়ের 'বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী' পুস্তকের ৫২।৫৩ পৃষ্ঠায় গৌড়ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচারের বিষয় অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ আছে ; কিন্তু তাহাতে কাল নির্ণয়ের একটু পার্থক্য আছে এবং সেনরাজগণের পরিবর্ত্তে বৌদ্ধগণের, নাম করা হইয়াছে। আবার

তাহার খণ্ডন পাওয়া যাইবে ঐ পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় ; কিন্তু সেখানে আদিশূরের নাম আছে।

["গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া দলে দলে বাঙ্গলা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এই যে তথ্যটি উদ্ধার করিয়াছেন তাহা যেমন চমকপ্রদ তেমনই মূল্যবান্।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পরে মগধে ও গৌড়ে অর্থাৎ বাঙ্গলায় গৌড় ব্রাহ্মণদের উপর উৎপাত ও উপদ্রব হয়। সেই সময় গৌড় ব্রাহ্মণগণ দলে দলে বঙ্গ ও মগধ ছাড়িয়া যান।" বঙ্গবাসী, আশ্বিন ১৩২৯—বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী—মোহিতলাল মজুমদার, ৫২।৫৩ পৃষ্ঠা।]

"বাঙ্গলায় যে আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন আদিশূর যাঁহাদিগকে পতিত করিয়াছিলেন সেই আত্ত গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণই বা কোন্ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইবেন ?" ঐ পুস্তক, ২৮ পৃষ্ঠা।]

["গরুড় স্তম্ভলিপি (৬) বঙ্গানুবাদ—দেবপাল (নামক) নরপাল (উপদেশ গ্রহণের জন্য) দর্ভপাণির অপেক্ষায় তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন। গরুড় স্তম্ভলিপি (৭) বঙ্গানুবাদ—সুররাজকল্প (দেবপাল) নরপতি (সেই মন্ত্রীবরকে) অগ্রে চন্দ্রবিম্বানুকারী (মহার্হ) আসন প্রদান করিয়া নানা নরেন্দ্র মুকুটাঙ্কিত পাদপাংশু হইয়াও, স্বয়ং সচকিতভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন।

পাদটিকা :—ইহাতে বৌদ্ধ নরপালগণের শাসন সময়ে বাঙ্গলা দেশে ব্রাহ্মণের সমুচিত পদমর্য্যাদার অভাব না থাকারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

গরুড় স্তম্ভলিপি (১৫) বঙ্গানুবাদ—সেই বৃহস্পতি প্রতিকৃতির (কেদার মিশ্র) যজ্ঞস্থলে, সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য শত্রু সংহারক নানা সাগর মেখলাভরণা বসুন্ধরার চির কল্যাণকামী শ্রীশূরপাল, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অনেকবার শ্রদ্ধাসলিলাপ্লুত হৃদয়ে নতশিরে পবিত্র (শান্তি) বারি গ্রহণ করিতেন।

পাদটিকা :—এই শ্লোকে যদি কোন ঐতিহাসিক তথ্য পরিস্ফুট থাকে তবে তাহা এই (১) শূরপালের শাসনসময়েও বরেন্দ্র মণ্ডলে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। (২) বৌদ্ধ মতাবলম্বী রাজা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া মস্তকে শান্তি-

বারি গ্রহণ করিতে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন এবং (৩) তাঁহার রাজ্যের কল্যাণ হইবে বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন।" গৌড় লেখমালা—অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, ৭৮।৮২ পৃষ্ঠা।]

["আমরা শুনিয়াছি যে ঐ কালে (পাল রাজত্বকালে) সেই আর্য্য ব্রাহ্মণগণ যাঁহাদের নাম ছিল গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ, তাঁহারা দলে দলে দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ফলে পাল রাজত্বের শেষে বাঙ্গলাদেশে বৈদিক যজন যাজন করিবার ব্রাহ্মণ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল।" বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী—মোহিতলাল মজুমদার, ৮০ পৃষ্ঠা।]

এখানে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতগুলি লক্ষ্য করিবার বিষয়। বৌদ্ধধর্ম্মের আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া দেশত্যাগ করা—আবার যাঁহারা এরূপ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের আঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না তাঁহাদিগকে আদিশূর কি দোষে পতিত করিলেন? আবার পাল নৃপতিগণের ন্যায় ব্রাহ্মণপৃষ্ঠপোষক নৃপতিগণের রাজত্ব হইতে ব্রাহ্মণগণ দলে দলে দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। নিম্নের বিবরণটি হইতে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হইবে।

["পাল যুগই সর্ব্বতোভাবে বাঙ্গলার গুপ্তযুগ, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির যুগ,...... অন্ততঃ একটা বিষয়ে গুপ্তযুগকে বা যে কোন যুগকেই পাল যুগ অতিক্রম করিয়াছিল—সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে নির্মৎসরতা ও ক্ষান্তি। দুই সম্প্রদায়—হিন্দু ও বৌদ্ধ, অসূয়াপরতন্ত্রতা বিসর্জ্জন দিয়া একে অন্যের বুকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়—আছে অবশিষ্ট যাহা তাহারই অবলম্বনে। পাল যুগে বাঙ্গলার নৃপতিগণ ও তাঁহাদের প্রকৃতিপুঞ্জ ধর্ম্ম বিষয়ে সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া চলিতেন, এইটুকুমাত্র বলিলে ভুল হইবে, সেই ভুল করিব না। বলি,—ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদের ঔদার্য্য ছিল অমিত ও অপ্রমিত। বৌদ্ধ ও হিন্দু সেই যুগে যেন একই সংহতিধর্ম্মের দুইটি শাখা ছিল।

ধর্ম্মপালের মন্ত্রী ছিলেন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ গর্গ।"

বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্ম; শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত—৮০।৮৫ পৃষ্ঠা।]

["তারানাথের বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে পাওয়া যায় বর্ণাশ্রয়ী হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছাড়া গৃহী বৌদ্ধগণ বর্ণ শাসন মানিয়া চলিতেন। বৌদ্ধ পণ্ডিতে ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে কিছু কিছু দ্বন্দ্বের প্রমাণ থাকিলেও বৌদ্ধেরা পৃথক্ সমাজ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।" বাঙ্গালীর ইতিহাস—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ২৮৮ পৃষ্ঠা।]

গৌড় ব্রাহ্মণগণের দেশত্যাগ সম্বন্ধে আর একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে যে. তাঁহাদের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা যদি বৌদ্ধগণের দ্বারা হইত, তাহা হইলে সে অত্যাচার সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের প্রতি হইত। কেবলমাত্র বাছিয়া বাছিয়া গৌড় ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচারের কি কারণ থাকিতে পারে? ইহার মূল কারণ নির্ণয় করিতে হইলে সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে হইবে। দেখিতে হইবে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কতখানি সৌহার্দ্য বিদ্যমান ছিল।

কবিগুরুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী "নিকট হইতে দূরে" অর্থাৎ বর্ত্তমান হইতে আরম্ভ করিয়া অতীত পর্যন্ত ইহার ধারাবাহিক অনুসন্ধান আবশ্যক। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন তন্মধ্যে গৌড়াদ্য বৈদিক, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, উৎকল, দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও পাশ্চাত্য বৈদিকশ্রেণী উল্লেখযোগ্য। এইগুলির মধ্যে দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বৈদিক এবং উৎকল শ্রেণীর সংখ্যা বঙ্গদেশে অতি অল্প এবং এক একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। সমগ্র বঙ্গব্যাপী হিসাবে রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও গৌড়াদ্য বৈদিক—এই তিনটি শ্রেণীই প্রধান। বর্ত্তমানে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে যে ব্যবধান দেখা যায় তাহা জ্ঞাতিত্বের ব্যবধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু গৌড়াদ্য ও রাঢ়ী-বারেন্দ্রের মধ্যে ব্যবধান অতি বিস্তৃত। পরস্পরের

মধ্যে এত বিদ্বেষভাব পোষণ করেন যে, সেরূপ বিদ্বেষের তীব্রতা অন্য কোন ব্রাহ্মণশ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে দেখা যায় না। বর্ত্তমানে সামাজিক মর্য্যাদায় রাঢ়ী-বারেন্দ্র শীর্ষস্থানীয়, আর গৌড়াদ্যগণের নামই উল্লেখ দেখা যায় না। তাঁহারা তাঁহাদের যজমানগণের নামানুসারে প্রথমোক্ত শ্রেণীদ্বয় দ্বারা কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত এবং অনাচরণীয় বলিয়া গণ্য।

["কৈবর্ত্ত আচরণীয় আর তাহাদের ব্রাহ্মণগণ অনাচরণীয়। এরূপ অসঙ্গত ব্যবহার অন্য কোন দেশে নাই।" সামাজিক ইতিহাস—দুর্গাচন্দ্র সান্যাল ৪৬৩ পৃঃ]

এই অসঙ্গত ব্যবহারের মূল কারণ নির্ণয় করিতে হইলে "দূরে" অর্থাৎ প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে হইবে। কুলজী গ্রন্থসকলের উল্লেখ হইতে দেখা যায় সমগ্র বঙ্গব্যাপী হিসাবে মধ্যযুগে দুইটি প্রধান শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বিদ্যমান ছিলেন। তন্মধ্যে একটি সপ্তশতী এবং অপরটি পরাশর। পরাশর গৌড়াদ্যগণের একটি বৃহত্তর শাখা, আর সপ্তশতী, রাঢ়ী-বারেন্দ্রগণের কনোজিয়াদিগের সহিত সংমিশ্রিত হইবার পূর্ব্বনাম। কুলজী গ্রন্থে উল্লেখ আছে সপ্তশতীগণ ব্রাহ্মণ-সমাজে বিশেষ হীন বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

[বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস, ১৮২ পৃঃ—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার]

দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি হীন বলিয়া গণ্য হইলে অপরটি শ্রেয় বলিয়া গণ্য হইতেন ইহাতে আর সন্দেহের কি আছে? নতুবা কাহাদের তুলনায় তাঁহারা হীন বলিয়া গণ্য হইতেন। সপ্তশতীগণের এই হীনতার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইতিহাসে কি পাওয়া যায়?

ইতিহাসে দেখা যায় গৌড়দেশে প্রথম যে সকল ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই গৌড় ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত ছিলেন।

পরবর্ত্তী যুগে ক্ষত্রিয়যাজী ও বৈশ্যযাজী—এই দুইটি পৃথক্ শ্রেণীর সৃষ্টি দেখা যায়। পৃথক্ শ্রেণীর সৃষ্টি হইলেই শ্রেণী-বৈষম্যের উৎপত্তি অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ক্ষত্রিয়যাজীগণ সমাজে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেন। বাদাল গরুড় স্তম্ভে উল্লিখিত ব্রাহ্মণগণের নাম হইতে এবং পালরাজগণের বিভিন্ন তাম্র শাসন হইতে বুঝা যায় তৎকালে পালরাজগণের পুরোহিত গৌড়াদ্য ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। বৈশ্যযাজী সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ এই কারণেই হীন হইয়া পড়েন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পূর্ব্বে বৈদ্য ও কায়স্থগণ দ্বিজ সংস্কার ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন।

["কান্যকুব্জ হইতে আগত সেই কয়েকঘর গোত্র শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ দুই এক শত বৎসরে বহু সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এবার আর সেই পূর্ব্ব যুগের গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের পৃথক আর্য্য সংস্কৃতির আভিজাত্য নয়, সেই সংস্কৃত সংস্কৃতি বাঙ্গালীর মনীষা ও প্রতিভায় রূপান্তরিত হইতে লাগিল।" বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী, মোহিত লাল মজুমদার—৯৭ পৃঃ]

সপ্তশতীগণের অনেকে এই সামাজিক হীনতা অতিক্রম করিবার জন্য আদিশূর আনীত কনৌজ ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় লইতে এবং কৌলিন্য অভিযানের বিসদৃশ আচরণকে সমাজে প্রশ্রয় দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কয়েক পুরুষের মধ্যে শূররাজশক্তি হীনপ্রভ হইয়া পড়ে এবং সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ সেনরাজগণের আশ্রয় লইতে যত্নবান হন, তাহা বল্লাল সেনের নামে প্রচলিত কাহিনীসকল হইতে বুঝা যায়। সেনরাজগণও কয়েক পুরুষের মধ্যে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। অবশেষে সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের অনেকে মুসলমানদিগের আশ্রয় লন এবং মুসলমানগণের নিকট হইতে জমিদারীর বন্দোবস্ত লইয়া সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করেন এবং গৌড়াদ্য ব্রাহ্মণগণ হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা পরম্পরায় বুঝা যাইতেছে গৌড় ব্রাহ্মণগণ [illegible]রিয়াছিলেন।

ত্যাগের মূলে অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের বিদ্বেষও অন্যতম কারণ। আর ইহাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে দুইটি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পরস্পর বিদ্বেষের মূলে বঙ্গদেশে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ-লাভ করিয়াছিল। আর সেই কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য বাঙ্গালার ইতিহাসে কাল্পনিক গল্পের আতিশয্য ঘটিয়াছে।

মনে হয় বিজয় সেনের পরবর্তী আক্রোশ পড়িয়াছিল সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের উপর। ইহাদের উপর অত্যাচারের প্রধান কারণ তাঁহারা পূর্ব্বরাজশক্তির সহিত বহুদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। রাজশক্তি বণিকশক্তির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল। বহির্ভারতে এক সঙ্গেই গিয়াছে এই উভয় শক্তি। আর ইহাই যেন বহির্বাণিজ্যের সনাতন প্রথা। এদেশেও ইংরাজ প্রভৃতি বণিকগণ এইভাবেই আসিয়াছিল। ভারতে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রগুলি, সিংহল, যবদ্বীপ, সুমাত্রা বালী দ্বীপ, আনাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানেও রাজশক্তি ও বণিকশক্তি একসঙ্গেই গিয়াছিল।

["নবদ্বীপে ১৫১০ খৃঃ আনন্দভট্ট রচিত "বল্লাল-চরিতে" উল্লেখ আছে সেনরাজ্যে বল্লভানন্দ নামে এক ধনী বণিক ছিলেন। তিনি বল্লালকে স্বর্ণমুদ্রা ধার দিতে অস্বীকার করায় বল্লাল ক্রুদ্ধ হন। আর বল্লাল শুনিতে পান তিনি পালরাষ্ট্রের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন। তজ্জন্য সুবর্ণ বণিক্‌দের সমাজচ্যুত করেন।" বাঙালীর ইতিহাস।

—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ২৬০ পৃঃ]

সুবর্ণ বণিকগণকে কেবলমাত্র সমাজে পতিত করেন নাই। তাঁহাদের সমুদ্রযাত্রাও নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করার ফলে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অপূরণীয়। ইহাতে যে ইতিহাস ধনাগম বন্ধ হইয়াছে তাহা নহে; দেশবাসী কূপমণ্ডুক ও আসিয়াছিলে কায় পরিণত হইয়াছে। যখন হইতে বিদেশে তাঁহাদের

আধিপত্য নষ্ট হইয়াছে, তখন হইতে বিদেশীর আধিপত্য তাঁহাদের উপর পতিত হইয়াছে। বণিকগণের সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করার আরও একটা কারণ কেবলমাত্র বণিকগণের আর্থিক দুর্দ্দশা আনয়ন করার জন্য নয়, বাহিরের সহিত তাহাদের যোগাযোগ বন্ধ করা। ভারতের বহির্বাণিজ্যের স্থানগুলি পূর্ব্ব উপদ্বীপ ও পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, সেখানে পালরাজাদের আত্মীয়গণেরই রাজ্য, কাজেই তাহাদের সহিত যোগাযোগ বন্ধ করাই আসল উদ্দেশ্য।

["সমুদ্রযাত্রা নিষেধ :—সমুদ্রপথে বাণিজ্যের দ্বারা ভারতে ধনসম্পদ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে বৌদ্ধগণের আপত্তির হেতু ছিল না। ইহা ব্রাহ্মণগণেরই দাবী। এই দাবী উত্থাপনের দুইটি প্রকিষ্ট হেতুও দেখিতে পাওয়া যায় :—

(ক) পরাজিত বৌদ্ধগণ যাহাতে ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে গমন করিয়া ভারতীয় বৌদ্ধ উৎসাদনের মর্মন্তুদ কাহিনী ঐ সকল দেশের বৌদ্ধ রাজশক্তিকে জানাইয়া তাহাদিগকে ভারতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক.রতে না পারে।

(খ) পূর্ব্ব হইতে ভারতের বাহিরে নানা আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সকল উপনিবেশে বেদ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ সকল গিয়াছিল। সুতরাং জলপথে কেহ যাইয়া যদি ঐ সকল দেশ হইতে বেদাদি ধর্মশাস্ত্র সকল এদেশে আনিয়া ফেলেন, তাহা হইলে ভারতীয় বেদাদি শাস্ত্রের কোথায় কোন্ মন্ত্রে ব্রাহ্মণ বর্ণের সুবিধার জন্য প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা ধরা পড়িয়া যাইবে। অতএব এদিক দিয়াও ব্রাহ্মণগণের আশঙ্কা কিছু কম ছিল না।" ভবিষ্যভারত—স্বামী ভূমানন্দ, ৫৪।৫৫ পৃঃ]

বল্লালসেন—দেশের কুলপঞ্জিকায় বল্লালসেনের কীর্ত্তিকলাপের বর্ণনার শেষ নাই। তিনি বহু যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন, নানাবিধ সমাজ সংস্কার করিয়াছিলেন। কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি অদ্ভুতসাগর ও দানসাগর নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

কুলপঞ্জিকার কাহিনীগুলি যেরূপ কল্পিত ও অতিরঞ্জিত তাহাতে সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা যায় না। এগুলি সম্বন্ধে পর পর কিছু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, যুদ্ধ দ্বারা তিনি কোন্ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত পিতৃ অর্জিত তিন খণ্ড রাজ্য ছাড়া বল্লাল সেনের আর কিছুই ছিল বলিয়া দেখা যায় না। কোন কোন ইতিহাসে বল্লাল সেনের মগধ জয় ও লক্ষ্মণ সেনের বারাণসী জয়ের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু বখতিয়ার খিলজি যখন বিহার জয় করেন তখন মগধের সিংহাসনে গোবিন্দপাল। আর সমাজ সংস্কারের যে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়, যথা বৈদিক ধর্ম্মের সংস্থাপন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ —এই দুইটিতেই তাঁহার কতখানিই বা অবদান ছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত, এমন কি মৃত্যুকাল পর্যন্ত বৌদ্ধতন্ত্রের পঞ্চমকার সাধনার সঙ্গিনী হড্ডিকাকে লইয়াই জীবন কাটাইলেন। (সামাজিক ইতিহাস ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা দুর্গাচন্দ্র সান্যাল দ্রষ্টব্য।)

["বল্লাল-চরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বল্লাল সেন তন্ত্রোক্ত সিদ্ধি লাভের আশায় নীচ জাতীয়া রমণীর সহিত পঞ্চমকার সাধনায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন "রাজত্ব-কালের প্রথমাংশে বল্লাল বৌদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। সিদ্ধিলাভ আশায় তিনি এক চণ্ডালতনয়াকে হরণ করিয়াছিলেন।" হুগলী হাওড়ার ইতিহাস, ২৪২ পৃঃ—৺বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য]

তাঁহার অস্থি-মজ্জায় বৌদ্ধ প্রভাব জড়িত ছিল। সমাজ সংস্কারেই বা তাঁহার দান কতটুকু ছিল। তাঁহার নিজ জাতি ও স্বমতপন্থী জাতিগুলি তাঁহার পূর্ব্বে যে তিমিরে ছিলেন তাঁহার সময়েও সেই তিমিরেই ছিলেন। তাঁহারা দ্বিজ সংস্কারের কতটুকু অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন?

বৈদিক প্রথানুযায়ী কতকগুলি উৎসব ও ধর্ম্মানুষ্ঠান, যথা—দেবালয় প্রতিষ্ঠা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কোনকালে আর্যদের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছিল তাহা আদৌ বিশ্বাস হয় না। কারণ বৌদ্ধ পাল-নৃপতিগণ উক্ত অনুষ্ঠানগুলি উপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে যে সব ভূমি দান করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণে বহু তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম যেভাবে লইয়াছিলেন হিন্দুধর্ম্মও সেইভাবে লইয়াছিলেন।

["ভারতবাসী মাত্রেই বুদ্ধ প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করেন নাই, তবে মিলিয়া মিশিয়া বুদ্ধের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিলেন।"

—নানা কথা, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, এম. এ. ৭ পৃঃ]

["পাল যুগে বৌদ্ধ ও হিন্দু এত মিল দেখিয়া মনে হইত, বৌদ্ধ ও হিন্দু যেন একই সংহতি ধর্মের দুইটি শাখা।"

—বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম, শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত, ৮৩ পৃঃ]

স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়বিশেষকে হেয়প্রতিপন্ন করিবার ছলে দেশবাসীর মনে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা হইয়াছে। বহু লোককেই বলিতে শুনা যায় বৌদ্ধগণ বেদ বিদ্বেষী, হিন্দু সংস্কার বর্জিত ইত্যাদি ছিলেন। নিম্নের বিবরণটি হইতে সেই ধারণা দূর হইতে পারিবে।

["তিব্বতে জনৈক শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে দীপঙ্কর বলিয়াছিলেন যে, তিনি মাতার নিকটই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মাতার নিকট শৈশবের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জেতারি নামক জনৈক অবধূতের নিকট শিক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। কৈশোরে ও যৌবনের প্রথমভাগে সমগ্র ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি বৌদ্ধ পণ্ডিত রাহুলের নিকট বৌদ্ধ ত্রি-শিক্ষায় জ্ঞান লাভ করেন।" —বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী, শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৯ পৃঃ]

সকলেই জানেন দীপঙ্করের পিতৃবংশ সাহুর রাজবংশ এবং হুয়েন-সাং-এর সময় হইতে এই বংশ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাহাছাড়া যেটুকু সমাজসংস্কার হইয়াছে তাহা কুমারিলভট্ট, শঙ্করাচার্য ও তাঁহাদের শিষ্যগণের দ্বারাই তৎপূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বল্লাল সেনের দ্বারা কোন্ বিষয়ে কতটা উন্নতি হইয়াছিল ? বল্লালের নামের সহিত জড়িত প্রবাদবাক্যগুলি ও তৎসংশ্লিষ্ট সমাজগুলি বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় তিনি গ্রাম্যমণ্ডলের ন্যায় সমাজে এক তীব্র ভেদনীতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর মত, মূলে ছিল রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি নহে। চতুষ্পার্শ্বস্থ পালশক্তিগুলির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই তাঁহাকে পাগল করিয়াছিল। অন্যান্য ইতিহাস হইতেও তাঁহার এই অসহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

["স্বামী বিবেকানন্দ ভারত ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে আমাদের দেশের ইতিহাসে যে সমস্ত বড় বড় সমাজবিপ্লব ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহা কেবল "ধর্মের নামে সংশোধিত" হইতেছে। স্বামীজি বলেন, "চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্ম্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ।" স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী। —শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, ৩১২ পৃঃ]

এখানে স্বামীজি রাজনৈতিক অভাব পূরণের কথা বলেন নাই, কারণ তিনি সমাজ সংস্কার আলোচনা প্রসঙ্গেই উক্ত কথাটি উত্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজনৈতিক অভাবের বিষয় উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইতে পারে। কিন্তু ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানেন যে, অধিকাংশ বড় বড় সমাজবিপ্লবের পশ্চাতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মূল সূত্রটিই বিদ্যমান এবং সেই রাজনৈতিক অভাবের পূরণ হয় ধর্ম্মের নামে।

["সমগ্র রাজ্যের রাজচক্রবর্তী হইয়াও বল্লাল সেন তাঁহার একাতপত্রের ছায়ায় সমস্ত প্রজালোকের ধর্মমতের গোপ্তারূপে নিজের পরিচয় দিতে পারেন

নাই। পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষে ও অসহিষ্ণুতায় তিনি শুধু নিজের রাজসিংহাসনকেই অপমান করেন নাই, বাঙ্গালার অন্তরাত্মাকেও যেন বহুধা বিভক্ত করিয়াছিলেন"।—বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম, শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত, ২২০-২২১ পৃঃ]

["বাণিজ্যের জন্য সাত সমুদ্র পাড়ি দিত বাণিজ্যের নৌকা। সেনরাজত্বে এই বণিকশক্তিকে খর্ব করেই বোধ হয় স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল এক জবরদস্ত রাজতন্ত্র—কৌলিন্যের সূত্রে সে অত্যাচার পাকা হোল বণিকদের উপরে, বিরোধী জাতিদের করলে ছোট ও পতিত। সমাজের ভিতরে এই শ্রেণী-বৈষম্য ও সংগ্রামে যে সেন রাজ্যই পরিণামে অন্তঃসার শূন্য হয়ে উঠেছিল, তাও বুঝা যায়। আর শেষদিককার শাসক শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খলতার ও অকর্মণ্যতার কাহিনী তখনকার কাব্যে যথেষ্ট রহিয়াছে।" বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপ। —শ্রীগোপাল হালদার ২১ পৃঃ]

দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের সামাজিক ইতিহাসে বর্ণিত বল্লালের জীবনী হইতেই বুঝা যায় যে তাঁহার দ্বারা সমাজ-সংস্কাররূপ বিরাট কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভব ছিল না। পিতা যে খণ্ড রাজ্যগুলি অধিকার করিয়া কণ্টকশূন্য করিয়া গিয়াছিলেন সেইগুলিই তিনি ভোগ করিয়াছিলেন এবং নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে পঞ্চমকার সাধনায় রত ছিলেন। উপরন্তু দেশের রাজা, তখন শরণাগত জাতিগুলিকে ভুয়া সামাজিক মর্য্যাদার লেপন দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন আর এই নীতিটি পিতা বিজয় সেনেরই উদ্ভূত বলিমা মনে হয়, যাহার দ্বারা তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, বৈশ্যদিগকে নিজদলভুক্ত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। এগুলি নিতান্ত 'নগন্য কথার' সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থানলাভ ঘটে নাই।

["কৌলিন্য প্রথার সঙ্গে বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অথচ এই দুই রাজার আমলে যে সব স্মৃতি ও ব্যবহার গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাঁহাদের নিজেদের যে সকল লিপি আছে তাহার একটিতেও এই

প্রথা সম্বন্ধে উল্লেখ তো দূরের কথা, একটি ইঙ্গিত পর্যন্ত নাই। তাছাড়া এই যুগের ভবদেব ভট্ট, হলায়ুধ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের এবং অসংখ্য অপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের যে সব উল্লেখ সম-সাময়িক গ্রন্থাদিতে ও লিপিমালায় পাওয়া যায়, তাঁহাদের একজনকেও কেহ ভুলিয়াও কুলীন বলেন নাই। বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের নাম কৌলিন্য প্রথা উদ্ভবের সঙ্গে জড়িত থাকিলে তাঁহারা নিজেরা কেহ তাহা উল্লেখ করিলেন না, সম-সাময়িক গ্রন্থে বা লিপিমালায়ও তাহার উল্লেখ পাওয়া গেল না—ইহা খুবই আশ্চর্যের বিষয়।

১৬।১৭ শতকে মুসলমান যুগে কুলজীগ্রন্থ রচিত হইতে থাকে। তখন মুসলমান যুগ। বাঙ্গলার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালীর জ্ঞান ও ধারণা খুব অল্প ছিল। ১৫।১৬ শতকে যে সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সেই লোকস্মৃতি অবলম্বনে কুলজীগুলি লেখা হইয়াছিল।"

—বাঙালীর ইতিহাস, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ২৬৩।৬৪ পৃঃ]

["সেনরাজাদের প্রায় সকল তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই সকলে বল্লালের কৌলিন্য স্থাপনের কথা আদৌ নাই। বল্লালের আভিজাত্য সংস্থাপন, রচা কথা, বল্লালের সময় তাহা ছিল না। দেবীবর ঘটকের মেলবন্ধনের পর কৌলিন্য লইয়া এরূপ আন্দোলন চলিতে থাকে।"

—যশোহর খুলনার ইতিহাস, ৺সতীশচন্দ্র মিত্র, ২৪০ পৃঃ]

লক্ষ্মণ সেন

বল্লাল সেনের পর তাঁহার পুত্র লক্ষণ সেন রাজা হন। তিনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার রাজসভায় অনেক বড় বড় পণ্ডিত-লোকের সমাবেশ হইত। তাঁহারই সাহায্যে ও উৎসাহে কবি জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করেন। একমাত্র ইহাই সেন রাজত্বকালকে বাঙ্গলার ইতিহাসে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এই গুণটি তাঁহার পক্ষে দোষে পরিণত হইয়াছে দেখা যায়। রাজারা

রাজনীতি ছাড়িয়া কাব্য সাহিত্য লইয়া মাতামাতি করিলে রাজকার্য্যে অবহেলা হওয়া অনেকটা স্বাভাবিক। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পাল রাজাদিগের মন্ত্রী কেদারমিশ্র বৃদ্ধ বয়সে রাজনীতি ছাড়িয়া যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম কার্য্য লইয়া মাতিয়া থাকায় পাল শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এক্ষেত্রেও মনে হয় রাজনীতি ছাড়িয়া কাব্য চর্চ্চা করিতে গিয়াই সেন রাজশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই দুর্ব্বলতার সুযোগে দক্ষিণের গঙ্গাবংশীয়গণ তাঁহার মধ্যরাঢ় রাজ্যটির দক্ষিণ অংশ অধিকার করিয়া লন। ইতিপূর্ব্বে গৌড়রাজ্য উত্তর বরেন্দ্রের পাল নৃপতিগণ পুনরুদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন। মধ্যরাঢ়ে নবদ্বীপের চতুষ্পার্শ্ব লইয়া অবশিষ্টাংশ যে ক্ষুদ্র রাজ্যটি বিদ্যমান ছিল তাহা মুসলমানগণ অধিকার করিলে লক্ষ্মণ সেন পূর্ব্ববঙ্গে, বিক্রমপুরে চলিয়া যান। সেখানে তাঁহার বংশধরেরা আরও কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

["লক্ষ্মণসেনের আমলেই রাজ্যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা যায়। দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। এ সময় মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি বক্তিয়ার খিলজি বঙ্গ অধিকার করেন।

গঙ্গাবংশীয়গণ দীর্ঘদিন ধরিয়া সেন ও মুসলমানদিগের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করেন।"

—ভারতকথা, শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য এম. এ, বি. এল., ১২৪ পৃঃ]

["বখতিয়ার খিলজি নবদ্বীপ অধিকার করিলে বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন জগন্নাথতীর্থে প্রস্থান করেন। কেহ কেহ বলেন, তৎপূর্বে তাঁহার হস্ত হইতে গৌড়ের অধিকার চ্যুত হইয়াছিল। পাল বংশীয়েরাই তাঁহাকে গৌড়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন।"

— হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়, শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত, ৪৪ পৃঃ]

পালবংশীয় ও গঙ্গাবংশীয়গণের হাতে সেনবংশীয়গণের এই যে শোচনীয় পরাজয় ইহাই বাঙ্গলার অদৃষ্টে চির দুঃখের মুল কারণ বলিয়া মনে হয়।

ঐ যে সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহীর নবদ্বীপ অধিকার এবং লক্ষ্মণ সেনের জ্যোতিষী পুরোহিতের জ্যোতিষ গণনা,—"এবার বাঙ্গলা যবনের হাতে যাইবে"—আর তাহা শুনিয়া 'লক্ষ্মণ সেনের খিড়কির দরজা দিয়া গোপনে পলায়ন', ঐ যে 'বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বাঙ্গলা দেশে মুসলমানদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন' ইত্যাদি কুয়াসাচ্ছন্ন ও অবিশ্বাস্য কিংবদন্তীগুলি চলিয়া আসিতেছে, যাহা শুনিয়া দেশবাসীগণ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকেন, সেগুলির অর্থ এখনও আবিষ্কৃত হইয়াছে কি? যদি আজগুবি কল্পনার আশ্রয় না লওয়া হয়, যদি সরল বিজ্ঞান সম্মত যুক্তির আশ্রয় লইয়া উক্ত কিংবদন্তীগুলি বিশ্লেষণ করা যায় তাহা হইলে হয়ত প্রকৃত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক নবদ্বীপ অধিকার ও লক্ষ্মণ সেনের খিড়কির দরজা দিয়া পলায়ন—এটা যেন একটি পূর্ব্বকল্পিত নাটকীয় ঘটনা। লক্ষ্মণ সেনের পুরোহিত কিংবা গুরুদেবকে উক্তরূপ জ্যোতিষ-গণনার জন্য মুসলমানদিগের সহিত ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করা হয়, আর বাস্তব ইতিহাসে দেখা যায় মুসলমান শাসন পত্তন হইলে তাঁহাদের অধীনে যে সমস্ত হিন্দু জমিদার নিযুক্ত হন, লক্ষ্মণ-সেনের গুরুদেবই তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম।

মুসলমানগণকে যদি ডাকিয়া আনাই হয়, তাহা হইলে প্রতিহিংসা-পরায়ণ পরাজিতদের মধ্য হইতেই কেহ বা কাহারা ডাকিয়া আনিয়া থাকিবে। এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে গৌড়রাজ্য উত্তর বরেন্দ্রীর পালবংশীয়গণ কর্ত্তৃক পুনরুদ্ধৃত হইলে এবং গঙ্গাবংশীয়গণ নবদ্বীপের সীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে, "উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ" বলা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বাঙ্গলা দেশেও "জয়চাঁদের" অভাব হয় নাই। লক্ষ্মণ সেনের পুরোহিত, গুরু, কিংবা ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বাঙ্গলা দেশে

"জয়চাঁদরূপে" অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি মধ্যবঙ্গে মুসলমান রাজ্য স্থাপনে সাহায্য করিয়াছিলেন। পরে মুসলমানগণ উত্তরবঙ্গ অধিকার করিলে লক্ষ্মণ সেনের গুরুদেবই প্রথম জমিদারীর বন্দোবস্ত লন।

["পাঠান রাজত্বে যে সকল হিন্দু, জমিদারীর বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন, তন্মধ্যে লক্ষ্মণ সেনের গুরুদেব বংশই প্রাচীনতম।" —সামাজিক ইতিহাস, শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল, ১৫২ পৃঃ]

["অনুমান হয় লক্ষ্মণসেনের পুত্রত্রয়ের মধ্যে বিরোধ বশতঃ ষড়যন্ত্রের সাহায্যেই হউক কিংবা রাজ্যলিপ্সু অন্য সামন্ত বা রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণের সাহায্যেই, বখ্তিয়ার নির্ব্বিরোধে নদীয়ায় আগমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

—হুগলী হাওড়ার ইতিহাস, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য, ২৮৬ পৃঃ]

["সেনরাজগণের সময়ে বঙ্গদেশে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজা ছিলেন মুসলমানগণকর্ত্তৃক বঙ্গাধিকারের পর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ঐ সকল সামন্তরাজদিগের মধ্যে অনেকের রাজ্য গৌড়াধিপতিগণ কাড়িয়া লইয়া আমীর, উমরাহ ও সেনাপতিদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ণিয়া, মালদহ, দিনাজপুর, রাজসাহি, বগুড়া, পাবনা এবং রংপুর অঞ্চলে প্রাচীন সামন্তরাজগণের সম্পত্তি এইরূপে মুসলমান করকবলিত হয়।"

—বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত, ৺পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪৬ পৃঃ]

উপরিল্লিখিত মন্তব্য হইতে দুইটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে :— (১) দিনাজপুর, বগুড়া, রঙ্গপুর কি সেনরাজগণ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল, না উত্তর বারেন্দ্রীয় পালরাজাদের হস্তেই ছিল? এ সম্বন্ধে উপরি উক্ত পুস্তকেরই ২৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) গৌড়ের মুসলমান রাজাদিগের আমীর, উমরাহগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই কি অধিক ছিলেন না? এসম্বন্ধে দুর্গাদাস সান্যাল মহাশয়ের "সামাজিক ইতিহাস" পুস্তকখানি দ্রষ্টব্য। উত্তর বঙ্গের

প্রাচীন পাল রাজবংশগুলিকে ধ্বংস করিয়া ঐ সকল ব্রাহ্মণ ওমরাহগণই জমিদারীর বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন।

বৌদ্ধভিক্ষুগণ মুসলমানদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, এরূপ একটি কিংবদন্তীও দেশে প্রচলিত আছে। অথচ প্রকৃত পক্ষে এই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণই মুসলমান হস্তে সর্ব্বাধিক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে। এরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত কথার মুলেও যে বিপরীত ঘটনা নিহিত আছে, ইহাই স্বাভাবিক। এখন সেই তথ্যের অনুসন্ধানই বিশেষ প্রয়োজন।

["রামাই পণ্ডিতের অর্বাচীন "শূন্য পুরানের" শেষে নিবদ্ধ "নিরঞ্জনের রুষ্মা" দেখিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, বৌদ্ধেরাই বাঙ্গলাদেশে মুসলমান আক্রমণকারিগণকে ডাকিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু ইতিহাসের কথা মোটেই ইহা নয়, বরঞ্চ ইতিহাস অনুসারে, বৌদ্ধদের উপর মুসলমানদের ক্রোধ ছিল বেশী এবং মুসলমানদের আক্রমণে তাহাদেরই সর্বনাশ হইয়াছিল সর্বাপেক্ষা অধিক।"—বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম, শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত, ২৩১ পৃঃ]

["বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনেই ভারতবর্ষ থেকে বিলুপ্ত হ'য়েছে। কিন্তু শঙ্করের পর বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল পালরাজদের অধীনে মগধ ও বঙ্গ। পাঠানরা এই অঞ্চলের বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ধ্বংস করে এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বেপরোয়া হত্যা করে যে, সে ধর্মের শেষ শিখাটি নির্বাণের প্রধান সহায়ক এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এই সময়ে মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তুর্কীজাতি আরবরাজ্য ধ্বংসের জন্য অগ্রসর হইয়া ইসলামধর্ম্মাবলম্বী আরবদের বরাবর পরাজিত করেছিল। তাই বোধ হয় ইসলামধর্ম্মাবলম্বী পাঠানরা ঐরূপ বৌদ্ধবিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছে। তারা হিন্দুদের চেয়ে বৌদ্ধদের উপরই বেশী অত্যাচার করেছে। মধ্য-এশিয়ায় যে বৌদ্ধ-জাগরণ ও মুসলমান আক্রমণ সুরু হয়, মগধবিজয়ের পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কিছুকাল পরে, ১২৫৮ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত কুবলই খাঁর ভ্রাতা হুলাগুখাঁ কর্ত্তৃক বাগদাদ অধিকার ও আরবজাতীয় শেষ সুলতান মুস্তাশিখবিল্লার হত্যায় তা পরিণতি লাভ করে।"—প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, ডাঃ প্রফুল্লকুমার ঘোষ ২২৩।৪ পৃষ্ঠা।]

এখানে মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধগণের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য ভারতীয় বৌদ্ধগণের প্রতি অত্যাচারের অনুমান করা অসঙ্গত হইয়াছে, তাহা ছাড়া ভারতের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া যদি বৌদ্ধগণের অনুকূল থাকিত তাহা হইলে সাল তারিখ জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের নিকট হয়তো সে অনুমানের মূল্য থাকিত। এদেশেই বৌদ্ধগণের ও উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী রাজবংশগুলির প্রতি অন্যান্য দেশবাসী ও রাজণ্যবর্গের হিংসাই উক্ত কারণ নির্ণয়ের উজ্জ্বলতম উপাদান।

এখন নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে "এই কেহ কেহ" সিদ্ধান্তকারী কাহারা হইবেন। ইহাকেই বলে "চোরের মন…… ………!" পদে পদে উল্টা চাপ। এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে মুসলমানদিগকে ডাকিয়া আনা হইয়াছিল এরূপ একটি কিংবদন্তী ঠিকই চলিয়া আসিতেছে। তবে অতি চালাকের দল সেই 'উদোর পিণ্ডটা বুদোর ঘাড়ে' চাপাইয়া দিয়াছে। বাঙ্গলার ইতিহাসের আগাগোড়াই এইরূপ বৈশিষ্ঠ পূর্ণ।

হাজার হাজার নিরীহ বৌদ্ধভিক্ষুর মুণ্ডিত শির মুসলমান তরবারিতে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। বৌদ্ধমঠে রক্ষিত বৌদ্ধ ও হিন্দুর রাশি রাশি গ্রন্থ ভস্মীভূত করা হইয়াছে। হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুর মস্তক অপেক্ষাও ঐ সকল গ্রন্থ যে অধিকতর মূল্যবান তাহাতে সন্দেহ নাই। সমগ্র হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ, চিকিৎসাশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রভৃতি অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার তৎকালীন বৌদ্ধ মঠগুলিতে সযত্নে রক্ষিত ছিল। মুসলমানগণ রাজ্য জয় করিতে আসিয়াছে, রাজ্যজয়ই করিবে, সন্ন্যাসী-গণের প্রতি অত্যাচার এবং তাহাদের সঞ্চিত গ্রন্থসমূহ ধ্বংস করার অর্থ কি? ইহার মূলেও যে এক শ্রেণীর প্ররোচনা ছিল তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

["বৌদ্ধ-বিহারগুলি জ্ঞানচর্চ্চার—বিশেষ করিয়া চিকিৎসা ও রসায়ন বিজ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম যখন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল তখন জনসাধারণ এবং চিন্তাশীল ব্রাহ্মণগণ মহা উৎসাহে বৌদ্ধগণের সবকিছু ত্যাগ করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চ্চাও দেশ হইতে উঠিয়া গেল।"—বিচিত্র ভারত ১১৯ পৃষ্ঠা, শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় M. A., Ph. D., P. R. S. ও শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় M. A., Ph. D., P. R. S.]

এখানে ব্রাহ্মণগণ বলিতে কনোজ ব্রাহ্মণগনকেই বুঝা যাইতেছে। পরবর্ত্তী বিবরণগুলি হইতেই তাহা অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। আর বারেন্দ্র ভূমিতেও একশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ তাহাদের দলভুক্ত ছিলেন, আর তাঁহাদেরই সাহায্যে উক্ত স্থানের বিখ্যাত বিহারগুলি ধ্বংস হইয়াছিল, ইহাই ঘটনা পরম্পরায় বুঝা যায়।

আবার কোন কোন ঐতিহাসিক ভারতের প্রাচীনগ্রন্থ সকল ধ্বংসের জন্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকেই দোষ দিয়া থাকেন।

["বৌদ্ধদিগের অত্যাচারে যাবতীয় প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কারণ বৌদ্ধ যুগের প্রাচীন গ্রন্থাদি বড় একটা দেখা যায় না।" সামাজিক ইতিহাস—৺দুর্গাচন্দ্র সান্যাল—সম্পাদকের নিবেদন ১ পৃঃ]

এইরূপ অমূলক সন্দেহের কোন কারণ দেখা যায় না। বৌদ্ধগণেরও ধর্ম্ম পুস্তক সকল বেদ, উপনিষদ ও প্রাচীণ হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বনে রচিত একথা বোধ হয় সকল ঐতিহাসিকই বলিবেন। কেবলমাত্র বৌদ্ধ বৌদ্ধ বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া এক শ্রেণীর লোক, দেশের লোকের মনে, একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য নিম্নের বিবরণটি উল্লেখ করা হইল।

["নালান্দা যখন গৌরবের গৌরীশৃঙ্গে উন্নীত, নালান্দার সঙ্ঘারামে তখন বিদ্যার্থীর সংখ্যা কখনও দশ সহস্রের নিম্নে অবতরণ করিত না। তাঁহাদের অধ্যয়নের বিষয় ছিল শুধু মহাযান ও অষ্টাদশ শাখার তত্ত্ব নিচয় নয়,

বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, এবং সাংখ্যদর্শন। এই সকল সূত্র শব্দের দুস্তর সমুদ্র পার হইতে একমাত্র শীলভদ্রই সমর্থ হইয়াছিলেন।"
—বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্ম, শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত, ৫৫ পৃঃ]

["বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির পরে, আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের ও রাজপুত জাতির অভ্যুত্থান। এই সময় ব্রাহ্মণ্য শক্তির পুনরভ্যুত্থান রাজশক্তির সহিত সহকারীভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল।·· এই যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই জাতি পরস্পর স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরস্পর সহায়ক। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণগণের পরামর্শ অনুসারে বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির উপর সবিশেষ নির্য্যাতন করিতে ত্রুটি করেন নাই। ফলে হইয়াছিল ব্রাহ্মণের শাপে আর ক্ষত্রিয়ের চাপে এই যুগে বৌদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত বৈশ্য, শূদ্র, জাতি সকল নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছিল।

কে বলিতে পারে যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে বৈশ্য শূদ্রের যে প্রবল অসন্তোষ তাহারই সহায়ে এবং তাহারই উপর নির্ভর করিয়া ইসলাম পতাকাধারী বীরগণ সহস্রবৎসর ব্যাপী সাম্রাজ্যকে নিখাত করিলেন কি না? ভারতেতিহাসের আলোচনা করিতে গিয়া এই জটিল প্রশ্নটিকে পাশ কাটাইয়া যাওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। ভারতে মুসলমান বিজয় ও মুসলমান সাম্রাজ্য কিসে সম্ভব হইল এ প্রশ্নের উত্তর আমরা ঐতিহাসিকগণের নিকট যথা যথ পাই নাই"—স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলার উনবিংশ শতাব্দী, গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী—নূতন সংস্করণ, ১৬৮ পৃঃ]

বৌদ্ধগণ যেভাবে নিষ্পেষিত হইয়াছিল তাহার বর্ণনা স্বামিজী স্পষ্টই দিয়াছেন। কিন্তু কিভাবে সহস্রবৎসর ব্যাপী সাম্রাজ্যগুলি ধ্বংস হইল তাহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া শুধু প্রশ্নই উত্থাপন করিয়া গিয়াছেন ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্যে। এ প্রশ্নের উত্তর একটি তথ্যের উপর নির্ভর করিতেছে যে (বাঙ্গলা, বিহার সম্বন্ধে) পূর্ব্বভারতের বিশাল সাম্রাজ্যগুলি তখন কাহাদের হস্তে ছিল। বৌদ্ধগণের হস্তে, না রাজপুত ক্ষত্রিয়গণের হস্তে? এইবার স্থির হউক, কাহারা

তাহাদের ধ্বংস করিয়াছে। বাঙ্গালা, বিহার সমগ্রটাই তখন বৌদ্ধ পালরাজগণের হস্তে ছিল।

["ইতিহাস বিশ্লেষণে বিবেকানন্দের ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ অমূলক। বিবেকানন্দের এইরূপ ইতিহাস বিশ্লেষণে ব্রাহ্মণজাতির উপর কটাক্ষ আছে বলিয়া এক সময়ে ভীষণ প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস, স্বামিজী ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ কটাক্ষপাত করেন নাই। ইতিহাস বিশ্লেষণে, বিশেষতঃ ভারত ইতিহাসরূপ সমুদ্রমন্থনে যদি কখনও কখনও অমৃতের সহিত গরলও উঠিয়া থাকে তবে ব্রাহ্মণদিগকে শুধু অমৃত দিয়া তাহাদের স্বকর্মোপার্জিত গরলের ভাগ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করেন নাই। ইহাতে বিবেকানন্দের প্রবল সত্যানুরাগ ও নির্ভিক স্পষ্টবাদিতাই প্রকাশ পাইয়াছে। তদতিরিক্ত আর যাহা, তাহা দুর্ব্বল মস্তিষ্কের কল্পনা, অসূয়া ও ঈর্ষার বিজৃম্ভণা। সে সব বৃত্তান্ত না তোলাই ভাল।"—স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী, ৩২৬ পৃঃ]

এখানে আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। স্বামিজী ক্ষত্রিয়গণের ও ব্রাহ্মণগণের সম্মিলিত শক্তি দ্বারা বৈশ্য ও শূদ্রগণের ধ্বংসের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে ক্ষত্রিয় বলিতে কাহাদের বুঝায়? বাঙ্গালায় তখন কোন ক্ষত্রিয় ছিলেন কি? না, তাঁহারা বৌদ্ধ হইয়া বৈশ্য শূদ্রে পরিণত হইয়াছিলেন? স্বামিজীর উল্লিখিত ক্ষত্রিয়, শঙ্কর পন্থী শক-হূণ উন্নীত, কনোজ ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞাগ্নি সম্ভূত—রাজপুত ক্ষত্রিয়।

["এই সময় হইতে ব্রাহ্মণ্য শক্তির যে অধঃপতন হইয়াছে, আর তাহার পুনরুত্থানের উল্লেখ ভারতেতিহাসে দেখা যায় না। স্বামীজী বলিতেছেন, "এই প্রকারে কুমারিল হইতে শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজ আদি পরিচালিত রাজপুতাদি বাহু,—জৈন বৌদ্ধ রুধিরাক্ত কলেবর পুনরভ্যুত্থানেচ্ছু ভারতে পৌরহিত্য শক্তি মুসলমানাধিকার যুগে চিরদিনের মত প্রসুপ্ত রহিল"। স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী—শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, ৩২৫ পৃঃ]

উপরিল্লিখিত 'রাজপুতাদি বাহু, জৈন বৌদ্ধ রুধিরাক্ত কলেবর' এই কথাটি হইতেই তৎকালীন ক্ষাত্রশক্তির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে, আর সেই সঙ্গেও বুঝিতে পারা যাইবে যে কনোজব্রাহ্মণের নামে বঙ্গলাদেশে যে একটা অতিভক্তি চলিয়া আসিতেছে তাহার আসল উদ্দেশ্য কি? তাঁহাদের হিংসাপরায়ণ নিষ্ঠুরতাই তাহাদিগকে কৌলিন্যের পদ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রচারের ফলে বহুস্থানেই এইরূপ ভ্রান্ত সংস্কারের সৃষ্টি হয়। অথচ আজকাল আমরা নানারূপ প্রচারের জন্য ব্রিটেন ও আমেরিকাকেই দোষ দিয়া থাকি।

["কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞাগ্নি হইতে কতকগুলি ক্ষত্রিয় উৎপাদন করিলেন, তাঁহারা বৌদ্ধদিগের বিনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রমার, পরিহার, চালুক্য ও চালুমান এই সম্প্রদায়ের ক্ষত্রিয়। এই অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়গণ দ্বারা মগধরাজ্য ধ্বংস হইল। এই অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়গণের নাম হইল পাষণ্ডদলন। এই পাষণ্ডদলন দ্বারা কনৌজ ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।"

—সামাজিক ইতিহাস, শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল ৭ পৃঃ]

এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠিতেছে যে মগধরাজ্য কি অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়, রাজপুতগণ কর্ত্তৃক ধ্বংস হইয়াছিল, না মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ধ্বংস হইয়াছিল। এখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে কনোজরাজ মুসলমানদিগের দ্বারা কেবলমাত্র পৃথ্বীরাজের দিল্লীরাজ্য ধ্বংস করেন নাই, মগধ ও বাঙ্গলার পাল রাজ্য গুলিও ধ্বংস করিয়াছিলেন। আর কেবলমাত্র কনোজের ক্ষত্রিয়গণেরই মুসলমান প্রীতির ও সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া যায় না। তথাকার ব্রাহ্মণগণেরও ক্ষত্রিয়গণের সহকারীরূপে মুসলমান প্রীতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

প্রকৃত কথা, পালশক্তির সহিত সেন শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর সেইটাকেই স্বার্থসিদ্ধিপরায়ণ ঐতিহাসিকগণ নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী বর্ণণা করিয়াছেন। পালরাজগণ সর্ব্বজনবিদিত যুগোপযোগী

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। আর সেনরাজগণ যেহেতু তাঁহাদের শত্রু, তখন তাঁহাদিগকে তাহার একটা উল্টাপথ অবলম্বন করিতেই হইবে। সেইজন্য দেখা যায়, সেনবংশীয়গণ (বৈদ্য জাতীয়) আদিতে বৌদ্ধ হইলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মপ্রচারের নামে তাহাদের কত উচ্চ প্রসংশা। আর পালরাজগণকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নামে কতই না উপেক্ষা করা হয়।

সেন বংশীয়গণের দ্বারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কতখানি উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবার তাহার বিচার করিয়া দেখা যাক। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের দ্বারা কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তনের কিংবদন্তীটি সম্পূর্ণ ভুয়া, তাহা দেখান হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উন্নতি সাধনকরারূপ কিংবদন্তীটি তদনুরূপ ভুয়া হইবে, পরবর্ত্তী বিবরণগুলি পাঠ করিলে তাহাতে আর সন্দেহ থাকিবে না।

["বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ্য আচার ধর্ম্মের প্রভাব মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতে অনুভূত হইয়াছিল। উত্তরে বারেন্দ্র, নাটোর, পুঁটিয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণ জমিদারগণের উদ্ভবের, সুষঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা প্রকট হইবার পরে, বাগড়ীতে কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ প্রবল হইবার ফলে ব্রাহ্মণ্য আচার সমাজ শরীরের উপর একটু কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আচরণ সমেত হিন্দু-সমাজকে ইংরাজ হাতে তুলিয়া লয়েন এবং নবদ্বীপ, ত্রিবেণী, ভট্টপল্লীর পণ্ডিতগণের পরামর্শ অনুসারে, জজপণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং হাইকোর্টের রুলিং এবং আইনকানুনের প্রভাবে, এখন ব্রাহ্মণ্য আচরণ সমাজের উপর জাঁকিয়া বসিয়াছে।"

—বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী, ৺মোহিতলাল মজুমদার, ৮৭ পৃঃ]

সমগ্র সেন শাসনকালটি, পাল ও সেন—এই দুই সম্প্রদায়ে বাদানুবাদ ও প্রতিদ্বন্দিতা করিয়াছে। এখন মুসলমান শাসনকালে, জবরদস্ত শাসকদের প্রভাবে সেটা ঘুচিয়া গিয়াছে। এখন প্রবলের আশ্রয়ে বেশ নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিতে সমাজ সংস্কার ব্যবস্থা চলিল, ইহাই তো

বাহ্যিক দৃশ্য। কিন্তু পূর্ব্বের সেই তুইটি দলের প্রতিদ্বন্দিতা ঘুচিয়া গিয়া উভয়ে মিলিয়া সমাজ সংস্কার আরম্ভ করিল, না একদলকে আর একদলের জীর্ণ করার ইতিহাসকে লইয়া, ধর্ম্মসংস্কার করার নামে হৈ, চৈ, করা হইল। যে দলটি অন্য দলটিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল তাহার পক্ষে মুসলমান শাসন বিশেষ কল্যাণকর হইয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন বুঝিতে পারা সহজ, কাহারা, কিজন্য মুসলমানদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। আর ঐ যে ব্রাহ্মণ জমিদারগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সংস্কারে অগ্রণী হইয়াছিলেন, তাহাদের সহিত মুসলমান দিগের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা নির্ণয় করিলেই প্রকৃত তথ্য মিলিবে।

["যশোহরের প্রতাপাদিত্যের সহিত মুসলমানদিগের যুদ্ধে ভবানন্দ মজুমদার নামক একজন রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ রসদ জোগাইয়া বাগোয়ান পরগণা জমিদারী পান। নদীয়ার রাজবংশ তাঁহারই সন্তান।"

—সামাজিক ইতিহাস—শ্রীতুর্গাচন্দ্র সান্যাল, ১৭৬ পৃঃ]

["বাঙ্গলার ষোড়শ শতাব্দীর বিদ্রোহ জয়যুক্ত হয় নাই, কারণ তখন প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলায় ভবানন্দ মজুমদারের মত বিশ্বাসঘাতক ছিল।" স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, পৃষ্ঠা—২৭০]

উক্ত জমিদার বংশটি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মসংস্কারে কিরূপ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নের বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে।

["পাঠান রাজত্বকালে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের অতিশয় দরিদ্র অবস্থা ছিল। তাঁহারা কুলজ্ঞদিগকে যথোচিত পুরস্কার দিতে পারেন নাই। তজ্জন্য তাঁহাদের কুলশাস্ত্র ধারাবাহিক রক্ষিত হয় নাই। মোগল রাজ্যারম্ভে নবদ্বীপের রাজারা সম্পত্তিশালী জমিদার হইয়া রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন। সেই সময় যাহা ঠিক সংগৃহীত হয় নাই তাহা কল্পিত কথা

দ্বারা পূরণ করা হইয়াছে। এই জন্য রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্র অনৈক্য দোষ পরিপূর্ণ।" সামাজিক ইতিহাস—শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল—পৃষ্ঠা, ৪৫০]

এই তো গেল ঐ যুগের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মসংস্কারের আদি কথা যাহাকে কেন্দ্র করিয়া ইতিহাসে হৈ, চৈ এর অন্ত নাই। আর রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণ গণের অবস্থা দরিদ্র ছিল বলিয়া কিছু করিতে পারেন নাই, এই কথার অর্থ, বরেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ তখন অনেক কিছু করিয়াছেন।

যে হেতু পাঠান রাজত্বে তাঁহারা অবস্থা বেশ গুছাইয়া লইয়াছেন। ঐ যে নাটোরের মহারাজার উল্লেখকরা হইল, তাঁহার আদিপুরুষও মুসলমান আশ্রয়ে থাকিয়া রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন। দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের সামাজিক ইতিহাসে তাঁহার এবং বরেন্দ্রের অন্যান্য জমিদারগণের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। উক্ত পুস্তকের ৩৪১-৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এতদ্দেশীয় প্রাচীন ব্রাহ্মণগণকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার এবং কনোজিয়াগণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার অনুকূলে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহার সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণের দুই একটি মন্তব্য উল্লেখ করা হইতেছে।

["গরুড়স্তম্ভলিপিতে গুরব মিশ্র যে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ছিলেন তাহা স্পষ্টাক্ষরেই উল্লেখ করা আছে। আদিশূর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যিনি শাণ্ডিল্য-বংশীয় ছিলেন তিনি নারায়ণ। স্তম্ভলিপির বিলুপ্ত নামটি নারায়ণ হইতে পারে না। উক্ত শ্লোকে পরশুরাম ও গুরব মিশ্র উভয়েই জমদগ্নি কুলোৎপন্ন বলিয়া বর্ণিত। শাণ্ডিল্য বংশে ভৃগু (বিষ্ণু নহে)। তিনিই বীজপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিলেন। এই স্তম্ভলিপি ব্যাখ্যা করিলে তদুল্লিখিত শাণ্ডিল্য-বংশীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত আদিশূর কর্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনীর সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে বরং এই মাত্র বুঝা যায় যে পাল রাজাদের শাসন সময়ের পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশে বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু এরূপ প্রমানের সহিত আদিশূরের

ব্রাহ্মণ আনয়ন মূল প্রয়োজনের অসামঞ্জস্য সূচিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় গুরব মিশ্রের বংশকে গণক ব্রাহ্মণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এক নূতন ব্যাখ্যায় আদিশূর পক্ষসমর্থনের জন্য অভিনব রচনা গরজের পরিচয় প্রদান করিলেন। এরূপ রচনা গরজের আতিশয্যে বাঙ্গলার ইতিহাসের লুপ্তাবশিষ্ট যথাযোগ্য আলোচনার পথ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে।"

গরুড়স্তম্ভলিপি—গৌড়লেখমালা ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৭৭ পৃঃ]

["একাদশ শতাব্দে পাল বংশের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। এ সময়ে শূররাজ-গণের প্রাচ্য ভারতে সার্বভৌমত্ব লাভের অবসর ছিল না এবং ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই এদেশে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন"—ঐতিহাসিক ৺রমাপ্রসাদ চন্দ।

"বল্লাল সেন বলিয়া কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৌলিন্য প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি না তাহার প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, আদিশূর ও বল্লাল সেন প্রভৃতির নাম শব্দকল্পদ্রুম রচিত হইবার পূর্ব্বে এদেশে প্রচলিত ছিল না।" মহানদের ইতিহাস, ৩৯ পৃঃ, শ্রীপ্রভাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।]

["রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কৌলিন্য প্রথা সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের বহু শতাব্দী পরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়।" উক্ত ইতিহাস ৪০ পৃঃ।]

["বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের মধ্যে কবিতা বিনিময় হইত বলিয়া যে সব শ্লোক আজকাল প্রচলিত আছে তাহা কল্পনাবিলাসী কবি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। সেন বংশ ও শূর বংশ সম্বন্ধে অনেক জালকথা ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। একটি সভায় ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ আধুনিক কুল-গ্রন্থকে জালগ্রন্থ বলায় সভাপতি সারদাবাবু কর্ত্তৃক সভা হইতে বিতাড়িত হন। বর্ত্তমান ইতিহাসে জাল করার প্রাচুর্য্য দেখিয়া সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন "বর্ত্তমান ইতিহাস, ঐতিহাসিক

রচনা কৌতুকের অদ্বিতীয় আধার বলিয়াই চির কলঙ্কিত হইয়া থাকিবে। ইহা ঐতিহাসিক বিচারের নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিতে পারে নাই। যাহা পরিচয় প্রদান করিতে পারিয়াছে তাহাকে ইতিহাস বলিবার উপায় নাই। তাহা ঐতিহাসিকের রচনা কৌতুক।" মহানদের ইতিহাস—৩০-৪৭ পৃঃ, শ্রীপ্রভাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।]

["আদিশূর, বল্লাল সেনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া না থাকিলে কি ব্রাহ্মণত্বে হানি হতে পারে? আদিশূর বল্লাল সেন কোথাকার কে জিজ্ঞাসা করিলে তাহা কি চিরকাল গঞ্জিকা বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে?"

"কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়াই শূর ও সেন বংশের কাল্পনিক ইতিহাস গড়িয়া ইতিহাসে এত অধিক অপকৃত কথা স্থান পাইয়াছে।" মহানদের ইতিহাস, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৪৯-৫০ পৃঃ।]

বল্লাল সেন সম্বন্ধে যে সকল মিথ্যা কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তটি হইতে সেই মিথ্যার প্রকৃতি নিরূপণ করা সহজ হইবে।

["ঢাকা জেলায় রামপাল নামক স্থানে রামপালদীঘি আছে। ঐ দীঘিটি বল্লাল সেনের নামে চালাইতে হইবে, তজ্জন্য উহার নাম রাখা হইয়াছে 'রামপাল বা বল্লাল দীঘি', এই দীঘির রামপাল নাম হইল কেন? উত্তরে কেহ কেহ বলেন, বহুদিন পর্য্যন্ত দীঘিতে জল উঠে নাই। বল্লালের ভৃত্য স্নেহাস্পদ রামপাল অশ্বারোহণপূর্ব্বক দীঘিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ফলে জল উঠিযাছিল। তজ্জন্য রামপাল দীঘি নাম হইয়াছে। বল্লাল খনন করিয়াছিলেন কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া স্বর্গত আশুতোষ গুপ্ত বলেন, "বল্লাল সেনের রাজধানী ও তাহার খনিত দীঘির নাম রামপাল হইবে কেন? আমাব মনে হয় সেন রাজাদের পূর্ব্বে পাল রাজারা পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন, পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া তাহাদের প্রাধান্য স্বীকার করিতে দ্বিধা করিয়া হিন্দুগণ বল্লালের নামে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।" বিক্রমপুরের ইতিহাস—৩৫৮ পৃঃ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত।]

সেনবংশের পরিচয়ের প্রারম্ভেই দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের সামাজিক ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত বিবরণে দেখান হইয়াছে যে "রাজা রামপাল পুত্রশোকে কাতর হইয়া বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেনকে রাজ্যদান করিয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করেন। সেই হইতে বঙ্গদেশে বৈদ্য রাজত্বের সূত্রপাত হয়।" এখানে সেই রামপালকে বল্লালসেনের স্নেহাস্পদ ভৃত্য বানাইয়া দেওয়া হইল। ইহা কাল্পনিক গল্পের সীমাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

আর উত্তরবঙ্গে ঐ যে অন্যান্য কতকগুলি বিখ্যাত রাজার নাম শুনা গেল, তাঁহাদেরই সহিত মুসলমানদিগের কিরূপ সম্পর্ক ছিল? তাঁহারা তো সকলেই গৌড়ের বাদশাহের রাজ্যের এক একটি স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। বাঙ্গলার অন্যান্য অঞ্চলে কিংবা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে দেখা যায় মুসলমান বিজয়ের পর সেখানকার প্রাচীন রাজবংশ গুলিই করদ রাজা কিংবা জমিদাররূপে গণ্য হইয়াছেন। কিন্তু বরেন্দ্র ভূমিতে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। সমগ্র বরেন্দ্রভূমির পালরাজ্য গুলি ধ্বংস হইল। সেই সকল রাজ্যের রাজারা কেহই করদরাজা কিংবা জমিদাররূপে স্বীকৃত হইতে পারিলেন না। তাহার স্থলে ঐ নূতন স্তম্ভগুলির উত্থান হওয়ার অর্থই বা কি? তাঁহাদের চক্রান্তে যে বরেন্দ্রের পালরাজ্যগুলির ধ্বংস সাধন হইয়াছে তাহাতে অবিশ্বাস করিবার অবকাশ কোথায়? স্থানীয় প্রবাদ আছে যে ঐ সকল রাজবংশগুলিকে স্ত্রী ও শিশু নির্বিশেষে নৃশংস ভাবে হত্যা করিয়া নির্বংশ করা হইয়াছে। বগুড়া জেলায় প্রাচীন জয়পুর রাজবংশ, রাজসাহী জেলায় নওগাঁ মহকুমায় সুন্দর পৈ রাজবংশ ··প্রভৃতি রাজ-বংশগুলিকে এই ভাবে নির্ব্বংশ করা হইয়াছে। এই প্রাচীন রাজ-বংশগুলির বিশেষ অনুসন্ধান অত্যাবশ্যক। পূর্ব্বে যে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের বাঙ্গলাদেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে

এবং যাহার পর্য্যায় রাজা বিজয় সেনের সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা কি এই যুগেই চরম অবস্থায় উঠিয়া ছিল? ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে সেনরাজ্যের গণ্ডির বাহিরে অন্যান্য রাজ্যে তাঁহাদের আশ্রয় লইবার স্থান ছিল এবং তাহার সংবাদও ইতিহাসে কিছু কিছু আছে। এবার তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়, অতএব তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গলা ত্যাগ করিতেই হইবে। আর এই সময় হইতেই বণিকগণের সমুদ্র-যাত্রা নিষেধের ব্যবস্থাও তদনুরূপ চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

["পাল বংশ—ইউরোপের বোর্ববংশের, আর আসিয়ায় তৈমুরবংশের ন্যায় নানা দেশের রাজা ছিলেন। গৌড়ে পাল রাজা, রঙ্গপুরে পাল রাজা মৎস্যদেশে পাল রাজা, কামরূপে পাল রাজা, বোধ হয় এই বংশ অতিশয় প্রতাপশালী ছিল।" বাঙ্গলার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।]

ইহা ছাড়া তাঁহাদের শাখা পূর্ব্ববঙ্গে এবং আত্মীয় রাজবংশগুলি দক্ষিণ বঙ্গে এবং মেঘ্‌নাপারে দেববংশ প্রভৃতির রাজ্য ছিল; তাহা এই ইতিহাসেই উল্লেখ আছে।

সেনবংশের নামে যে ধর্ম্মসংস্কারের ধুয়া ইতিহাসে তোলা হয়, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা—যাঁহারা আত্মরক্ষার্থেই সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাঁহাদের দ্বারা ধর্ম্মসংস্কাররূপ কার্য্য করা কতটা সম্ভব হইতে পারে? পক্ষান্তরে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আশ্রয় লইয়াছেন। বিরাট পাল-শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপ শূরবংশ ও সেনবংশ কনোজরাজার আশ্রয় লইয়াছেন। আর তৎকালীন কনোজরাজও পালরাজগণের শত্রু।

সেনরাজবংশের জাতিপরিচয়—সকলেই জানেন যে সেনরাজগণ বৈদ্যজাতীয় ছিলেন। সেনরাজবংশের শেষ আশ্রয়স্থল বিক্রমপুর

সোনারগাঁ, রামপাল প্রভৃতি স্থানগুলিতে এখনও বৈদ্যজাতির প্রাধান্য ও সংখ্যা-গরিষ্ঠতা দেখা যায়; সুতরাং সে দিক্ দিয়াও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে সেনরাজগণ বৈদ্যজাতীয় ছিলেন। কোন কোন ইতিহাসে সেনরাজগণকে ক্ষত্রিয় বলার বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তির উল্লেখ আছে।

["কোনও শ্রেণীর হিন্দুরাজা স্বশ্রেণীর লোক ব্যতীত থাকতে পারে না। সুতরাং সেনরাজারা যদি ক্ষত্রিয় হইতেন তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব তাঁহাদের রাজধানীর চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান থাকিত। কিন্তু সেরূপ দেখা যায় না।"—সামাজিক ইতিহাস, দুর্গাচন্দ্র সান্যাল, ১৬ পৃঃ।]

উক্ত ঐতিহাসিক মহাশয় সেনবংশের জাতি নির্ণয়কালে যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা যদি তাঁহারই ইতিহাসে উল্লিখিত বাঙ্গলার অন্যান্য রাজবংশগুলির সম্বন্ধে ঐ যুক্তি উল্লেখ করিয়া তাহাদের জাতি নির্ণয় করিতেন তাহা হইলে তাঁহার ইতিহাস অনেকটা সম্পূর্ণ হইত। ঐ যে পালবংশীয়গণ চারিশত বৎসর দোর্দণ্ডপ্রতাপে বাঙ্গলার বুকে রাজত্ব করিলেন তাঁহাদের কি ঐরূপ জ্ঞাতি কুটুম্ব কিংবা স্বজাতি কেহই ছিলেন না, যাঁহাদিগের দ্বারা তাঁহাদের জাতি নির্ণয় করা সম্ভব হইত ?

["পালবংশের সতেরজন নৃপতি প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া একই রাজ্যে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর নাই।—বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্ম, ৭০ পৃঃ।"]

সেনরাজ্যের পার্শ্বে, পালরাজবংশের যে শাখাগুলি শেষ হিন্দু রাজত্বকাল পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল, তাঁহাদের রাজধানীর চতুর্দ্দিকে অর্থাৎ দিনাজপুর, রঙ্গপুর এবং শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, (পাটিকারা) মেহেরকুল তমলুক, ময়নাগড়, সিংহলপাটন, লাটদ্বীপ ও কঙ্কদ্বীপ প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্যগুলির রাজধানীর চতুর্দ্দিকে ঐ যুক্তি দ্বারা সেই সকল প্রাচীন রাজবংশগুলির বংশধরগণের জাতিনির্ণয় করা কি সম্ভব হইত না ? বড়ই দুঃখের বিষয়, সে দিকে তিনিও সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে যে সকল রাজ্য ও রাজবংশগুলির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে

সেগুলি বাঙ্গলার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। সেগুলি ছাড়া বাঙ্গলায় বহু সামন্ত রাজবংশ ছিল এবং তন্মধ্যে এখনও কতকগুলি বিদ্যমান, যাহাদের কীর্ত্তিকাহিনী বাঙ্গলার ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করিয়াছিল, তাহাদের সংবাদ অনেকেই রাখেন না। সে গুলির অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

মেদিনীপুর জেলায় অনেকগুলি সামন্ত রাজবংশ বিদ্যমান ছিল এবং এখনও কতকগুলি আছে। মেদিনীপুর বাঙ্গলার রাজপুতনা। উক্ত রাজবংশগুলির বিস্তারিত ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিলে রাজপুত-কাহিনীর মত একটি বৃহৎ ইতিহাস রচিত হইতে পারে। "ভ্রান্তি বিজয়" হইতে সঙ্কলিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইতেছে। ভ্রান্তি বিজয় ২য় সংস্করণ, ৩৩৭।৩৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

["**ময়নাগড় রাজ্য**—তমলুক হইতে কয়েকমাইল পশ্চিমে এই রাজ্যটি অবস্থিত। ইহা একটি সামন্ত রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কর্ণসেন। প্রথমে ইহার রাজধানীর নাম ছিল কর্ণগড়, পরে ইহার নাম হয় ময়নাগড়।—

গৌড়েশ্বর দেবপালের রাজত্বকালে, কর্ণসেন তাঁহার অধীনে সেনভুম ও গোপভূম অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ প্রবল হইয়া কর্ণসেনকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হন। রাণী শোকে আত্মহত্যা করেন। কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের আশ্রয় লন। গৌড়েশ্বর নিজ শালিকা রঞ্জাবতীর সহিত তাহার বিবাহ দেন এবং দক্ষিণ বঙ্গে তাহার রাজ্য স্থাপন করিয়া দেন।"]

রাণী রঞ্জাবতীর গর্ভে, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের বীর নায়ক, লাউসেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৌড়েশ্বরের সেনাপতিরূপে ইছাই ঘোষকে পরাজিত ও নিহত করেন। তাঁহার রাজ্য পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। লাউসেন কলিঙ্গ ও কামরূপ রাজ্য জয় করেন এবং অসিহস্তে লোহার গণ্ডার ছেদন করিয়া, শিমুলারাজ হরিপালের কন্যা কানাড়া কুমারীকে বিবাহ করেন। এই শিমুলারাজ্যটি বর্ত্তমান ঢাকা জেলায়

অবস্থিত ছিল। ইহা পূর্ব্বে সাভাররাজের একটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য ছিল। পরবর্ত্তীকালে গৌড়েশ্বরের সামন্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" কাব্যে বীরাঙ্গনা কানাড়ার শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী তৎকালীন বঙ্গনারীগণের এক মহিমময় চিত্র স্মরণ করাইয়া দেয়। উক্ত কাব্যখানি প্রত্যেক বাঙ্গালীরই পাঠ করা উচিত।

৺বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার হুগলী হাওড়ার ইতিহাসের প্রথমভাগে ১৭০ পৃঃ, হুগলী জেলার বিখ্যাত হরিপাল গ্রামকে, উক্ত হরিপাল রাজার রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাহার কারণ প্রথমতঃ, হরিপাল গ্রামে এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে ওরূপ কিংবদন্তীযুক্ত স্থান আদৌ বিদ্যমান নাই। দ্বিতীয়তঃ, যে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য অবলম্বন করিয়া বিধুভূষণ বাবু হরিপাল গ্রামকে রাজধানী নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, সেই ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যখানিই ঢাকা জেলার শিমুলা গ্রামকেই হরিপাল রাজার রাজধানী বলিয়া স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতেছে। গৌড়পতি যখন কানাড়া কুমারীর শৌর্য্যবীর্য্যের ও রূপলাবণ্যের কাহিনী শুনিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে শিমুলা যাত্রা করিতেছিলেন, তখন সেই যাত্রার তিপথই উক্ত স্থানকে নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

["পেরুল গৌড়ের গড় বেগবন্ত গতি।
ডানি বামে কত গ্রাম কহি মহামতি।
বামেতে রাখিয়া চলে ভৈরবের ধার।
বিষম সঙ্কট হলো বুড়িগঙ্গা পার॥
দিবস রজনী চলে নাহি রহে স্থির।
শিমুলা সমীপে গেলা বিমলার তীর॥
পার হোল বিমলা নদী ভূপতির ঠাঠ।
তৈনাত হইল সেনা বারক্রোশ বাট॥"

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্য—১৭০ পৃঃ ৺ঘনরাম চক্রবর্ত্তী]

["পাল রাজশক্তির দুর্ব্বলতার সঙ্গে সঙ্গে ময়নাগড়ের শক্তিও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই দুর্ব্বলতার সুযোগে শ্রীধর হুই নামক এক বীর ময়না দুর্গ অধিকার করেন। সবঙ্গরাজ গোবর্দ্ধন উৎকলরাজের সাহায্যে শ্রীধর হুইকে পরাজিত করিয়া ময়না দুর্গ অধিকার করেন। রাজা গোবর্দ্ধন লাউসেনের পুরাতন-গড়ের সংস্কার করিয়া দুর্গটিকে সুদৃঢ় করেন। পরপর দুইটি পরিখা দ্বারা পার্ব্বত্য বাঁশের দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা গড়টিকে সুরক্ষিত করেন। গড় সংস্কৃত হইলে রাজা গোবর্দ্ধন তাঁহার পূর্ব্বের বালিসীতা গড় ত্যাগ করিয়া ময়নাগড়ে অবস্থান করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট রণবিদ্ ছিলেন। তিনি আর ই গড় নির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম তিলদাচক। এখনও উ ক্ত গড় জীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়া দর্শকগণের বিস্ময় সৃষ্টি করিতেছে। রা জা গোবর্দ্ধনা-নন্দের বংশধরগণ এখনও হতশ্রী অবস্থায় ময়নাগড় দুর্গে অবস্থান করিতেছেন।

হিজলি সুজামুঠা রাজ্য—বাঙ্গলার পাঠান রাজত্বকালে ইহা দক্ষিণ বঙ্গের একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। গৌড়ের সেকেন্দার শাহ দক্ষিণবঙ্গ জয় করিবার উদ্দেশ্যে একলক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে হিজলী রাজ্য আক্রমণ করেন। হিজলিরাজ হরিদাস তমলুক, ময়নাগড়, তুর্কা; ও উৎকলের গজপতি রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া সেকান্দার শাহের এই বিরাট বাহিনীর সম্মুখীন হন। রসুলপুরের প্রান্তরে তিন দিন ধরিয়া ভীষণ যুদ্ধ হয়। অবশেষে সেকেন্দার শাহ পরাজিত হইয়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ বিপুল অর্থ ও বহুসংখ্যক কামান হিজলীপতি হরিদাসের চরণে উপঢৌকন দিয়া প্রাণভিক্ষা করিয়া পলায়ন করেন। এই যুদ্ধে অশীতিসহস্র পাঠান ও চল্লিশসহস্র মাহিষ্য বীর নিহত হন। ইহা বাঙ্গলার হল্‌দিঘাট নামে বিখ্যাত। রাজা হরিদাস ১৩৫৯—১৩৯২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বড়ই দুঃখে বিষয়, সাধারণ বাঙ্গলার ইতিহাসে এই যুদ্ধের উল্লেখ দেখা যায় না।

হরিদাসের অধস্তন রাজা গোবর্দ্ধনের সময় ঈশাখাঁ মছলন্দী শঠতাপূর্ব্বক হিজলি রাজ্য অধিকার করিয়া লন। ঈশাখাঁ তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক ছিলেন। তিনি রাজা গোবর্দ্ধনের রণকৌশলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে রণঝম্প উপাধি দান করেন এবং সুজামুঠার কাজলাগড়ে গোবর্দ্ধনকে রাজা স্বীকার করিয়া রাজ্যের

কিয়দংশ নিজে গ্রহণ করিয়া, তথায় তাঁহাকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া সুন্দরবনের ভাটিরাজ্য শাসন করিতে থাকেন। এই বংশ ক্রমশঃ ধনসম্পত্তি হারাইয়া দীনভাবে জীবন যাপন করিতেছিলেন। অবশেষে রাজা গোলকেন্দ্র নারায়ণ অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া বর্দ্ধমানের মহারাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুরের নিকট রাজ্য আবদ্ধ রাখিয়া আর উদ্ধার করিতে পারেন নাই। সুজামুঠার কাজলাগড় এখন বর্দ্ধমানরাজের সম্পত্তি।

কুতুবপুর রাজ্য—এখানকার রাজবংশ এখনও বিদ্যমান। পূর্ব্বে ইহারা তমলুকরাজের সামন্তরাজা ছিলেন। আইন-ই-আকবরিতে লেখা আছে যে, আকবরের সময়ে এই রাজ্যে একটি প্রস্তরময় দুর্গ ছিল এবং এই রাজ্যের রাজগণ পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে অত্যন্ত ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। ইঁহারা উক্ত শতাব্দীদ্বয়ে বিহার প্রদেশের গয়া জেলা পর্য্যন্ত শাসন করিয়া-ছিলেন। বিহারে নালন্দা গ্রামে ইঁহাদের বিহার প্রদেশের রাজধানী ছিল। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। এই বংশের রাজাদের উপাধি সিংহ চৌধুরী। মহামহোপাধ্যায় গোয়ীচন্দ্র ও তৎপুত্র বংশীবাদন এই বংশের পুরোহিত ও সভাচার্য্য ছিলেন। বংশীবাদনের প্রপৌত্র সুকদেব তর্কভূষণ ১১৬৮ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে রাজা গোবর্দ্ধন সিংহ চৌধুরীর নিকট ব্রহ্মোত্তর ও সনদ প্রাপ্ত হন।

তুর্কারাজ্য—তুর্কারাজ্যের অধিপতিগণ গজেন্দ্র মহাপাত্র উপাধিধারী। ইহাদের জ্ঞাতিগণ পুরীর সন্নিধানে বর্ত্তমান এবং উপবীতধারী বীরজাতি বলিয়া পরিগণিত। তুর্কারাজ গজেন্দ্রবংশ এবং পুরীর রাজবংশ—দেবরাজ গজপতি বংশ, একই বংশসম্ভূত। গজেন্দ্র ও গজপতি একই বংশ। পুরীর রাজা অনঙ্গভীমদেবকে ঐতিহাসিকগণ মাহিষ্য বলিয়াছেন। তুর্কারাজ-বংশের সংস্থাপয়িতা রাজা কৃষ্ণদাস, উৎকলাধিপতি দেবরাজের সেনাপতি ছিলেন। এই বংশ এখনও খণ্ডরুই গড়ে দীনভাবে বাস করিতেছেন।

মহীষাদল রাজ্য—ময়নাগড় রাজবংশের এক সেনাপতি এই মহিষাদল রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশের রাজা কল্যাণ রায় ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। রায়খালী নদী নামক খাল তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। এই

সময় বর্ত্তমান কনোজীয় ব্রাহ্মণ রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ জনার্দ্দন উপাধ্যায় গেঁয়োখালির পারঘাটে ব্যবসাবাণিজ্যের দ্বারা ধনাঢ্য হইয়াছিলেন। কল্যাণ রায়ের পৌত্র উদয়চন্দ্র উচ্ছৃঙ্খল হইয়া রাজকোষ শূন্য করিয়া ফেলেন এবং জনার্দ্দন উপাধ্যায়ের প্রপৌত্র রাজারাম উপাধ্যায়ের নিকট ঋণগ্রস্থ হইয়া রাজ্য ও সম্পত্তি অর্পণ করেন।"]

["**পুরার রাজবংশ**—১১১৩ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যায় গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের রাজ্য আরম্ভ হয়। ইহারা গঙ্গারাঢ়ী অর্থাৎ তমলুক, মেদিনীপুর হইতে গিয়া উড়িষ্যা জয় করেন। গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গভীমদেবের সময়ে জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মিত হয়।" বাঙ্গলার ইতিহাস ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় M. A. ৩০ পৃঃ]

সিংহলের মহাবংশে উল্লেখ আছে বিজয়সিংহ গঙ্গারাঢ়ী বংশীয় বঙ্গাধিপের দৌহিত্রপুত্র। তিনি তমলুক হইতে সমুদ্রযাত্রা করিয়া সিংহলে উপনীত হন। পৃথিবীর সকল বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণই জানেন যে তমলুক রাজবংশই গঙ্গারাঢ়ী রাজবংশ।

["তাম্রলিপ্ত হইতে গিয়া গজপতিবংশ উৎকল জয় করেন।"

উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ১৭ পৃঃ, ৺সারদাচরণ মিত্র]

["প্রাচীন তাম্রলিপ্ত আধুনিক তমলুক গঙ্গাবংশীয়দিগের আদিস্থান।"

পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৫ পৃঃ, দুর্গাদাস লাহিড়ী]

["যিনি তমলুক হইতে উৎকলে প্রথম উপস্থিত হন তাঁহার নাম অনন্ত বর্ম্মা। তিনি গঙ্গাবংশীয় অর্থাৎ গঙ্গা সন্নিহিত তমলুক ও মেদ্নীপুর প্রদেশের অধিপতি ছিলেন।"

H. H. Wilsons' Introduction to Mackenzee Collection. P. P. C. XXXVIII—CXXXIX."

"শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি ও "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"-প্রণেতা বরেন্দ্র শ্রেষ্ঠ ৺মহিমচন্দ্র মজুমদার স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালী মাহিষ্য জাতি শত্রাক্রান্ত হইয়া অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, ও ছত্রপতি—এই চারিশাখায়

বিভক্ত হন। গজপতিগণ উড়িষ্যায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তুর্কারাজ গজেন্দ্র মহাপাত্রবংশ এবং উৎকলসম্রাট্ গজপতিবংশ একই বংশলতার বিভিন্ন বল্লরী।"

"বিদ্যানিধি মহাশয় আরও বলিয়াছেন—মাহিষ্যবংশীয় রাজা অনঙ্গ-ভীমদেব ৺জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন ১১১৯ শকে। ৺জগন্নাথদেবের বর্ত্তমান সেবাকারী খুর্দ্দরাজ গজপতিবংশীয় মাহিষ্য।"

ভ্রান্তিবিজয় ৩১৬।১৭ পৃঃ, ৺হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।]

["লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় বঙ্গদেশীয় প্রাচীন জাতিসমূহের যে সকল সামাজিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা বাঙ্গলা পুস্তকে দুর্লভ। বাঙ্গালী লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া এরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করে নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বিবিধ প্রসঙ্গ, ১৭২।৩ পৃঃ।]

["ভুবনেশ্বর মন্দির নির্ম্মাতা, ভুবনেশ্বরের রাজবংশের আদিপুরুষও মেদিনীপুরের গজপতিবংশসম্ভূত ছিলেন।" জাতির কথা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাড়ুই—১৯ পৃঃ]

লাট ও কঙ্কদ্বীপ রাজ্য—বর্ত্তমান ইতিহাসে এই রাজ্য দুইটির কিছুই উল্লেখ দেখা যায় না। ইহাদের সম্বন্ধে যে সকল ক্ষীণ কিংবদন্তী আছে, সেগুলি অবলম্বন করিয়া উপযুক্তভাবে অনুসন্ধান করিতে পারিলে, বহু মূল্যবান্ ইতিহাস সংগ্রহ হইতে পারে। 'ভ্রান্তি-বিজয়' পুস্তকে এই রাজ্য দুইটি সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে তাহা উল্লেখ করা হইল।

[বরেন্দ্র কুলতিলক ৺যাদবচন্দ্র লাহিড়ী, বি. এল. মহোদয় তাঁহার কুল-কালিমা গ্রন্থের ৩৬ পৃঃ লিখিয়াছেন যে "বঙ্গদেশে গৌড় ও সুবর্ণগ্রাম, এই দুইটি স্থানে সুপ্রসিদ্ধ দুইটি রাজধানী ছিল। তথাপি তখন বঙ্গদেশে ছোট-বড় কয়েকটি রাজ্য ছিল। তাঁহাদের মধ্যে মাহিষ্য জাতীয় লাট ও কঙ্কদ্বীপের রাজারা সেন রাজত্বকালে অনেকাংশে হীনপ্রভ হইলেও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন না। বল্লালের দুরভিসন্ধি আংশিক বুঝিতে পারিয়া সাবর্ণি গোত্রজ

পরাশর ব্রাহ্মণগণ বল্লালের আশ্রয় পরিহারপূর্ব্বক ঐ তুই স্থানের রাজাদের আশ্রয় লন। ঐ তুই স্থানের রাজারা সাদরে তাঁহাদিগকে আশ্রয়দান করেন। বল্লাল লাট ও কঙ্কদ্বীপের রাজাদিগকে, তাঁহাদের শরণাগত ব্রাহ্মণদিগকে তাড়াইয়া দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা না করায়, তাহাদের প্রতি বল্লাল বিরক্ত হন এবং তাহাদিগকে যথোচিত শাস্তি দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রকাশ্য শা।স্তবিধানে অসমর্থ হইয়া কৌশলে উদ্দশ্য সিদ্ধ করেন। সাধারণ মাহিষ্যগণ কৃষিজীবী। কৃষিকার্য্যের দ্বারা বহু প্রাণী হত্যা হয়। সুতরাং তৎকালীন বৌদ্ধ যুগে তাঁহাদিগকে প্রাণীহত্যাকারী ইত্যাদি বলিয়া সমাজে পতিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন।"

ভ্রান্তিবিজয়—১৭৪।৫ পৃঃ ৺হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

নদীয়া, যশোহর ও ফরিদপুর জেলার উত্তরাংশ লইয়া উক্ত রাজ্যদ্বয় অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে লাটদ্বীপকে লাটুদহ এবং কঙ্কদ্বীপকে কাঁকটি পরগণা বলে। বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসস্তূপের চতুর্দ্দিকে যেমন মাহিষ্যগণের অবস্থা অন্যান্য স্থানের মাহিষ্যগণের অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর উন্নত, এই লাট ও কঙ্কদ্বীপের সীমার মধ্যে মাহিষ্যগণের অবস্থাও তদনুরূপ উন্নত।

নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের পশ্চিমে সুবর্ণবিহারের যে ধ্বংসস্তূপ বিদ্যমান আছে, তাহা এই লাটদ্বীপের রাজাদিগের দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছিল, মনে হয়।

["বহরমপুর জেলা ও নদীয়া জেলার অনেকাংশ লইয়া যে রাজ্য ছিল তাহার নাম হুয়েনসাংএর লেখায় পাওয়া যায় "কুই চি হো খিলা।" এই এই শব্দটি দেশীয় ভাষায় অনুরূপ কিরূপ হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই। এদেশের তীর হইতে পদ্মা পার হইয়া হুয়েন-সাং পুণ্ড্রবর্দ্ধনে গিয়াছিলেন।" ভারতবর্ষের ইতিহাস, ৪৪ পৃঃ, শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি. এল.]

হুয়েনসাং এর বর্ণিত রাজ্যটি, মনে হয়, উক্ত কঙ্কদ্বীপ রাজ্য।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে যে সকল ভারতীয় ভিক্ষু চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন তন্মধ্যে ধর্ম্মগুপ্ত ছিলেন অন্যতম। তিনি লাটদেশের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র বাকৃচি মহাশয় তাঁহার "ভারত ও চীন" নামক পুস্তকে ১৭ পৃঃ এই ধর্ম্মগুপ্তের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি লাট দেশকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থিত বলিয়াছেন। মনে হয় বাকৃচি মহাশয় নদীয়া জেলাস্থ লাটদেশের বিষয় অবগত না থাকায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ধর্ম্মপাল দেব "ভগবন্নন্ন-নারায়ণদেবের পূজোপাসনাদি কর্ম্মের জন্য এক লাটদেশীয় ব্রাহ্মণকে ৪ খানি গ্রাম দান করিয়া ছিলেন" বলিয়া তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে। গৌড়লেখমালায় "এই লাটদেশ বর্ত্তমান গুজরাট নামে পরিচিত" বলিয়া বিবৃত আছে। গৌড়লেখমালা ২৬ পৃঃ ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ; দ্রষ্টব্য।

উক্ত লাটদেশ নদীয়া জেলাস্থ লাটদেশ হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কারণ ধর্ম্মপালদেব গুজরাটের ব্রহ্মণকে গ্রাম দান করিবেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? গুজরাট কি পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

বৈদিকযুগ হইতে উত্তরবঙ্গ (পুণ্ড্র) পূর্ব্ববঙ্গ (সমতট), পশ্চিমবঙ্গ (সুহ্ম) এই তিনটি বিভাগের যেরূপ বিস্তৃত ইতিহাস পাওয়া যায়, সেই অনুপাতে প্রেসিডেন্সি বিভাগের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মত, এই অঞ্চলটি গঙ্গার ব-দ্বীপ হিসাবে বহু পরবর্ত্তী যুগের সৃষ্টি। যে যুগে উপরোক্ত তিনটি অঞ্চলের উল্লেখ আছে সেই যুগে এই অঞ্চলটির নিম্ন কতকাংশ সৃষ্ট হয় নাই, ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। উপরের অংশের পশ্চিমভাগ পুণ্ড্র রাজ্যের এবং পূর্ব্ব-ভাগ বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

তাহা ছাড়া, এখন পদ্মা নদীটি যেরূপ প্রবল আকারে প্রবাহিত হইয়া, এই অঞ্চলটিকে বরেন্দ্র হইতে যে-ভাবে পৃথক্ করিয়া দিতেছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। প্রায় একহাজার বৎসর পূর্ব্বে, পদ্মা একটি ক্ষীণ শাখানদী ছিল। ব্রহ্মপুত্র নদও বর্ত্তমানের ন্যায়, যমুনার খাত দিয়া প্রবাহিত ছিল না।

পালযুগে লাট ও কঙ্কদ্বীপ পালসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। পরবর্ত্তী পালসাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত হইলে, এই অঞ্চলটি তাঁহাদেরই শাখাবংশের কিংবা সামন্ত-বংশের অধীন হয়, মনে হয়। কারণ লাট ও কঙ্কদ্বীপের যে ইতিহাস "ভ্রান্তিবিজয়" পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে, তাহা হইতে এই ধারণা অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। লাট ও কঙ্কদ্বীপের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য ছিল। সেগুলিরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ একটি ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে বিবৃত করা হইল।

["যশোহরের উত্তরে ও পশ্চিমে কয়েকস্থানে কৈবর্ত্তগণ রাজত্ব করিতেন ; লোকে বলে, যাদব রায় নামে এক কৈবর্ত্ত রাজা যাদবপুর স্থাপন করেন।

সূর্য্যদ্বীপ—পূর্ব্বে এই দ্বীপটির নাম ছিল যোগীন্দ্র দ্বীপ। বল্লাল সেন এক অদ্ভুত কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ (লক্ষ্মণসেনকে নির্ব্বাসিতস্থান হইতে নৌকা-যোগে ত্বরিতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য) সূর্য্য নামক এক ধীবরকে ঐ ভূভাগের এক অংশ দান করায় ঐ অংশের নাম হয় সূর্য্যদ্বীপ। এখন সমগ্র দ্বীপটির নাম হইয়াছে সূর্য্যদ্বীপ। উহা তিন অংশে বিভক্ত—লাট, কঙ্ক ও যোগীন্দ্রদ্বীপ। সূর্য্যদ্বীপ জালিক সূর্য্যের পুরস্কার। মহেশপুর সূর্য্য মাঝির রাজধানী ছিল, কেহ কেহ সূর্য্য মাঝিকে মহেশ মাঝিও বলে।" (ঘুলো পঞ্চাননের কারিকা, যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১৩৬।৭ ও ১৯৩।৪ পৃ;)

"বল্লাল সেন সুবর্ণবণিক্ ও যোগী জাতির উপর যেমন অত্যাচার করিয়া-ছিলেন, তেমন কৈবর্ত্তগণের উপর সদয় হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, কৈবর্ত্তগণ পূর্ব্বকালে ধীবর ছিল। সূর্য্য মাঝি নামক এক ধীবর লক্ষ্মণ সেনকে

(নির্ব্বাসন স্থান হইতে) ফিরাইয়া আনিয়া বল্লালের তুষ্টিসাধন করেন। বল্লালসেন সূর্য্য মাঝিকে সূর্য্যদ্বীপ পুরস্কার দেন এবং তাহাদের জলচল করিয়া দেন। তদবধি তাহারা দুইভাগে বিভক্ত। দাস ও নাবিক। দাস ও হেলে কৈবর্ত্তগণের জল ব্যবহার্য্য কিন্তু জেলে কৈবর্ত্তগণের জল অস্পৃশ্য।"

যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২৫২ পৃঃ ৺সতীশচন্দ্র মিত্র]

উপরোক্ত ইতিহাসখানির উদ্ধৃত মন্তব্যগুলি সংক্ষিপ্তভাবে সমালোচনা করিয়া দেখাইতেছি যে, কি ভাবে ঐগুলি ঐতিহাসিক যুক্তিসম্মত হইতে পারে! বাঙ্গলাদেশে সুসভ্য সমতল ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাজবংশটিই চাষী-কৈবর্ত্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। যোগীন্দ্র দ্বীপটিও তদনুরূপ চাষী-কৈবর্ত্ত রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত, ইহাই অনুমান করা স্বাভাবিক। যে-হেতু কৈবর্ত্ত রাজবংশের উল্লেখ হইতেছে। এখন যদি ব্যতিক্রম হিসাবে ধরা হয় উহা ধীবর (জেলে কৈবর্ত্ত) রাজ্যই ছিল, সেখানে প্রমাণ করিবার কি উপাদান আছে, যেহেতু তাহার বংশধরের উল্লেখ নাই? কিন্তু যখন বলা হইতেছে যে, বল্লাল সূর্য্য মাঝির পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে জল আচরণীয় করিয়াছিলেন, সেইখানেই প্রমাণ হইতেছে যে সূর্য্য-দ্বীপটি চাষী-কৈবর্ত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাঝি কথাটা এবং লক্ষণসেনকে নৌকাযোগে আনার কথা, মাহিষ্য-বিদ্বেষী দুরভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তিগণের মনগড়া কথা। আর, ঐ মনগড়া কথার যুক্তিটিও কিরূপ অর্ব্বাচীনের যুক্তি তাহাও বিচার্য্য। যেখানে বলা হইয়াছে যে সূর্য্য মাঝির পুরস্কার স্বরূপ বল্লাল তাহাদিগকে (ধীবরগণকে) জল আচরণীয় করিয়া দেন, সেখানে জিজ্ঞাস্য, সেই সময় হইতে জালিকগণ কি জল আচরণীয় হইতেছে? ঐরূপ অর্ব্বাচীন কাল্পনিক যুক্তিগুলি যদি দেশের শ্রেষ্ঠ ইতিহাসে স্থান পায় তাহা হইলে দেশের ইতেহাসের অবস্থাও তদনুরূপ হইবে অর্থাৎ কাল্পনিক গল্পপুস্তক বলিয়া সাব্যস্ত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কি আছে? এত যুক্তির

অবতারণা করার প্রয়োজনই বা কি ? একজন নগণ্য পাটনীকে তাহার বৃত্তিগত নগণ্য একটি কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ একটি বিস্তীর্ণ ভূভাগের রাজা বানাইয়া দেওয়া যুক্তিটিই তো কাল্পনিক গল্পের চরম রূপ !

যোগীন্দ্রদ্বীপটি বল্লালের অধিকারভুক্ত ছিল, একথা ভৌগোলিক জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণকে বুঝান চলে মাত্র। কারণ, যোগীন্দ্রদ্বীপের পুরোভাগে অর্থাৎ গৌড় ও যোগীন্দ্রদ্বীপের মধ্যভাগে লাট ও কঙ্কদ্বীপ রাজ্য বিদ্যমান ছিল। উক্ত রাজ্যের রাজাদিগের সহিত বল্লালের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথাও প্রথমে বলা হইয়াছে। সুতরাং যোগীন্দ্রদ্বীপে বল্লালের অধিকার কিরূপে সম্ভব হইবে ?

যেহেতু বাঙ্গলাদেশে অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ দ্বারা তথ্যগুলিকে বিপরীত ভাবে প্রচার করিতে দেখা যাইতেছে, সেইহেতু বল্লালসেন চাষীকৈবর্ত্তগণকে জল আচরণীয় করিয়াছেন, ইহার বিপরীত কি অর্থ হইতে পারে, তাহা বিচার করিতে হইবে। কারণ, বিপরীতের বিপরীত যাহা, তাহাই হইবে আসল তথ্য। বিপরীতের বিপরীত হইবে, বল্লালসেন জল আচরণীয় হইয়াছিলেন চাষীকৈবর্ত্তগণের দ্বারা। আর ঐতিহাসিক যুক্তিপরম্পরায় তাহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। তবে তাহা আরও একপুরুষ পূর্ব্বে। অর্থাৎ চাষী-কৈবর্ত্তগণ বল্লালসেনের পিতা বিজয় সেনকে জল আচরণীয় করিয়াছিলেন। কারণ, ইতিহাসে দেখা যায়, বিজয় সেন সুদূর কর্ণাট প্রদেশ হইতে আসিয়া, গৌড়ের পাল রাজাদিগের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেণ। সেনরাজগণ বৈদ্যজাতীয় ছিলেন, তাহারও উল্লেখ অধিকাংশ ইতিহাসে আছে। আর, বৈদ্যজাতি সঙ্কর শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত, তাহাও বহু সংহিতায় উল্লেখ আছে। সুতরাং তৎকালে ঐরূপ দূরাগত একজন শূদ্রকে, জল আচরণীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে, স্থানীয় একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সমর্থন একান্ত প্রয়োজন। এখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বিজয় সেন জল আচরণীয়

হইয়াছিলেন পালরাজাদিগের দ্বারা। আর পালরাজারা যে চাষীকৈবর্ত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহার প্রমাণ প্রাচীন সাহুর রাজবংশের বংশধরগণ। আর মনে হয়, পূর্ব্বে এইরূপ একটা কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল, এখন সেটিকে উল্টাইয়া দিবার জন্য উল্টা প্রচার করা হইতেছে।

এখানে উল্লেখ করাও প্রয়োজন যে, বল্লাল চাষী-কৈবর্ত্তগণকে জল আচরণীয় করিয়াছেন এবং সূর্যদ্বীপ ধীবর রাজ্য ছিল ইত্যাদি মিথ্যা-প্রচারগুলি উক্ত ঐতিহাসিকের নিজস্ব মত নহে। ঐগুলি তৎকালীন বাঙ্গালার ইতিহাসের বামপন্থীগণের চর্ব্বিত চর্ব্বণ। কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য এবং বাঙ্গলার আসল ক্ষত্রিয়গণকে ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে উৎসাদিত করিবার জন্য, যে সব মিথ্যার সৃষ্টি হইয়াছিল, এইগুলি সেই সব মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত।

সমগ্র বাঙ্গলা দেশের প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজবংশগুলির বংশধরগণ বর্ত্তমানে চাষী-কৈবর্ত্ত নামে পরিচিত, তাহাও বহু ঐতিহাসিক অবগত আছেন। কিন্তু সোজা কথায় তাহাদিগকে চাষীকৈবর্ত্ত বলিয়া স্বীকার করিলে (এমন কি, তাহাদের নবাবিষ্কৃত, রুচি সম্পন্ন ধীবর অর্থ করিয়াও) বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস উদ্ধার সহজ ও সরল হইয়া পড়িবে। সে পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করিবার জন্য তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণকে কোথাও ধীবর, কোথাও শবর, কোথাও বৌদ্ধ, কোথাও ব্রাহ্মণ, কোথাও ক্ষত্রিয়, কোথাও অজ্ঞাত বলিয়া, তাঁহারা দেশবাসীগণকে বিভ্রান্ত করিয়া আসিতেছেন। সেই জন্যই দেখা যায়, ছলনা করিয়া লাট দ্বীপ ও কঙ্কদ্বীপের রাজবংশের সহিত যোগীন্দ্র দ্বীপের ধীবর রাজা, পালবংশের সহিত কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ ইত্যাদি, এক একটি লেজুড় জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যেখানে কোন ছলনার অবতারণা সম্ভব হয় নাই, সেখানে বিদ্বেষের নগ্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, যেমন তমলুক ও পাটিকারা রাজবংশের স্থলে।

"বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত" ৺পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই ইতিহাস খানিতে সমগ্র বাঙ্গলার, সকল দিকের, প্রধান প্রধান জাতি ও রাজবংশ-গুলির নাম বহু শ্রমসহকারে সংগৃহীত হইয়াছে। একপক্ষে গ্রন্থখানি বাঙ্গলার ইতিহাসের একটা বড় রকমের অভাব পূরণ করিয়াছে। কিন্তু ঐ সকল জাতি ও রাজবংশগুলির জাতিতত্ত্ব বিচারে কোনরূপ সুচিন্তিত যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারে নাই। উক্ত পুস্তকের ৫৪।৬০ পৃঃ উলেখ আছে যে "আর্য্য অনার্য্য জাতি চিনিয়া লওয়ার প্রকৃষ্ট উপায় এই যে, যে সকল জাতি হিন্দুর জল আচরণীয়, তাহারা আর্য্য, যাহারা জল আচরণীয় নহে তাহারা অনার্য্য"। বাস্তবিক পক্ষে বৌদ্ধ বিপ্লবের পরবর্ত্তী যুগে আর্য অনার্য চিনিয়া লওয়ার উহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। উহা ব্যতীত অন্য পথ নাই। অথচ উক্ত পুস্তকের ৬৫।৯৫ পৃঃ, আচরণীয় সৎশূদ্র জাতিগুলিকে অর্থাৎ বৈদ্য, কায়স্থ, মাহিষ্য, সৎগোপ, গোপ, নবশাখ প্রভৃতিকে, তাহাদের বর্ত্তমান শূদ্র পরিচয়ের কারণ, শবর, পুলিন্দ জাতির বংশধর বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ, উক্ত জাতি গুলির মধ্যে, একমাত্র মাহিষ্যগণকেই আর্য্যত্ব হইতে খারিজ করিতে ব্যগ্র, কিন্তু 'পুরাবৃত্ত' লেখকের তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তিনি একটা দৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া, একটা সাধারণ সূত্র অবলম্বন করিয়াছেন, জাতি বিশেষের উপর পক্ষপাতিত্ব করেন নাই। কিন্তু তথাপি তিনি বৌদ্ধ-বিপ্লবের মুল সূত্রটি কেন গ্রহণ করিলেন না, তাহা বুঝিতে পারি নাই। তিনি উক্ত পুস্তকের ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, শবরগণ নর্ম্মদা তীরের অধিবাসী; অথচ তিনিই বাঙ্গলা দেশের সকল ব্রাহ্মনেতর উচ্চ জাতিগুলিকে শবর, পুলিন্দ জাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

'পুরাবৃত্তে' ১১৬পৃঃ উল্লেখ আছে, "বলিরাজা ও দীর্ঘতমা ঋষি প্রভৃতি গণের দ্বারা বৈদিকযুগে এবং ১১৯পৃঃ মহাভারতীয় যুগে বঙ্গদেশে আর্য্য সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে।" অথচ মহাভারতে উল্লিখিত সকল ক্ষত্রিয় রাজবংশগুলির বর্ত্তমান বংশধরগণকে, শবরবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতে উল্লিখিত, তাম্রলিপ্ত ও কমলাঙ্ক প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজবংশগুলির বংশধর গণকে, এইভাবে শবরবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 'পুরাবৃত্ত', ১২২, ১৮২, ১৮৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। মহাভারতীয় যুগে আর্য্য সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, আবার কোন্ সময়ে, কি ভাবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে উৎসাদিত হইয়া গেল, যাহার ফলে একাদশ, দ্বাদশ শতাব্দীর সকল প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজ্যগুলির রাজগণ, শবর জাতীয় বলিয়া সাব্যস্ত হইবে ? এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি যে, মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে শক, হুণগণ প্রবেশ করিতে পারেন নাই। প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজবংশগুলির অধিকাংশের বংশ আজিও বিদ্যমান।

কমলাঙ্ক রাজ্য

রাজা মাণিকচন্দ্র, রাণী ময়নামতী ও তাঁহাদের পুত্র গোপীচাঁদ—

বাঙ্গলা সাহিত্যের আদিম যুগ আরম্ভ হইয়াছে লাউসেনের ধর্ম্ম মঙ্গল কাব্য, মাণিকচন্দ্র, ময়নামতী ও গোপীচাঁদের গান প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া। প্রাচীন কমলাঙ্ক, বর্ত্তমান কুমিল্লা সহর হইতে ছয়মাইল পশ্চিমে পাটিকারা নামক স্থানে, রাজা মাণিকচন্দ্রের রাজধানী ছিল।

["তথায় (পাটিকারায়) কনকস্তূপ বিহারে থাকিয়া বিনয়শ্রীমিত্র ও কয়েকজন কাশ্মীরীয় ভিক্ষু বজ্রযাণীয় পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনীর পরিখা খননের সময় উক্ত সহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।" বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্ম—শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত ২১৩।৪ পৃঃ]

রাজা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাহার শালিকাপতি, রঙ্গপুরের রাজা দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল (১ম ধর্ম্মপালের প্রায় দুইশত বৎসর পরে) মাণিকচন্দ্রের রাণী ময়নামতীর রাজ্য আক্রমণ করেন। রাণী ময়নামতী বহু সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক, তিস্তানদী তীরে, ঘোরতর যুদ্ধে ভগিনীপতি ধর্ম্মপালকে পরাজিত করিয়া, পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

আমরা, বর্ত্তমান কালের বঙ্গবাসিগণ, রাজপুতকাহিনীতে রাজপুত বীরাঙ্গনার অসি হস্তে যুদ্ধে অবতীর্ণা হওয়ার ইতিহাস পড়িয়া মুগ্ধ হই, আর নিজদিগকে ভীরু ভেতো বাঙ্গালী বলিয়া ধিক্কার দিই! অতীত বাঙ্গলার এই সকল মূর্ত্তি আমাদের ধ্যান ধারণার অতীত।

জননীর উপদেশে গোবিন্দচন্দ্র পরমা সুন্দরী যুবতী পত্নীদ্বয় অদুনা ও পদুনাকে ত্যাগ করিয়া অষ্টাদশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হন। তাঁহাদের বিয়োগের এই করুণ কাহিনী, পূর্ব্ববঙ্গের দ্বারে দ্বারে গীত হইত। সেই গাথাগুলি মাণিকচন্দ্রের গান, ময়নামতীর গান ও গোপীচাঁদের গান ইত্যাদি নামে পরিচিত হইয়া, সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুদূর দক্ষিণ ভারতে ও সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশেও ঐ সকল গান গীত হয়।

["পূর্ব্ববঙ্গের লোকগীতিকায় গোপীচাঁদ (গোবিন্দচন্দ্র) রাজার উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে পাটিকারা সহরের উল্লেখ আছে। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কুমিল্লা সহরের ৬ মাইল পশ্চিমে ময়নামতী নামক স্থানে মিত্র পক্ষীয়

সেনাবাহিনীর পরিখা খননের ফলে বহু ইষ্টক নির্ম্মিত সৌধাদির ধ্বংসাবশেষ ও মূর্ত্তি সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে………। এই পাটিকারা বা পাটিকেরাই প্রাচীন পট্টিকেরক, যাহা রাজ্যেরও নাম, রাজধানীরও নাম। ময়নামতীতে 'আনন্দরাজার প্রাসাদ' নামে যে স্তূপটি রহিয়াছে তাহার উদ্বাস্তর মধ্যে ৬৩টি লালুক রৌপ্যমুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ঐ সকল মুদ্রায় পট্টিকেরয় নাম মুদ্রিত আছে।………। ১২২০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ পট্টিকেরক রাজা হরিকাল দেব রণবঙ্কমল্লের ময়নামতী তাম্রশাসনে দুর্গোত্তারার নামে উৎসর্গীকৃত একটি বিহারের উল্লেখ আছে।………। এস্থানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য, পূর্ব্ব-বঙ্গের চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে এই পট্টিকেরক রাজ্যের সহিত ব্রহ্ম ও আরাকানের রাজাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আরও এক কথা, 'ময়নামতীর গানে' একস্থানে 'কামলাক নগর' (কমলাঙ্ক বা কুমিল্লা) 'কনিকানগর' ও 'মেহারকুল সহর' উল্লেখ আছে। এই কনিকানগরেই কি কনকস্তূপ ছিল?"—বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্ম ২ ৪।১৫ পৃঃ, শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত]

ইতিপূর্ব্বে, এই ইতিহাসে সাভার রাজবংশের পরিচয় প্রদান কালে, সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যাদ্বয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র না থাকায়, ভাগ্নেয় দামুদর রাজা হন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও ঢাকা জেলায় ভাকুর্ত্তা রাজকোণ্ডা ও গান্ধারিয়া গড়ে বাস করিতেছেন। পাটিকারা রাজবংশের সহিত, সমতট বা সাহুর রাজবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ দেখা গেল। এই পাটিকারা রাজবংশ এখনও বিদ্যমান। বর্ত্তমান বংশধরের নাম শ্রীকৈলাসচন্দ্র চৌধুরী। তিনি পাটিকারা পরগণায় ময়নামতীর লোয়ারচর পল্লীতে বাস করিতেছেন।

["তিলকচন্দ্র" ছিলেন রাজা "মেহারকুল" পরগনায়,
"ময়নামতী" সতীকন্যা ছিল মাত্র ধরায়।

………পাটিকারায় ছিলেন রাজা মানিকচাঁদ,
একমাত্র বিদুষী কন্যা করলেন তাকে সম্প্রদান।

ঢাকা জেলায় সাভাররাজ হরিশ্চন্দ্রের দুই কন্যা,
অলোকসামান্যারূপা পূর্ব্ব হোতে ছিল জানা।
জেষ্ঠা কন্যা "অদুনাকে" করেন রাজা সম্প্রদান,
যৌতুক স্বরূপ তুল্যরূপা "পদুনাকে" করেন দান।

'অদুনা' পদুনা পত্নী নিয়ে এলো গোপীচান,
পুত্রবধূ হেরে ময়নার হলো হরষিত মন।
রাজা হরিশ্চন্দ্র পালের" না ছিল পুত্র সন্তান,
ভাগিনেয় "দামোদর" উত্তরাধিকারী হন।
ভাকুর্তা, রাজকোণ্ডা, আর গান্ধারিয়া গড়ে,
আজিও দেখ ঐ বংশ সসম্মানে বাস করে।
'মানিকচন্দ্র' 'ময়নামতী'র পুত্র রাজা গোপীচাঁদ,
তারপুত্র 'ভবচন্দ্র' তদ্বংশীয় বিজয় চাঁদ।
ভবচন্দ্র রাজার টিলা কুমিল্লার দক্ষিণে,
ইষ্টক স্তূপে পরিপূর্ণ এ অঞ্চলে সবে জানে।

বিজয় চাঁদের কীর্ত্তি দেখরে 'ধনপতি খলায়',
তাঁর বংশে লোয়ার চরের চৌধুরীগণ শোভা পায়।
পরিকোটের ভৌমিকগণের কীর্ত্তিরাজী বর্ত্তমান,
পৈতৃক ভিটায় অতি কষ্টে আজো করেন কালযাপন।"

মাহিষ্য গৌরব গাথা—শ্রীরজনীকান্ত ভৌমিক। ৯, ১১।১২, ২৫ পৃঃ]

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভৌমিক মহাশয়ের "মাহিষ্য গৌরব গাথা' কাব্যাকারে বাঙ্গলার অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ঐতিহাসিক কবি, আমাদিগকে মুষ্টি ভিক্ষা দিয়াই বিদায় করিয়াছেন। তথাপি, বঙ্কিম বাবুর ভাষায় বলিতে হইবে, উহা "সুবর্ণমুষ্ঠি"। কবির এই ইতিহাসে,

কবিসুলভ ভাবপ্রবণতা আদৌ নাই। বাঙ্গলাদেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত, সমস্ত প্রাচীন রাজবংশগুলির সত্যপরিচয় এবং এই সত্য অতি খাঁটি সত্য। উচ্চস্তরের ঐতিহাসিকগণের নিকট উহা আদরের সামগ্রী।

["ত্রিপুরারাজ্য—ব্রহ্মপুত্রনদের পূর্ব্বপার হইতে ব্রহ্মদেশের জঙ্গল পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই বংশে চন্দ্রবংশীয় রাজারা বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত ব্রহ্মপুত্রনদের পশ্চিম সীমা হইতে কাশীধাম পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে ক্ষত্রিয়কুল নষ্ট করিয়াছিলেন কিন্তু উক্ত নদের পূর্ব্বদিকে ক্ষত্ররাজ্য বিদ্যমান ছিল। ত্রিপুরার রাজা পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল কুমিল্লা।"—সামাজিক ইতিহাস, শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল ১৪০ পৃঃ,]

তমলুক রাজবংশের পরিচয় প্রদানকালে বলা হইয়াছে যে 'ইতিহাস ছেলের হাতের মোয়া নয়' যে, এত সহজে ছোঁ মারিয়া গিলিয়া ফেলিবে। সমগ্র বাঙ্গলার পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত যেখানে যত ক্ষত্রিয় রাজবংশের উল্লেখ আছে তাহার সবগুলির বংশধরগণ বর্ত্তমানে মাহিষ্য ক্ষত্রিয়। এই ত্রিপুরা রাজ্যেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। এই সব দেখিয়াও বাঙ্গালার ইতিহাসের বামপন্থীদের চক্ষু উন্মীলিত হইবে না কি ?

লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ ছাড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরে চলিয়া যান। এই ঘটনার উল্লেখে অনেকে মনে করেন সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ তখন তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ অলীক। নবদ্বীপের মতই বিক্রমপুরের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই তাঁহার রাজ্যের সীমা আবদ্ধ ছিল। মেঘনাপারে তখনও আরও তিন চারিটি শক্তিশালী রাজবংশ বিদ্যমান ছিল।

["লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ হইতে পলাইয়া গিয়া পূর্ব্ববঙ্গে যান। তথায় ১২০৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অকারণ বাঁচিয়া ছিলেন। তারপরও দেখি (তাম্রশাসনে) পাটিকারা নগরে মহারাজ রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব ১২২০ খৃঃ অব্দে দেবী দুর্গোত্তারার নামে ভূমি উৎসর্গীকৃত করিতেছেন।" বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম. শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত, ২২৮।৯ পৃঃ]

["দেববংশ—লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের শেষভাগে মেঘনার পূর্ব্বতীরে মধুমথনদেব একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ১২৩১ খৃঃ তাঁহার পৌত্র দামোদর দেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্ভবতঃ তিনি সেনরাজাদিগের রাজ্য অধিকার করিয়া থাকিবেন এবং মুসলমানদিগের নিকট হইতে গৌড়ের কিয়দংশ উদ্ধার করেন।"—বাঙ্গলার ইতিহাস, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ১০৭।৮ পৃঃ,]

মনে হয় এই ঘটনার পর হইতে পূর্ব্ববঙ্গের সেনরাজগণ দেববংশের করদ রাজা হিসাবে কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। কারণ পরে দেখা যায় সেনবংশের সেই রাজ্য মুসলমানগণ অধিকার করিলে, সেনরাজগণ দে ববংশের রাজধানীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

["কেশব সেন—১১৯৮-১২১৫ খৃঃঅঃ। কুলজীগ্রন্থে উল্লেখ আছে মুসলমানগণ গৌড় জয় করিলে, কেশব সেন বহু ব্রাহ্মণসহ পূর্ব্ববঙ্গে এক রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমাদের মনে হয় হরিবর্ম্মাদেব কেশব সেনের আশ্রয়দাতা।" বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত—৺পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩২৬ পৃঃ]

কুলজীগ্রন্থসমূহে সাল তারিখের সঠিক সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রেও মনে হয়, সময় ও স্থানের নামে একটু পার্থক্য আছে। উহা ১২১৫ খৃঃ অব্দের কিছু পরে হইবে এবং মুসলমানগণের গৌড় জয়ের পরিবর্ত্তে বিক্রমপুর জয় হইবে।

["দেববংশ খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করেন। মার্কপোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়। পুরাবৃত্ত—৺পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩৮ পৃঃ",]

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভৌমিক মহাশয়ের মাহিষ্য-গৌরব-গাথা নামক ইতিহাসখানির উদ্ধৃত বিবরণ হইতে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে যে, মেঘনাপারের ঐ রাজবংশগুলি মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং বাঙ্গলার ইতিহাসের বামপন্থীরা তাহাদিগকে কেহবা শবর, কেহবা বৌদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন আর কেহবা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

["সমতটের দক্ষিণ অংশে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শবর ও অন্যান্য বংশীয় রাজাদিগের অধীন ছিল বলিয়া প্রতীতি হয়।" বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত—৺পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪ পৃঃ,]

["খৃঃ অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে দুই তিনটি বৌদ্ধ রাজবংশ পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন—খড়্গবংশ, চন্দ্রবংশ ও কান্তিদেব"। বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্ম, শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত. ৭৭।৮০ পৃঃ]

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সেনরাজবংশের আদিপুরুষ বিজয়সেন মাহিষ্য পালরাজবংশের আশ্রয়ে থাকিয়া রাজ্যলাভ করেন। আর, শেষে দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারই বংশধরগণ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মাহিষ্য রাজবংশের (দেববংশের) নিকটই আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। অথচ বাঙ্গলার ইতিহাসের বামপন্থীরা, সেনবংশের দ্বারা মাহিষ্যগণের প্রতি কত বিপরীত ব্যবহারের অবতারণা করিয়া থাকেন।

বিভিন্ন ইতিহাস হইতে বুঝা যায় যে, পূর্ব্ববঙ্গের ঐ সকল রাজবংশের সহিত ব্রহ্ম, শ্যাম, আনাম ও কম্বোডিয়ার বাঙ্গালী ঔপনিবেশিক রাজাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁহাদের কাহারও কাহারও নামের সহিত 'শ্রী' যুক্ত, যাহা বাঙ্গালীর নিজস্ব এবং বর্ম্মণ উপাধি হইতে বুঝা যায় যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে গিয়াই এই সকল রাজারা

উক্ত স্থানগুলিতে ঔপনিবেশিক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ['ভারত ও ইন্দোচীন'—প্রবোধচন্দ্র বাকচি, ১০।১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।]

গৌড়পতি পালরাজাদিগের সহিত তাহাদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

["১০৪৪ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ কাটমো (আনামী রাজা) দ্বিতীয় জয়সিংহ বর্ম্মাকে (বাঙ্গালী রাজা) নিহত করিয়া চম্পারাজ্য লুট করেন। চম্পারাজারা অনেক দূরে থাকিলেও মাতৃভূমির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নাই। গৌড়রাজ-কন্যার সহিত জয়সিংহ বর্ম্মার বিবাহ হইয়াছিল।" "এই দেশেরই মেয়ে" শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, গৌড়েন্দ্র লক্ষ্মী, পঞ্চাশের গল্প, ৯৮ পৃঃ]

গৌড়ের সিংহাসনে তখন পালবংশীয় সম্রাট্ নয়পাল সমাসীন ছিলেন।

ভোগ বেতাল রাজ্য—মৈমনসিংহ জেলায় ইহা একটি প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজ্য। এই বংশের বহু প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান। রাজা নবরঙ্গ রায় এই বংশের বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। বর্ত্তমান বংশধর শ্রীপরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী এম. এ. বি. এল.। এই রাজবংশের বহু সামন্ত রাজা বিদ্যমান ছিলেন। তন্মধ্যে উলুকান্দি, কমলবাড়ী, তেলিচারা, ভোগপাড়া প্রভৃতি স্থানের সামন্তরাজগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

শ্রীহট্টরাজ্য—ইহাও একটি প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজ্য।

["অতি প্রাচীনকাল হইতে শ্রীহট্টে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ রাজত্ব করিতেন। এই বংশীয় অতিরথ নামক রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের সাহায্য লইয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তিনি শ্যামদেশে গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও শ্যামদেশে রাজত্ব করিতেছেন। প্রজারা অতিরথের কনিষ্ঠভ্রাতা সুরথকে রাজা করেন। তদ্বংশীয়েরা বহুদিন শ্রীহট্টে রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেষ রাজা দিগিন্দ্রদেবের কোন সন্তান না থাকায় গুরুদেব দ্বারকানাথ

গোস্বামীকে রাজ্যদান করেন। তদ্বংশীয় রাজার নিকট হইতে সুজা শ্রীহট্ট জয় করিয়া মুসলমান রাজ্যভুক্ত করেন।" সামাজিক ইতিহাস—শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল, ১৪১।২ পৃঃ]

["ভাস্কর বর্ম্মার সময় শ্রীহট্ট একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। চীন পরিব্রাজক য়ুয়ান চুয়াং, যিনি ভাস্কর বর্ম্মার সময়েই কামরূপে আসিয়াছিলেন—সমতট পরিভ্রমণকালে যে ছয়টি রাজ্যের বিবরণ দিয়াছিলেন তাহার প্রথমটির নাম ছিল "শিহলিচট্লে"। ইহা সমতটের সংলগ্ন পূর্ব্বোত্তর দিকে অবস্থিত ছিল, ইহাই শ্রীহট্ট। শ্রীহট্টের তৎকালীন স্বাতন্ত্র্যের আর একটি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, আনুমানিক ৬০০ খৃঃ অঃ জালন্ধর রাজবধূ ঈশ্বরাদেবী যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তৎপ্রশস্তির শিরোভাগে "শ্রীহট্টাধিশ্বরেস্বঃ" লেখা আছে।" কামরূপ শাসনাবলী, ৪ পৃঃ, শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য।]

["পার্শ্ববর্ত্তী আসামেও তোদের কীর্ত্তি দেখরে ভাই,
অসীম প্রতিপত্তি তোদের শ্রীহট্টের সব ঠাঁই।
বারাক্ষিরা রাজবংশের অতীত গৌরব দেখ একবার,
বীরশ্রেষ্ঠ গঙ্গাসিংহ এই বংশের প্রভাকর।
দুর্দ্দান্ত খাসিয়াগণে নিজবলে করে দমন,
দ্বাবিংশতি পুঞ্জিপতি হ'য়ে করেন কালযাপন।
বংশীকুণ্ডা, ইছাইকলস, ছাতকের চৌধুরীগণ,
সুনামগঞ্জ মহকুমায় করেন সুখে কালযাপন।
বোয়ালজুরের চৌধুরীগণ শ্রীহট্টের সদরে,
সসম্মানে সগৌরবে আজো দেখরে বাস করে।

শ্রীহট্টে আরও বুনিয়াদিবংশ দেখবে ভাই,
অধিকাংশ আছে আজো সব ধ্বংস হয় নাই।
সুনামপুর, গৌরারঙ্গ, ডুবারাই দশঘর,
জয়শ্রী, হালিতলা, সুখাইড়, রাজানগর।"
মাহিষ্য-গৌরব-গাথা—শ্রীরজনীকান্ত ভৌমিক। ৭।৮ পৃঃ]

প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য—ইহাও একটি প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজ্য। দেবপালদেবের সেনাপতি ও শালিকাপুত্র বীর লাউসেন এই রাজ্য জয় করিয়া পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন।

["মহাভারতীয় যুগে ভগদত্ত এই দেশের (প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাজ্যের) রাজা ছিলেন। রাজা দুর্য্যোধনের মহিষী ভানুমতী ভগদত্তের কন্যা।" সামাজিক ইতিহাস, ৺দুর্গাচন্দ্র সান্যাল, ৪৩ পৃঃ]

["চীন পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াং কামরূপ দেশে ৬৪৩ খৃঃ অব্দে আসেন, তখনও ভগদত্ত বংশীয় ভাস্কর বর্ম্মা রাজত্ব করিতেছিলেন। ভাস্কর বর্ম্মা, হর্ষবর্দ্ধনের সহিত মিতালি করিয়া শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ আক্রমণ করিয়াছিলেন।" কামরূপ শাসনাবলী, ভূমিকা ১৪, ১৬ পৃঃ]

রাজা ভগদত্তের বংশের শেষ রাজা দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের সহিত রাণী ময়নামতীর (কমলাঙ্ক) ভগ্নী বনমালার বিবাহ হয়। ধর্ম্মপাল ময়নামতীর রাজ্য আক্রমণ করিলে, ময়নামতী ধর্ম্মপালকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, নিজপুত্র গোপীচাঁদকে প্রাগ্‌জ্যোতিষের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। [কামরূপ শাসনাবলী, শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, ৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।]

শশাঙ্ক

শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণের রাজা ছিলেন। কর্ণসুবর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলায়, কাটোয়া-আজিমগঞ্জ রেললাইনের পূর্ব্ব পার্শ্বে, চিরুটি রেল-স্টেসনের নিকটবর্ত্তী, বর্ত্তমান রাঙামাটি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে দুই মাইল ব্যাপিয়া ধ্বংসস্তূপ এবং বহু জীবন্ত জ্বলন্ত কিংবদন্তী বিদ্যমান আছে।

শশাঙ্কের কোন বংশধরের উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং তাঁহার জাতিনির্ণয়ও ঐতিহাসিকগণের গবেষণার বিষয়। যেহেতু শশাঙ্কের সময়, অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে, সমগ্র বঙ্গদেশে একমাত্র মাহিষ্যজাতির মধ্যেই ক্ষাত্রশক্তি বিদ্যমান ছিল দেখা যায়, সেই কারণে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, শশাঙ্ক নিশ্চয়ই মাহিষ্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর, এই স্থানের বর্ত্তমান অবস্থানের দিক্ দিয়াও সেই যুক্তির অনুকূলে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কর্ণসুবর্ণের যে ধ্বংসস্তূপ বিদ্যমান তাহার চতুর্দিকেই বহু সংখ্যক প্রাচীন মাহিষ্য পরিবার বিদ্যমান আছে। এই স্থানটি ব্যতীত এতদঞ্চলে মাহিষ্য জাতির বাস অত্যন্ত বিরল।

["হুয়েন সাং পুণ্ড্রবর্দ্ধনে কুড়িটি, সমতটে ত্রিশটি, তাম্রলিপ্তে দশটি, এবং কর্ণসুবর্ণে দশটি,—এই সর্ব্বসমেত সত্তরটি সঙ্ঘারাম বাঙ্গালাদেশে দেখিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে বিদ্যানিকেতন হিসাবে দুইটি ছিল শ্রেষ্ঠ, একটি পুণ্ড্রবর্দ্ধনে, অপরটি কর্ণসুবর্ণে। কর্ণসুবর্ণের সঙ্ঘারামের নাম ছিল 'রক্তভিটি' বা রক্তভিত্তি। ইহার দালানঘরগুলি ছিল প্রবাত ও প্রশস্ত, এবং তলযুক্ত সৌধগুলি সমুন্নত। রাজ্যের সকল প্রখ্যাত ও স্থিতপ্রজ্ঞ বৌদ্ধাচার্য্যগণ এই সঙ্ঘারামে সমুপেত হইয়া পরস্পর আলাপ আলোচনার দ্বারা চরিত্রের উৎকর্ষতার চেষ্টায় রত থাকিতেন।"—বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্ম, ২০৬ পৃঃ, শ্রীনলিনী নাথ দাশগুপ্ত]

পূর্ব্ব-ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

"একদা যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়
একদা যাহার অর্ণব-পোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়।"

বিজয়-সেনানী সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এবার যাঁহাদের অর্ণবপোত ভারত সাগরময় ভ্রমণ করিত তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইতেছে।

বিজয় সিংহ তমলুক হইতে সমুদ্র যাত্রা করিয়া লঙ্কা দ্বীপে উপনীত হন। তৎকালে তমলুক ভারতের বহির্বাণিজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল। এতদঞ্চের বণিকগণ তমলুকরাজের ছাড়পত্র লইয়া সমুদ্র যাত্রা করিতেন। তমলুকের সহিত রোম, গ্রীস ও মিশরের বাণিজ্য চলিত, ইহা বহু ইতিহাসে উল্লেখ আছে। তৎকালে ভারত মহাসাগরের পূর্ব্ব অঞ্চলে যে সকল অর্ণবপোত ভ্রমণ করিত তাহার কতকাংশ তমলুকের বণিকগণের ছিল, তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তমলুক ও সপ্তগ্রামের বণিকগণ ভারত মহাসাগরের পূর্ব্বাংশেও বাণিজ্য ব্যপদেশে গমনাগমন করিতেন, তাহার আভাষ পাওয়া যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "বিহারী দত্তের সমুদ্র যাত্রা" নামক প্রবন্ধে এবং বেণে বউ নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসে। ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতের বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রগুলিতে বণিক শক্তির সহিত সহকারীভাবে রাজশক্তিও গমন করিয়াছিল। যাভা ও বালী দ্বীপে যে সকল ক্ষত্রিয় রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা মাহিষ্য ও কৈবর্ত্ত—এই উভয় নামে পরিচিত ছিল তাহার উল্লেখ তথাকার ইতিহাসে পাওয়া যাইতেছে এবং তাহা এতদ্দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ পরবর্ত্তী যুগে উক্ত নামে পরিচিত হওয়ার প্রমাণের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের সহিত পালরাজগণের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, ইতিহাসের এই উল্লেখ হইতে মনে হয়, পূর্ব্ববঙ্গের মাহিষ্যগণই পূর্ব্ব ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে যবদ্বীপে বুরোবুদোর মন্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শনীয় বস্তু। মাহিষ্যজাতীয় শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা ঐ মন্দিরটি নির্ম্মাণ করেন। ঐ রাজাদিগের সহিত বাঙ্গালার পালরাজাদিগের সম্বন্ধ ছিল, তাহা নালান্দা হইতেও জানিতে পারা গিয়াছে বলিয়া কোন কোন ইতিহাসে উল্লেখ আছে।

যবদ্বীপে চাতুবর্ণাশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারিবর্ণ এখনও বিদ্যমান।

["To the xatriyas belong all those who bear the title of Arya K'bo or Mahishya and Ranga." (Journal of R. A. S. Vol. X—1878 P 85.)"

"The largest kingdom in Java did not contain many xatriyas, they are called Mahishya or K'bo & Ranga (names of ministers). They are all the xatriyas who existed in the largest kingdom of Java." Journal of R.A.S. 1877, Vol P. 116. জাতির কথা, ৩২-৩৩ পৃঃ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাড়ুই।]

যবদ্বীপে একাদশ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাদের সহিত দক্ষিণ ভারতের চোল রাজাদের যুদ্ধ বিগ্রহ চলে। ঐ সময় চোলেরা পূর্ব্ব উপদ্বীপ ও সুমাত্রার বহুস্থানে প্রাধান্য স্থাপন করেন। স্বদেশে, দক্ষিণ ভারতে চালুক্যদিগের সহিত যুদ্ধে চোলগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এই সুযোগে শৈলেন্দ্রগণ তাঁহাদের রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া লন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত যাভায় হিন্দুরাজত্ব চলিতে থাকে, তারপর মুসলমানগণ ঐ স্থানে প্রবল হয়। শৈলেন্দ্র রাজগণ বালীদ্বীপে গিয়া রাজ্য স্থাপন করেন।

["বালীদ্বীপে এখনও হিন্দুরাজত্ব আছে।"—ভারতবর্ষের ইতিহাস, ৯৭ পৃঃ, ডাঃ নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. বি. এল.]

["শৈলেন্দ্র বংশ, :—যাভা, যবদ্বীপে প্রাপ্ত ৭৮২ খৃঃ অব্দে, এক তাম্রশাসনে পাওয়া যায় যে, সে সময় শৈলেন্দ্রবংশ তিলক ইন্দ্র সেখানকার রাজা ছিলেন।

গৌড় থেকে আগত রাজগুরু কুমার ঘোষ এক মঞ্জুশ্রী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, রাজা মহাযান বৌদ্ধ ছিলেন এবং বাঙ্গলার সহিত যবদ্বীপের বেশ যোগাযোগ ছিল।

চোল রাজা রাজেন্দ্র চোলদেব শৈলেন্দ্র রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। প্রথমে চোলেরা শৈলেন্দ্র রাজ্যের মলয় ও সুমাত্রার কতকাংশ জয় করেন। সমস্ত একাদশ শতাব্দী ধরেই যুদ্ধবিগ্রহ হয়। ভারতবর্ষে নানা কারণে চোলেরা দুর্বল হইয়া পড়াতে শৈলেন্দ্ররা ক্রমে ক্রমে নিজেদের রাজ্য উদ্ধার করেন।" প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ২৫৪।৫৫ পৃঃ]

উপসংহার

ঠিক পৌনে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে, ইংরাজ মনীষী ও ঐতিহাসিক সার উইলিয়ম জোন্‌স্‌ বাঙ্গলার ইতিহাস উদ্ধারের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' এর ভিত্তি স্থাপন করেন। সেই সময় হইতে বাঙ্গলার ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টার বিরাম নাই। বহু উচ্চ শিক্ষিত ও মধ্য শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের চেষ্টায়, বহু বিপুল আয়তন ও ক্ষুদ্র আয়তনের ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে পাথুরে প্রমাণের অভাবও নাই। বৃহদাকারের ইতিহাসগুলি দেখিয়া দেশবাসীগণ একদিন বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়াছিলেন এবং আশা করিয়াছিলেন, এবার তাহাদের সত্য পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশগুলিই পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের ন্যায় ফলদান করিয়াছে। সেই সকল ইতিহাস কেবল ধাঁধাঁর সৃষ্টি করিয়াছে। সেগুলি পাঠ করিয়া একজন বাঙ্গালীও নিজেকে চিনিতে পারিলেন না। অধিকন্তু গোত্র, প্রবর, সামাজিক সংস্কার প্রভৃতির দ্বারা নিজেকে যতটুকু চিনিয়াছিলেন, এখন তাহাও উল্টাইয়া যাইতেছে। এখন দেশবাসীগণের মনে গভীর সংশয় জাগিতেছে যে, এই পৌনে দুইশত বৎসর ধরিয়া ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে, না, জীবন্ত ইতিহাসকে সমাধি দিবার চেষ্টা চলিতেছে। এ বিষয়ে আমার যুক্তিগুলি যেন আমার মনগড়া কথা বলিয়া মনে না করেন তজ্জন্য নিম্নে দুই-চারিজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম এবং মধ্যে মধ্যে আমার যুক্তিগুলি সন্নিবিষ্ট করিলাম। সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ৺মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের 'বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী' নামক পুস্তক হইতে কতকগুলি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইতেছে। পরে

অন্যান্য আরও দুই চারিটি ইতিহাস হইতে তাহাদের মন্তব্যও যথাসম্ভব উল্লেখ করিয়া দেখান হইবে।

["বাঙ্গলার ইতিহাস এখনও সুনিশ্চিতরূপে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই, কখন হইবে কিনা সন্দেহস্থল, অন্ততঃ যাহাকে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস বলে, তাহার কোন দৃঢ় সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, কিন্তু একটা ইতিহাস চাই—যেমন করিয়াই হউক, একটা অতীতের বিবরণ প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং তাহা যত দুঃসাধ্য এবং সিদ্ধান্তগুলি যত বাদ-বিসংবাদ সঙ্কুল হয়, ততই গবেষণার উৎসাহ বাড়িয়া যায়; এই জন্য বাঙ্গলার ইতিহাস উদ্ধার ক্ষেত্রে অধুনা বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ গবেষণার ফল, যাহা উত্তমরূপে যাচাই বাছাই ও ধোলাই করিয়া ডালায় সাজাইয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাতে কতকগুলি টুকরা বা ভগ্নাংশের অতিশয় আয়াসপূর্ণ একত্র বন্ধন ছাড়া আর কিছুই লভ্য হয় নাই। আবার, তেমনই ঐতিহাসিক তাঁহার ব্যক্তিগত ধারণা বা মতবাদের সমর্থন করিতেই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহাতে এমন কথা বলিতে বাধ্য হন যে, বাঙ্গলার ইতিহাস এখনও অসম্পূর্ণ এবং তাহার ধারাও বহু বিচ্ছিন্ন; অতএব উহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে"।—বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী, ৺মোহিতলাল মজুমদার, ২।৩ পৃঃ]

["অধুনা বাঙ্গালীর ইতিহাস বলিতে আর এক বস্তুকে মহাসমারোহে, ঢক্কা নিনাদে বিঘোষিত করা হইতেছে। যত অনুন্নত ও আদিমস্তরের মানুষকেই আদর্শস্থানীয় করিয়া ইতিহাস রচনা করা হইতেছে। এরূপ ইতিহাস রচনার পশ্চাতে একটা বিশেষ মনোবৃত্তি আছে। আর্য্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে বাঙ্গলা হইতে সম্পূর্ণ বহিষ্কার করিয়া দিতে উন্মুখ।"—ঐ পুস্তক, ৭ পৃঃ]

["ইতিহাসকেও ঐরূপ মতবাদের সমর্থক মূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করা অনেক কারণেই সহজ; একটু বুদ্ধির চতুরতা এবং তথ্যসংগ্রহের নিপুণতা থাকিলেই হইল—খাপ খাওয়াইতে খুব বড় মনীষার ও প্রতিভার প্রয়োজন হয় না। এদিকে বাঙ্গলার ইতিহাস যেমন কল্পনার লীলাভূমি হইয়াছে,

তেমনি অপরদিকে বাঙ্গালীর ঐ জীবন এবং সংস্কৃতিকে অতি সহজেই আধুনিক গণতন্ত্রবাদের অধীন করিয়া দেখান সহজ।"—ঐ পুস্তক ১১ পৃঃ]

["আমার পাঠকগণ পাছে আমার সিদ্ধান্তগুলিকে সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত বলিয়া মনে করেন, আমি যে বলিয়াছি বাঙ্গলার ইতিহাস অসম্পূর্ণ এবং যেহেতু তাঁহাদের অনেকেই সেই ইতিহাস জ্ঞাত নহেন, অতএব মনে না করেন যে আমার বড়ই সুবিধা হইয়াছে, তাই বাঙ্গলার ইতিহাসে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী সম্বন্ধে যে তথ্যগুলি এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার একটা চুম্বক তাহাদিগকে উপহার দিব এবং সেই তথ্য ও তত্ত্বের ফাঁকে ফাঁকে আমার জিজ্ঞাস্য মন্তব্য সন্নিবিষ্ট করিব সেই মন্তব্যগুলি সাক্ষাৎ ভাবে না হইলেও গৌণভাবে আমার কাজে লাগিবে। এখন সেই ইতিহাস কি বলে দেখা যাক। সেই তথ্যগুলির জন্য আমি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস' নামক মূল্যবান্ গ্রন্থখানির নিকট ঋণী।" ঐ পুস্তক, ২১ পৃঃ]

["বাংলাদেশে কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সমুদয় অন্ত্যজ জাতি দেখা যায় ইহারাই আদিম আধিবাসীদিগের বংশধর। ভাষার মুলগত ঐক্য হইতে ইহাদের জাতিত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই মানবগোষ্ঠীকে অষ্ট্রো-এশিয়াটিক অথবা অষ্ট্রিক এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষের বাহিরে পূর্ব্ব-দক্ষিণ-এশিয়ায় এই জাতির সংখ্যা এখনও খুব বেশী।"—বাংলাদেশের ইতিহাস, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, ১০ পৃঃ]

ইহার বিরুদ্ধে মোহিত বাবুর মন্তব্য :—["এই আদিম বাঙ্গালী জাতি সকলের পরিচয় আমাদের প্রয়োজনের বহির্ভূত। ইহাদের রক্ত বা সেই চরিত্র বা প্রকৃতি যদি বর্ত্তমান বাঙ্গালীর রক্তে মিশিয়া থাকে তবে উহাকেই বাঙ্গালীর রক্তবীজ বলা যায় কি না, সেই রক্তের প্রভাব কতটুকু এখনও বাঙ্গালী চরিত্রে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা বলা শক্ত। এক্ষণে বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির সংগঠনে আরও প্রত্যক্ষ যে জাতীয় উপাদান মিশ্রিত হইয়া আছে তাহারই সংবাদ দেওয়া যাউক।"—বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী, ৺মোহিতলাল মজুমদার, ২৭ পৃঃ]

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতেছে ঃ—চণ্ডাল জাতির সহিত কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির ভাষার মূলগত ঐক্য আছে কি ?

["ঐ সকল জাতিকে পরাভূত করিয়া বাংলাদেশে যাঁহারা বাস স্থাপন করেন এবং যাঁহাদের বংশধরেরা প্রধানতঃ বর্ত্তমান বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সমুদয় বর্ণভুক্ত হিন্দুর পূর্ব্ব পুরুষ, তাঁহারা যে বৈদিক আর্য্য হইতে ভিন্ন জাতীয় ছিলেন, এবিষয়ে কোন মতভেদ নাই।"

"প্রাচীন বাঙ্গালী জাতিতে যে মোঙ্গোলীয় রক্ত নাই ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদীসম্মত। আর, দ্রাবিড় নামে কোন পৃথক্ জাতির অস্তিত্ব পণ্ডিতগণ এখন স্বীকার করেন না।"

"বৈদিক আর্য্যগণ যে যে প্রদেশে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন সেখানকার সকল শ্রেণীর হিন্দুগণ দীর্ঘ-শির। কিন্তু বাংলার সকল শ্রেণীর হিন্দুগণই 'প্রশস্ত শির।"—বাংলাদেশের ইতিহাস, শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার, ১০।১১ পৃঃ]

ইহার বিরুদ্ধে মোহিত বাবুর মন্তব্য ঃ—["উপরকার ঐ সংবাদটি বড়ই মূল্যবান্—"বৈদিক আর্য্যগণ হইতে ভিন্ন জাতীয় ছিলেন" অর্থাৎ বাঙ্গালী আর্য্য বটে, কিন্তু ভিন্ন জাতীয় আর্য্য। কিন্তু পণ্ডিতগণ নৃ-তত্ত্ব বিদ্যার প্রমাণে "বাংলার সকলশ্রেণীর হিন্দুগণকেই প্রশস্তশির বলিয়া তাহাদিগকে এক জাতিত্বের যে অবিমিশ্রতা গৌরব দান করিয়াছেন তাহা যেমনই হোক বাঙ্গলার "হিন্দুগণ" কি সকলেই সেই অপর আর্য্য সম্ভূত ?

পরে কান্যকুব্জাগত কুলীনগণ যাঁহাদের বংশ বাঙ্গলা দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে—তাঁহারাও কি সেই বঙ্গীয় আর্য্য ? বাঙ্গলায় আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, আদিশূর যাঁহাদিগকে পতিত করিয়াছেন—সেই আদ্য গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণই বা কোন্ আর্য্যের অন্তর্ভুক্ত হইবেন ?"—বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী, ২৮।২৯ পৃঃ]

["মস্তিষ্কের গঠনপ্রণালী হইতে নৃ-তত্ত্ববিদ্গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি। এমন কি, বাংলা দেশের ব্রাহ্মণের সহিত ভারতের অপর কোন প্রদেশের ব্রাহ্মণের অপেক্ষা বাংলার কায়স্থ,

সংগোপ কৈবর্ত্ত প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ।" বাঙ্গলার ইতিহাস শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ১১ পৃঃ।

ইহার বিরুদ্ধে মোহিতবাবুর মন্তব্য :—[ইহাই বাঙ্গালীর জাতি পরিচয়ের ব্রহ্মতত্ত্ব, নৃতত্ত্ববিদগণের কল্যান হউক। ঐ যে বিশিষ্ট জাতি এবং ব্রাহ্মণ হইতে সংগোপ কৈবর্ত্ত পর্য্যন্ত একটি ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্বন্ধ বিগুমান, ইহাই বাঙ্গলার জাতি সৃষ্টির মূলকথা। বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী ২৯ পৃঃ]

বাঙ্গলার ব্রাহ্মণগণের সহিত উত্তরভারতের অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণগণের ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্বন্ধ আছে ইহা পরে দেখান হইতেছে। এখানে এইমাত্র বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণগণের সহিত সংগোপ, চাষীকৈবর্ত্তগণের ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্বন্ধ থাকা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার কোন কারণ নাই। যেহেতু শেষোক্ত সম্প্রদায় দুইটি প্রাচীন ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিনটি সম্প্রদায়ই একই আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর বাঙ্গালাদেশে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণই আসেন নাই, তাঁহাদের সহিত ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণও আসিয়াছিলেন।

["শূদ্রজাতি যে সকলেই অনার্য্য এবং তাহারা যে বহুসংখ্যক ছিলেন, এ সব কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সে সময়ে সামান্য কয়েকজন উপনিবেশ-কারী আর্যের পক্ষে শত সহস্র অনার্য্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বাসই অসম্ভব হইত। উহারা পাঁচ মিনিটে আর্য্যদের চাটনি করিয়া ফেলিত।" ভারতে বিবেকানন্দ ৩২৬ পৃঃ]

["প্রাচীনকালে যখন ব্রাহ্মণই একমাত্র দ্বিজ ছিলেন না, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজসম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, যখন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত শিক্ষা লাভ দ্বারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের উপনয়ন হইত, তখনই এদেশে ব্রাহ্মণের আদর্শ উজ্জ্বল ছিল। কারণ চারিদিকের সমাজ যখন অবনত তখন কোন বিশেষ সমাজ আপনাকে উন্নত রাখিতে পারেনা। ক্রমেই নিম্নের আকর্ষণ তাহাকে নীচের স্তরে লইয়া আসে।"

"ভারতবর্ষে যখন ব্রাহ্মণই একমাত্র দ্বিজ অবশিষ্ট, যখন তাহার আদর্শ স্মরণ করাইয়া দিবার আর কেহই রহিল না তখন তাহার দ্বিজত্বের বিশুদ্ধ কঠিন আদর্শ দ্রুত বেগে ভ্রষ্ট হইতে লাগিল। প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য দ্বিজ ছিল অর্থাৎ সমস্ত আর্য সমাজ দ্বিজ ছিল। শূদ্র বলিতে কোল, ভিল, সাঁওতাল বুঝাইত।

আমাদের বর্ত্তমান সমাজের ভদ্রসম্প্রদায় অর্থাৎ বৈদ্য কায়স্থ ও বণিক সম্প্রদায়। সমাজ ইহাদিগকে দ্বিজ বলিয়া গণ্য না করিলে ব্রাহ্মণের আর উত্থানের আশা নাই। বৈদ্যরা উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, কায়স্থরা বলিতেছেন ক্ষত্রিয়, বণিকেরা বলিতেছেন তাঁহারা বৈশ্য, একথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারন দেখি না।

আর্য্যরক্তের সহিত অনার্যরক্তের যে সংমিশ্রণ হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই হইয়াছে।" স্বদেশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৬।৭৭ পৃঃ]

মোহিতবাবু প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন যে পরে কাণ্যকুব্জাগত কুলীনগণ, যাঁহাদের বংশ বাংলাদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে—তাঁহারাও কি সেই বঙ্গীয় আর্য্য ?

ইহা না হইবার কারণ কি আছে ?

"মস্তিষ্কের গঠন প্রণালী হইতে নৃতত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করিয়া ছেন যে বাঙালী এক স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি"। উক্ত মন্তব্যটি কি রমেশবাবুর মনগড়া কথা ? কারণ ঐ যুক্তিটি তো রিজলে সাহেবের যুক্তি। তিনি তো কেবলমাত্র বাঙালী জাতি সম্বন্ধে উক্ত যুক্তিটি প্রয়োগ করেন নাই। পঞ্চনদ প্রদেশ ব্যতীত ভারতের সকল প্রদেশের অধিবাসীগণের উপর উক্ত যুক্তিটি প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং কনৌজ ব্রাহ্মণগণও সেই আর্য্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কি থাকিতে পারে ?

মস্তিষ্কের গঠন অনুযায়ী যে আর্য্য অনার্য্য মতবাদ চলিয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

"[রিজলে সাহেব নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের সূত্র মতে মাপজোখ করিয়া এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লম্বা মুণ্ড ও দুই শ্রেণীর গোল মুণ্ড টাইপ আবিষ্কার করেন। লম্বা মুণ্ড টাইপের একটি আর্য্য ও অপরটি দ্রাবিড়। গোল মুণ্ডের একটি মোঙ্গোলীয় ও অপরটি সিথিয়ান। মাপজোখ করিয়া যে সকল সংখ্যা তিনি পান তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, কোন অঞ্চলে কোন টাইপের প্রাধান্য ও কোন অঞ্চলে বিভিন্ন টাইপের সংমিশ্রণ হইয়াছে। উত্তর ভারতে পাঞ্জাব অঞ্চলে ইন্দোএরিয়ান বা আর্য্য টাইপের প্রাধান্য। ইহা বাদে দেশের প্রায় সর্ব্বত্র প্রাচীন অধিবাসী ছিল দ্রাবিড়। দ্রাবিড় জাতির সহিত কোথাও গোলমুণ্ড সিথিয়ান, কোথাও গোলমুণ্ড মোঙ্গোলীয় সংমিশ্রন হইয়াছে। কয়েকটি অঞ্চলে দ্রাবিড় ও সিথিয়ানের সহিত আর্য্য টাইপের সংমিশ্রণের কথাও তিনি বলিয়াছেন। বাঙ্গালী মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর প্রতিবেশী। কাজেই তাহার মতে দ্রাবিড় টাইপের সহিত মোঙ্গোলীয় টাইপের সংমিশ্রনে বাঙ্গালী টাইপের উৎপত্তি হইয়াছে।

আর্যকৃষ্টির উত্তরাধিকারী দলের মধ্যে পরিগণিত এবং আর্য্যভাষাভাষী বাঙালী হিন্দু স্বভাবতঃই রিজলে সাহেবের এই সিদ্ধান্তে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিল। প্রতিবাদ অনেক হইল। একদল ক্ষুন্ন হইয়া আপত্তি তুলিলেন কিন্তু আর একদল বাঙ্গালীর মধ্যে এই মোঙ্গোল দ্রাবিড় সংমিশ্রণের থিওরী মানিয়া লইয়া বাঙ্গালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ধুয়া তুলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন।

পাঞ্জাবের লম্বামুণ্ড টাইপকে আর্য্যটাইপ বলিয়া ঘোষণা করিবার মূলে রহিয়াছে য়ুরোপীয় আর্য্যবাদের প্রবল প্রভাব। আর্য্যজাতি যে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী ইহা য়ুরোপীয় আর্য্যবাদের স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত, যদিও যাহারা বাস্তবিক আপনাদিগকে আর্য্য বলিত তাহাদের মাথার মাপ লওয়া কোন নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীর পক্ষে এখন আর সম্ভব নহে। তারপর, যে সিথিয়ান টাইপের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন, সে টাইপটি আসলে কি তাহা অজ্ঞাত।

রিজলের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার পর যে প্রতিবাদের কলরব উত্থিত হইল তাহার বৈজ্ঞানিক রূপ পাইল প্রায় দশবৎসর পরে রমাপ্রসাদ চন্দের হাতে। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে (Indo-Aryan Races 1916) তিনি এই মত ব্যক্ত করিলেন যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতে গোলমুণ্ড টাইপের উৎপত্তি মোঙ্গোলীয় ও সিথিয়ান সংমিশ্রণ হইতে হয় নাই। হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তর পামীরের উপত্যকা সমূহে বর্ত্তমানকালে গোলমুণ্ড আর্য্য ভাষাভাষী জাতি দেখা যায়।……এই আর্য্য গোষ্ঠী গোল মুণ্ড (Alpine) পূর্ব্বভারতীয় ও পশ্চিম ভারতীয় গোলমুণ্ড টাইপ এই আলপাইন টাইপ, ইহা সিথিয়ান নহে, মোঙ্গোলীয়ও নহে। এই আলপাইন জাতি হইতেছে অবৈদিক-আর্য্য জাতি। বৈদিক-আর্য্য ও অবৈদিক-আর্য্য শ্রীননীমাধব চৌধুরী, প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৫৪—১৭।১৮ পৃঃ]

চন্দ মহাশয় যদিও উচ্চ সম্প্রদায়ের বাঙ্গালীগণকে অনার্য্যের গণ্ডি হইতে উদ্ধার করিলেন কিন্তু তাঁহারা গোলমুণ্ড, দীর্ঘমুণ্ড আর্য্যগণ হইতে স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর এবং অবৈদিক এই আখ্যা দিয়া আরও একটি গোলমাল সৃষ্টি করিয়া দিলেন ! এক্ষণে বিচার করিতে হইবে তাঁহারা দীর্ঘমুণ্ড আর্য্য সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র ছিলেন এবং অবৈদিক ছিলেন কিনা ? প্রথমে দেখিতে হইবে অবৈদিক এই কথাটির প্রয়োগ কিরূপ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে !

যদি পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ইউরোপ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগের আর্য্যগণ দীর্ঘমুণ্ড বলিয়া সাব্যস্ত হন তজ্জন্য তাঁহারা 'বৈদিক আর্য্য' এই আখ্যা কিরূপে পাইতে পারেন। ইউরোপের প্রাচীন অধিবাসীগণ কি বেদের অনুশীলন করিতেন ? অবশ্য তাঁহাদের ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দের মূল বিদ্যমান আছে, তজ্জন্য তাঁহারা আর্য্যনামে অভিহিত হইতে পারেন মাত্র। বেদ তো ভারতীয় আর্য্যগণের নিজস্ব সম্পত্তি এবং তাহা সর্ব্ব প্রথমে বিদেহ, কাশী কোশল কুরু পাঞ্চাল

দেশেই রচিত হইয়াছিল। অতএব বৈদিক এই বিশেষণটি তথাকার আর্য্যগণেরই একমাত্র প্রাপ্য।

["ঐতেরেয় ব্রাহ্মণের মতে (৮।১৪) মধ্যদেশের অর্থ কুরুপাঞ্চাল দেশ। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সমাজ সংগঠন ইত্যাদি এই কুরুপাঞ্চাল দেশে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং এই কেন্দ্র হইতে ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টি পূর্ব্ব, পশ্চিম, ও দক্ষিণে প্রসারিত হয় পণ্ডিতগণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রধান ব্রাহ্মণগুলি কুরুপাঞ্চাল দেশে রচিত হইয়াছিল।.........শতপত ব্রাহ্মণের মতে বিদেহ রাজসভার ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য পাঞ্চাল দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত উদ্দালক আরুণির শিষ্য।" বৈদিক আর্য্য ও অবৈদিক আর্য্য শ্রীননীমাধব চৌধুরী, প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৫৪ সাল, ১৮ পৃঃ]

একটি সাধারণ মতবাদ চলিয়া আসিতেছে যে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া প্রথমে পঞ্চনদ প্রদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া সমগ্র উত্তর ভারতে এবং পরে দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। একটু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহাও একটা ভ্রান্ত ধারণা। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের মত গ্রহণের পুর্ব্বে সাধারণ জ্ঞানের আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

দেখা যায় রামায়ণের যুগ বৈদিকযুগের প্রথম যুগ, রামায়নের ঋষি বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদিই বৈদিক যুগ আরম্ভকালের ঋষি। আর তাঁহাদের সাধনক্ষেত্র বিদেহ, কাশী কোশল, কুরু, পাঞ্চাল দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখা যায়। সে যুগে পঞ্চনদ প্রদেশের কোন ঋষি ও স্থানের নাম উল্লেখ দেখা যায় না। তাহার পরবর্ত্তী মহাভারতীয় যুগে পঞ্চনদ প্রদেশের পূর্ব্ব সীমায় হস্তিনানগর ও কুরুপাণ্ডবদিগের ইতিহাস পাওয়া যায়। তাহার বহু পরবর্ত্তী যুগে খৃঃ পূঃ ৯ম শতব্দীতে পশ্চিম পাঞ্জাবে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়

পাওয়া যায়। এই সকল কারণে মনে হয় বৈদিক আর্য্যগণ প্রথম ভারতে আগমন করিয়া বিদেহ কাশী, কোশল প্রভৃতি দেশে বাস করিয়াছিলেন। পঞ্চনদ প্রদেশ তখন তাঁহাদের বাসের অযোগ্য হইয়াছিল। যদি মনে করা হয় পঞ্চনদ প্রদেশ তখন অবৈদিক আর্য্য গণের অধিকারে ছিল কিন্তু তাহাই বা সম্ভব হইবে কিরূপে? বৈদিক আর্য্যগণ তাহাদিগকে কি ভাবে অতিক্রম করিয়া বিদেহ ও কোশল দেশে প্রবেশ করিলেন। মনে হয় সিন্ধুনদের প্রবল বন্যার জন্য পঞ্চনদ প্রদেশ তখন বৈদিক আর্য্যগণের বাসের যোগ্য হয় নাই। সিন্ধুনদে কিরূপ প্রবল বন্যার প্রকোপ ছিল তাহা মহেনজোদাড়োর ইতিহাস হইতে বুঝা যায়। পর পর সাতটি বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তরে মহেনজো-দাড়োর ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বিদেহ প্রভৃতি প্রদেশগুলি যে বৈদিক আর্যগণের প্রাচীনতম বাসভূমি ছিল সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের মত উদ্ধৃত করা হইতেছে।

ম্যাকডোনেল ও কীথের একটি ইঙ্গিত এক্ষণে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

["That the Kosala, Videhas were originally settlers of an older date than the Kuru Panchalas is reasonably obvious from their geographical position."

অন্যত্র,

The geographical position of the Kuru Panchalas renders it probable that they were later immigrants into India than the Kosala Videhas or the Kasis, who must have been pushed into their most eastward territories by a new wave of Aryan immigration."

ম্যাকডোনেল ও কীথের কাশী, কোশল, ও বিদেহ এবং কুরুপাঞ্চালের আর্য্যবসতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে ইঙ্গিতের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে তাহা এই প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্য্য পূর্ণ। যজ্ঞীয় দক্ষিণা সম্ভার লইয়া বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বদিক হইতে শতুদ্রি ও বিপাশা অতিক্রম করিবার কাহিনী তাৎপর্য্যহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। শতপথ ব্রাহ্মণের অগ্নিবৈশ্বানরের পূর্ব্বদিকে অভিযানের কাহিনীকে প্রচলিত ব্যাখ্যামতে আর্য্যসভ্যতা ও আর্য্যজাতির বিস্তৃতির ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ না করিয়া মনে করা যাইতে পারে যে এই প্রাচীন কাহিনীর ভিত্তি একটি প্রাচীনতর কিম্বদন্তী এবং যাহাকে আর্য্যসভ্যতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে উহা বাস্তবিক ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টি। ব্রাহ্মণ আর্য্য হইতে পারেন কিন্তু সকল আর্য্যই ব্রাহ্মণ নহে। পারশ্যের হাকামনি সম্রাট প্রথম দারিয়ুস খৃঃ পূঃ ৫ম শতকে আপনাকে আর্য্য বলিয়া বর্ণণা করিয়াছেন।" বৈদিক-আর্য্য ও অবৈদক-আর্য্য শ্রীননীমাধব চৌধুরী। —প্রবাসী কার্ত্তিক ১৩৫৪—১৯।২০, ২৪ পৃঃ]

মনে হয় উপরোক্ত বর্ণনার পর বৈদিক আর্য্য কাহারা এবং অবৈদিক আর্য্য কাহারা তাহা চিনাইবার জন্য, আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হইবে না। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি যে, ম্যাকডোনেল ও কীথ পুনঃ পুনঃ যে Geographical Position সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, সেই Geographical Position জ্ঞান, এতদ্দেশীয় সেই সকল ঐতিহাসিকের ছিল কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে, যাঁহারা বিদেহ আর্য্যকৃষ্টির প্রাচীনতম পীঠস্থান জানিয়াও পুণ্ড্রবর্দ্ধন আদিশূরের সময় পর্য্যন্ত আর্য্যকৃষ্টির বাহিরে ছিল বলিয়া চিৎকার করিয়া আসিতেছেন।

এবার গোলমুণ্ড ও দীর্ঘমুণ্ড আলোচনায় ফিরিয়া আসা যাউক এবং সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ গণের মত উল্লেখ করা হইতেছে।

["গোলমুণ্ড অবৈদিক আর্য্যজাতি কোন অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল সে সম্বন্ধে চন্দের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে চন্দের মতের ভিত্তি

প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী উজফালভি (Ujfalvy) এবং ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞানী সর অরেল ষ্টাইনের সংগৃহীত নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের জয়েস (T. A. Joyce) কৃত ব্যাখ্যা। কিন্তু দেখা যায় যে জয়েসের নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক তথ্যের বিশ্লেষণের ফলে যে সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য তাহা গ্রহণ না করিয়া চন্দ তাকলা মাকান মরুভূমির প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবাসীদিগকেই অবৈদিক গোলমুণ্ড আর্য্যদিগের পূর্ব্বপুরুষ বর্ণনা করিয়াছেন, যদিও এই অধিবাসীদিগকে একটি নিসম্পর্কিত মনুষ্যগোষ্ঠী বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। ....জয়েস ও অন্য পণ্ডিতগণ তাকলা মাকানের প্রাচীন অধিবাসী ও পামীরের অধিবাসী দিগকে ইরাণী গোষ্ঠীভুক্ত মনে করেন।.. ...এই প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদ চন্দের ব্যবহৃত যুক্তিকে অতি দুর্ব্বল মনে না করিয়া উপায় নাই।......সুতরাং গোলমুণ্ড অবৈদিক আর্য্যদিগকে নিঃসন্দেহে পূর্ব্ব ইরাণীয় আর্য্যগোষ্ঠী হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যে পামীরী আলপাইন জাতি সিন্ধু সভ্যতার যুগে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল তাহারা তাজিক দিগের প্রতিনিধি—ডাঃ হাটনের... . উল্লিখিত মত হইতে এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। বৈদিক আর্য ও অবৈদিক আর্য্য শ্রীননীমাধব চৌধুরী—প্রবাসী কর্ত্তিক—১৩৫৪, ২৪পৃঃ]

বৈদিক আর্য্য, ও অবৈদিক আর্য্য গোলমুণ্ড ও দীর্ঘমুণ্ড হিসাবে ববহৃত নয়। বেদের অনুশীলন ও যাগ যজ্ঞাদি লইয়া একই আর্য্য-সমাজে দুইটি ভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়। ভিন্ন শ্রেণী সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী বৈষম্য উপস্থিত হয়। এই ইতিহাসের প্রথমভাগে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অবৈদিক আর্য্যগণ বৈদিক আর্যগণের দ্বারা বিজিত হইয়া সংস্কারচ্যুত হন এবং দৈত্য ও পরে শূদ্র নামে অভিহিত হন। বৈদিক আর্য্য গণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকালীন অবৈদিক আর্য্যগনের যেরূপ বিশাল সাম্রাজ্যের ও জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে তাহারা আর্য্যগণের সমগুণসম্পন্ন উন্নত জাতি বলিয়াই প্রমাণিত হন। ঐতিহাসিক গণের অনেকে ইহাই

সঠিক বুঝিতে না পারিয়া দ্রাবিড় নামক একটি কাল্পনিক জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তথাকথিত দ্রাবিড় অর্থাৎ নিগ্রোগণের নিকট সেরূপ গুণের পরিচয় আশা করা বাতুলতার নামান্তর।

বৈদিক-আর্য্য ও অবৈদিক-আর্য্য উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদের বহু পরবর্ত্তী যুগেও কিছু কিছু বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল তাহা মহাভারত হইতেই প্রমাণিত হয়। অনিরুদ্ধ-উষা, যযাতি-শর্ম্মিষ্ঠার নাম এখানে উল্লেখ যোগ্য। বিভিন্ন পুরাণে এবং ইতিহাসে আর্য্যগণের শূদ্রকন্যা গ্রহনের যে উল্লেখ দেখা যায়, সেই শূদ্র কন্যা বলিতে অবৈদিক আর্য্যকন্যাই বুঝা যায়। নতুবা আর্য্যগণ নিগ্রোকন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা আদৌ সম্ভব নহে। মহাভারতে শর্ম্মিষ্ঠার যে রূপলাবণ্যের বর্ণনা আছে তাহাতে তিনি অবৈদিক-আর্য্যকন্যা বলিয়াই প্রমাণিত হন।

চণ্ডাল শব্দটি বিজিতের প্রতি বিজেতার ঘৃণামূলক সম্বোধন বলিয়াই মনে হয়। চণ্ডালগণ যে অবৈদিক-আর্য্যগণের শাসক সম্প্রদায় ছিলেন তাহা ঐ ঘৃণাসূচক সম্বোধন হইতেই প্রমাণিত হয়। শাসক সম্প্রদায়টির উপর বিজেতার আক্রোশ ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বঙ্গদেশে বহুস্থানে চণ্ডাল রাজগণের রাজধানীর উল্লেখ আছে। ইহাতে মনে হয়, কতকগুলি অবৈদিক-আর্য্য রাজবংশ বৈদিক-আর্য্যগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়া করদরাজা রূপে স্বীকৃত হইয়াছিল।

চণ্ডালগণের মধ্যে এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে পূর্ব্বে তাহাদের বাস ছিল পুণ্ড্রবর্দ্ধনে। ঐ দেশে ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়া তাহাগিকে ঐ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তদবধি চণ্ডালগণ পূর্ব্ব বঙ্গে বাস করিতেছেন। (পুরাবৃত্ত—৺পরেশনাথ বন্দোপধ্যায়, ৫৩।৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য) পুরাণে বর্ণিত আছে দৈত্যরাজ বলি বিষ্ণুকে

ত্রিপাদ ভূমিদান কারিয়া পাতালে গমন করেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধনে বলিরাজের রাজধানী ছিল।

বিজিতগণকে সংস্কারচ্যুত করার ন্যায় জঘন্যতম কূটনীতি ভারতের মাটিতেই উদ্ভূত দেখা যায়, মনে হয় নিগ্রোগণের সহিত ব্যবধান রাখিবার জন্য আর্য্যগণ একটা সামাজিক নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তাহারই সংক্রামত্ব বৃদ্ধি পাইয়া যে উৎকট আকার ধারণ করে, তাহারই চরমরূপ প্রকাশিত হয় স্বসম্প্রদায়ভুক্ত বিজিতগণের উপর তাহার প্রয়োগে। ইহারই বিষময় ফল কোটি কোটি হিন্দুর মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ এবং শেষ পরিণতি পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব।

প্রাচীনকালে উত্তর ভারতে কেবলমাত্র আর্য্যগণেরই দুইটি শাখা, অবৈদিক-আর্য্য ও বৈদিক-আর্য্যগণ বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে দুইটি জাতি ভারতের বুকে বিরাট অভিযান চালাইয়াছেন তাহারা ভারত ইতিহাসে শক-হূণ নামে পরিচিত। তাঁহারা তৎকালে উত্তরভারতে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিম ভারতের প্রাচীন রাজ্যগুলি ধ্বংস করিয়া নিজেদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এদেশেই বসতি স্থাপন করিলেন। এখনও ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ভারত ইতিহাস তাঁহাদের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করে। কিন্তু তাঁহাদের পরবর্ত্তী অবস্থা যেরূপ শুঁয়াপোকা পরবর্ত্তী জীবনে প্রজাপতিতে পরিণত হয় তদনুরূপ। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য সম্প্রদায় কনোজ-ব্রাহ্মণগণের মাধ্যমে তাঁহাদিগকেই যজ্ঞাগ্নি পূতঃ করিয়া ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নয়ন করিয়া লইয়া বাঙ্গলার প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ক্ষত্রিয়-গণকে দমন করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহাদিগকে গৌরবসূচক পাষণ্ডদলন নাম দিয়াছিলেন।

ইহাকেই বলে "গাড়ি পর না, না পর গাড়ি"। ভারত ইতিহাসের ঘটনাগুলি কিরূপ বৈচিত্র পূর্ণ।

পালসাম্রাজ্যের পতনের পর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ইঁহারাই উত্তর ভারতের একমাত্র ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া গণ্য। উত্তর ভারতের প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধযুগে দ্বিজসংস্কার ত্যাগ করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন তাঁহাদের জাতি নির্ণয় ঐতিহাসিকগণের গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া দিতে পারেন কি, কাহারা সেই শক হূণ দমনকারী ক্ষত্রিয়গণের বংশধর, আর কাহারাই বা সেই শক হূণ জাতির বংশধর, যাহাদের নামে এখনও কাগজে কলমে নাসিকা কুঞ্চিত করা হয়? আর তাঁহারা কোন মানব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইবেন, আর্য্য না অষ্ট্রিক, না মোঙ্গোলীয়? সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ নীরব। সেই শ্বেতহূনগণের কন্দর্পের মত রূপলাবণ্য, তিলফুলজিনি নাসা দেখিয়া নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে আর্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর তাঁহারা আসিয়া ছিলেন আর্য্যগণের প্রাচীন বাসভূমি মধ্য এশিয়া হইতে, সুতরাং তাঁহারা যে আর্য্যগণের স্বদেশে অবস্থিত অবশিষ্ট বংশধর হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এই যাযাবর শ্বেতহূণগণের দল যখন ভারতের সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যগুলি আক্রমণ করিতে লাগিল তখন দেশবাসীগণ ঘৃণা করিয়া তাহাদিগকে বর্ব্বর আখ্যা দিয়াছিলেন কিন্তু আর্যগণও আদিতে তাঁহাদের ন্যায় ছিলেন এবং কাহারও কাহারও নিকট সেইরূপ বর্ব্বর আখ্যাই পাইয়া ছিলেন তাহার একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইল।

"[জার্ম্মান পণ্ডিত গ্রাজেনাম লিখিয়াছেন 'জার্ম্মানদের দ্বারা প্রাচীন সভ্যতা (গ্রীস ও রোমীয় সভ্যতা) ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার মতো যাযাবর আর্য্য-বর্ব্বরদের

দ্বারা দ্রাবিড় সভ্যতা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।" প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, ভূমিকা ১পৃঃ ডাঃ প্রফুল্লকুমার ঘোষ।]

দ্রাবিড় কথাটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। আর্য্যগণকে যে বর্ব্বর বলা হইয়াছে সেই উদাহরণ দেখাইবার জন্য উক্ত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা হইল। এক্ষণে বিচার্য্য তাঁহারা বৈদিক-আর্য্য না অবৈদিক-আর্য্য? তাঁহারা তৎকালে নিশ্চয়ই অবৈদিক-আর্য্যই ছিলেন। কারণ, তাহা না হইলে এদেশে বৈদিক-আর্য্যগণ তাঁহাদের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন না। তাহা ছাড়া বৈদিক-আর্য্যগণ উক্তনামে অভিহিত হইয়াছেন ভারতে আগমণের পর বেদ রচনা করিয়া। বৈদিক-আর্য-গণের পূর্ব্ববর্ত্তী শাখা বিজিতের হীনতা লইয়া পতিত আর পরবর্ত্তী শাখাটি বিজেতার সম্মান লইয়া বরণীয়। এক্ষণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে বঙ্গদেশ হইতে পঞ্চনদ প্রদেশ পর্য্যন্ত, সমগ্র উত্তর ভারতের সমতল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আর্য্যগণেরই বাসভূমি ছিল। তাহাদেরই তিনটি শাখা পর পর আসিয়া উক্ত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছে।

বৈদিক-আর্য্যগণের ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবলমাত্র পঞ্চনদ প্রদেশে দ্বিজসংস্কার বিদ্যমান। কিন্তু হূণ বিজিত হওয়ার পর হইতে তাঁহারা সাধারণতঃ ব্যবসা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন এবং তজ্জন্য বেনিয়া নামে অভিহিত। পাঞ্জাবে বেনিয়া বলিতে ক্ষত্রিয়গণকেই বুঝায়। যদি তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়া উপবীত ত্যাগ করিতেন তাহা হইলে তাহাদের জাতি নির্ণয় ঐতিহাসিকগণের গবেষণার বিষয় হইত। বর্দ্ধমান রাজবংশ এই বেনিয়া ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় ভুক্ত। উত্তর ভারতের অবশিষ্ট অংশে আসাম হইতে অযোধ্যা প্রদেশ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধযুগে উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রধাণতঃ কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই সাধারণ বিষয়টি

ঠিক বুঝিতে না পারিয়া নানারূপ উদ্ভট কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। তন্মধ্যে একটি নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

[মগধদেশে চন্দ্র নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত শূদ্র জাতীয় সম্রাট ছিলেন। তিনি পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয় বিনাশে ব্রতী হইয়াছিলেন। তজ্জন্য কাশীধাম হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ ক্ষত্রিয় শূন্য হইয়া গিয়াছে।" সামাজিক ইতিহাস—৫।৬ পৃঃ, ৺দুর্গাচরণ সান্যাল।]

এইরূপ যুক্তি যদি দেশের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকগণ লইতে পারেন তাহা হইলে বাঙ্গলার ইতিহাস উদ্ধার হইবে কিরূপে? বৌদ্ধযুগে ক্ষত্রিয়গণ দ্বিজসংস্কার ত্যাগ করিয়াছেন এই কথাটি বলিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না?

ইতিহাসের এই সাধারণ যুক্তিগুলি, দেশের খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণ জানেন না, একথা চিন্তা করিতেও লজ্জা বোধ হয়। একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গীর জন্যই বাঙ্গলার ইতিহাস ঢাকা পড়িয়া আছে। আর এই সঙ্কীর্ণতার মূলে রহিয়াছে জাতি-বিদ্বেষ। আর ইহা যে কেবল মাত্র আমার চক্ষেই ধরা পড়িয়াছে তাহাও বলিতেছি না। দেশের বহু মনীষীর চক্ষেই ধরা পড়িয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কতকগুলি উল্লেখ করিয়াছি এস্থানেও একটি উল্লেখ করিতেছি।

[অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন "ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপতির ন্যায় নিয়ত সত্যোদ্‌ঘাটনের চেষ্টাই যে ইতিহাস লেখকের প্রধান চেষ্টা, তাহা ভাল করিয়া আমাদের হৃদয়ংগম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।.........এখনও আমাদিগের জাতিগত বা সম্প্রদায়গত অনুরাগ বিরাগ আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে। পালবংশের সেনবংশের নরপালগনের......জাতি কি

ছিল তাহাই এখনও আমাদিগের নিকট প্রধান অলোচ্য বিষয় হইয়া রহিয়াছে (গৌড়রাজমালা, উপক্রমণিকা পৃঃ ৩-৪) বাঙ্গলার ইতিহাস সাধনা, ১৩৩ পৃঃ —শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন।]

ইতিপূর্ব্বে মোহিতবাবুর মত উল্লেখ করিয়া দেখান হইয়াছে যে, "যত অনুন্নত আদিম স্তরের মানুষকেই শীর্ষস্থানীয় করিয়া ইতিহাস রচনা করা হইতেছে। এরূপ ইতিহাস রচনার পশ্চাতে একটি বিশেষ মনোবৃত্তি আছে। আর্য্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে বাঙ্গলা হইতে সম্পূর্ণ বহিষ্কার করিয়া দিতে উন্মুখ।" এই বিশেষ মনোবৃত্তিটি কি, তাহা ভুক্তভোগীগণ বিশেষ ভাবে বুঝিতেছেন। এই মনোবৃত্তির মূলেও একমাত্র রহিয়াছে জাতিবিদ্বেষ। সেই মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে আর্য্যসংস্কৃতির বহির্ভূত বলিয়া প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ঐ প্রচারের প্রথম বিষয়বস্তু ছিল আদিশূরের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণগণের বাস ছিল না। পরবর্ত্তী প্রচার বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ ছিলেন না, আর ব্রাহ্মণেতর উচ্চবর্ণের জাতিগুলিও দ্রাবিড় জাতির বংশ ইত্যাদি।

সারচার্লস্ উইলকিন্স্ সাহেবের আবিষ্কৃত বাদাল গরুড়স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিতে পালরাজাদিগের পুরোহিত ও মন্ত্রী, বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের নাম প্রচারিত হওয়ায় একটা মতবাদ অন্তর্হিত হইয়া গেল। এক্ষণে অবশিষ্ট রহিল দ্রাবিড় মতবাদ এবং সেই মতবাদটিকে দৃঢ় করিবার জন্য যেখানে যাহা পাওয়া যায় সবই দ্রাবিড়গণের নামে চালাইবার চেষ্টা হইতে লাগিল। পশ্চিম ভারতে মহেন-জো-দাড়ো ও হরপ্পার পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন সহরের ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহাকেও দ্রাবিড় সভ্যতার দান বলিয়া প্রচারিত হইতে লাগিল। কোন কোন এতদ্দেশীয় ঐতিহাসিকের প্রভাবে এবং কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিকের সমর্থনে ঐ দ্রাবিড়

মতবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। কোন এক ধোপার গাধার 'গন্ধর্বসেন' নামটি হয়তো কোন এক যুগাবতারের হইবে মনে করিয়া যেমন কোন এক রাজা মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিল, এক্ষণে ভারতের অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণের তদনুরূপ অবস্থা হইল। দেশের ছোট বড় প্রায় সকল ঐতিহাসিকই সসম্ভ্রমে এই দ্রাবিড় সভ্যতার জয়গান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রচার করিতে লাগিলেন ভারতের যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য, যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, সেগুলি সবই দ্রাবিড়গণের দান। কৃষি বিজ্ঞান, গৃহ ও নগর নির্মাণ, আত্মার অস্তিত্বজ্ঞান ইত্যাদি সবই আর্য্যগণ দ্রাবিড়গণের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে আর্য্য শব্দ জাতিবাচক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, এক্ষণে স্থির হইল আর্য্য শব্দ কৃষ্টিবাচক। সেই আর্য্য কৃষ্টি, আর্য্য ও দ্রাবিড় এই উভয় মানবগোষ্ঠীর দ্বারা সৃষ্ট। তদনুযায়ী সংস্কৃত সাহিত্যে আর্য্য সম্বোধন সূচক শব্দগুলির পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক নহে কি? যাহা হউক এই দ্রাবিড় শব্দটি বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

["ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনায় 'দ্রাবিড়' কথাটি বরাবর একটা গোলমাল সৃষ্টি করে এসেছে। দ্রাবিড় বলতে বিশিষ্ট কোন নরবংশ বা নৃতত্ত্বগত জাতি বোঝায় না। রিজলি (Risley) সাহেব এই গোলমাল সৃষ্টি করে গেছেন। দ্রাবিড়ভাষীদের একটা 'জাতি' (Race) কল্পনা করে নিয়ে তিনি দ্রাবিড় কথাটিকে অ্যানথ্রপলজির (Anthropology) বিচারে নিয়ে এসে উৎপাত করেছেন। বর্ত্তমানে দ্রাবিড় কথাটা ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়েও গোলমেলে হয়ে উঠেছে।

দক্ষিণ ভারতে তামিল কানাড় বা কর্ণাট, তেলেগু ও মালয়লম এই তিন ভাষাই প্রধানতঃ তথাকথিত দ্রাবিড়বর্গের ভাষা। এই ভাষাভাষীরা কিন্তু জাতিগত ভাবে এক নয়, এই জাতিরা কবে ভারতে এসেছে তার প্রমাণ

আমরা পাই না। দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে উরালিয়ান (Uralian) ভাষার শব্দ ও বর্ণের প্রভাব এবং সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।······উরাল ভাষার প্রভাব দ্রাবিড় সভ্যতার বৈদেশিকতা প্রমাণ করিয়ে দেয়। উরালীয় ভাষীদের সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের ভূমিজ (Autochthonus) মানুষের প্রস্তরীয় সংস্কৃতির সমন্বয় কি দ্রাবিড় সভ্যতার বেদী ?" ভারতের আদিবাসী শ্রীসুবোধ ঘোষ ১৬।১৭ পৃঃ]

["আইকষ্টেট যে বংশকে বেদ্দীয় (Weddid) নাম দিয়াছেন ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ তাকেই প্রোটো অস্ট্রেলয়েড অর্থাৎ প্রায় অস্ট্রেলীয় বংশ বলিয়াছেন। সিংহলের বেদ্দা মধ্যভারত ও দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠী এবং অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী এই তিন নরবংশের মধ্যে আকৃতিগত যে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়; তার থেকে এই তিন নরবংশকেই একই মূল গোষ্ঠীর মানুষ বলে ধারণা করা হয়েছে এবং এই মূল গোষ্ঠীর বৈজ্ঞানিক আখ্যা হলো প্রায় অষ্ট্রেলীয় বা প্রটো-অষ্ট্রেলয়েড।

··· ·· এর মধ্যে একটা কথা আছে, উল্লিখিত সকলেই শুদ্ধশোণিত প্রায় অষ্ট্রেলীয় নয়। অনেকের সঙ্গে নিগ্রোবটু বা নেগ্রিটো গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হয়েছে এবং সেই কারণে প্রায়-অষ্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর এই আদিবাসীদের অনেকের মধ্যে নেগ্রিটো মুখ ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ছাপও কিছু পড়েছে।

······আফ্রিকা ছাড়া নিউগিনি, ফিলিপাইন মালয় এবং আন্দামানে নিগ্রোবটু গোষ্ঠীর নিদর্শন পাওয়া যায়।

······নিগ্রোবটু বা নেগ্রিটো নরবংশই ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী, এ বিষয়ে অধিকাংশ পণ্ডিত একমত। দক্ষিণ ভারতে এমন কতকগুলি আদিবাসী গোষ্ঠী আছে, যাদের পৃথিবীর প্রাচীনতম মানুষের নিদর্শন বলা যায়।"

ভারতের আদিবাসী শ্রীসুবোধ, ৭৮।৮১ পৃঃ]

সুদূর অতীতে, যখন দক্ষিণ ভারত, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার সহিত যুক্ত ছিল, তখন যে মানবগোষ্ঠী এই বিরাট ভূখণ্ডে বাস করিত, প্রায়-অষ্ট্রেলীয় ও নিগ্রোবটু এই উভয় মানব গোষ্ঠীর

সংমিশ্রণে তাহাদের উৎপত্তি। নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের অনেকে এই উভয় মানব গোষ্ঠীকেই একই নিগ্রো সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহারা সমগ্র পৃথিবীর মানব গোষ্ঠীকে মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা ককেশীয়, মোঙ্গোলীয় ও নিগ্রো।

পূর্ব্বের দ্রাবিড় মতবাদীরা ঐ প্রধান তিনটি মানবগোষ্ঠীর মধ্যে তথাকথিত দ্রাবিড় সম্প্রদায়টিকে কোন্ পর্য্যায়ে গণনা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায় না। তাঁহাদের সিদ্ধান্তের বিষয়গুলি দেখিয়া ইহাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে উক্ত বিষয়টিকে সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ না করিয়াই তাঁহারা প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আসল উদ্দেশ্য দেখা যাইতেছে যে, সম্প্রদায় বিশেষ সম্পূর্ণ জাতি বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, নিজেদিগকে কেবলমাত্র আর্য্য আভিজাত্যের অধিকারী এবং সম্প্রদায় বিশেষকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য একটি কাল্পনিক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। মস্তিষ্কে যখন বিদ্বেষ বুদ্ধি আধিপত্য বিস্তার করে তখন মানুষ সাধারণ জ্ঞান বর্জিত হয়। এক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে। সেইজন্য কোন কোন ইতিহাসে দেখা যায় তথাকথিত দ্রাবিড় জাতি জ্ঞান বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে আর্য্যগণ অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ছিল। সুতরাং তাহারা যে ককেশীয় নহে, ইহাই তাঁহাদের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত। আর তাহারা যে মোঙ্গোলীয় নহে, ইহাও সর্ব্ববাদীসম্মত। এক্ষেত্রে অবশিষ্ট রহিল নিগ্রো সম্প্রদায়। সুতরাং তথাকথিত দ্রাবিড়গণ যে নিগ্রোগোষ্ঠীর লোক হইবে তাহা নিঃসন্দেহ।

মহেন-জো-দাড়োর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যে কতকগুলি নর-কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি নিগ্রোগণের ন্যায় খর্ব্বাকায় মানুষের কঙ্কাল। কিন্তু নিগ্রোগণের ন্যায় অরণ্যচারী জাতিকে, ঐরূপ একটি উন্নত প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী বলিয়া প্রচার করিলে, প্রচারক-

দিগকেই হাস্যাস্পদ হইতে হয়। সেই কঙ্কালগুলি বহিরাগত বণিক, শ্রমিক কিংবা কৃতদাস ইত্যাদির কঙ্কাল সিদ্ধান্ত না করিয়া উক্ত সভ্যতার বাহকগণের কঙ্কাল বলার একটা গরজও ছিল। সেই গরজটি হইল তাহাদের সহিত বাঙ্গলাদেশের একটি কাল্পনিক মধ্য শ্রেণীর যুক্ত করিয়া দিবার প্রয়োজন। যাহা হউক শীঘ্রই সেই কল্পনার স্বরূপ প্রকাশিত হওয়ায়, সেই মতবাদ অন্তর্হিত হইল।

বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের অনেকে অনুমান করিতেছেন যে সিন্ধু-সভ্যতা আর্য্যসভ্যতা হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

[তিলকের মতে ঋগ্বেদের যুগ খৃষ্টের প্রায় ৪৫০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী……… অতএব সিন্ধুসভ্যতা যে বৈদিক সভ্যতার অঙ্গ নয় শুধু উভয়ের কালদ্বারা মোটেই নির্ণীত হয় না, বরং তা যে বৈদিক সভ্যতার অঙ্গ হওয়া অসম্ভব নয় তা-ই স্থির হয়। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা তাম্রপ্রস্তর যুগের। বৈদিক সভ্যতাও তাম্রপ্রস্তর যুগের বলেই মনে হয়।……। সিন্ধু উপত্যকার আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের ন্যায় বহু পাত্রই বৈদিক ঋষিরা ব্যবহার করতেন।………মো-আন-জো-দড়োয় ও হরপ্পায় কোন মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল না। বৈদিক আর্য্যদের কোন মন্দির ছিল না। অতএব তা বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য মূলক। উভয় স্থানেই স্বস্তিক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এ চিহ্ন আর্য্য সভ্যতার নিদর্শন।" ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস-ডাঃ প্রফুল্লকুমার ঘোষ ২৩৬।৪৪০ পৃঃ]

এস্থলে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি যে মহেন-জো-দাড়োর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অক্ষরযুক্ত বহু শিলমোহর পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই। সেগুলি যদি দ্রাবিড় ভাষাভাষীগণের সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমানের উক্ত ভাষাভাষীগণের দ্বারা সেগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হইত।

দ্রাবিড় মতবাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত বাস্তব যুক্তিগুলি উপস্থিত হওয়ায় দ্রাবিড় মতবাদ অন্তর্হিত হইয়া গেল। উক্ত মতবাদ অন্তর্হিত

হইয়া গেলেও উক্ত মতবাদীগণ তো অন্তর্হিত হইয়া যান নাই। এইবার তাঁহারা দ্রাবিড়গণের কাল্পনিক রূপ পরিত্যাগ করিয়া বাস্তব রূপ ধরিলেন। কাল্পনিক রূপ দিবার উদ্দেশ্য মনে হয়, যেহেতু উক্ত মতবাদটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সুতরাং এরূপ একটি কাল্পনিক নাম দিয়া, এমন একটি ধাঁধার সৃষ্টি করিলেন যাহাতে দেশবাসীগণ তাহা বুঝিতে না পারেন। কিন্তু অন্ধের দেশে কিবা রাত কিবা দিন, সবই সমান। আমাদের এই সম্পূর্ণ ইতিহাস অনভিজ্ঞ দেশে তদনুরূপ অবস্থা হইল। সেই কারণে বাস্তব অষ্ট্রিক নামটি যখন প্রচারিত হইল তখনও দেশবাসীগণের অনেকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া উচ্চকণ্ঠে সেই অষ্ট্রিক জাতির জয়গান করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বে তথাকথিত দ্রাবিড়গণের পরিচয় প্রদানকালে অষ্ট্রিকগণ সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে এখানে আরও কিছু বলার প্রয়োজন আছে। ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, অতি পুরাকালে বর্ত্তমান দক্ষিণ ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার সহিত অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা এক বিস্তৃত ভূ-ভাগ দ্বারা সংযোজিত ছিল।

বঙ্গদেশ ও উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় সমতলভূমি একটি সঙ্কীর্ণ উপসাগর ছিল। এক প্রবল ভূ-কম্পনের ফলে, দক্ষিণ এশিয়া হইতে অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং বর্ত্তমান বঙ্গদেশ এবং উত্তর ভারতীয় সমতলভূমি সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া এক জলা-ভূমিতে পরিণত হয়।

যখন দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সহিত অষ্ট্রেলিয়ার যোগ ছিল তখন যে মানবগোষ্ঠী সেই ভূ-ভাগে বাস করিত তাহাদিগকে অষ্ট্রো-এশিয়াটিক বা অষ্ট্রিক জাতি বলে। বর্ত্তমানে যাহাদিগকে আদিবাসী বলে,

কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুণ্ডা তাহাদের ভারতীয় বংশধর। তদনুরূপ আদিবাসীগণের বংশধর অষ্ট্রেলিয়াতেও বিদ্যমান আছে।

সম্প্রতি বঙ্গদেশে এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহারা বাঙ্গলার সমতলক্ষেত্রের বর্ত্তমান অধিবাসীদের মধ্যে উপবীত-বিহীন উচ্চ সম্প্রদায়গুলিকেও উক্ত মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিতেছেন এবং এই লইয়া যথেষ্ট মাতামাতিও করিতেছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্তের বিষয়গুলি দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে এ বিষয়ে তাঁহাদের চিন্তা করিবার শক্তি আদৌ নাই। যেমন চিন্তাশক্তিহীন ব্যক্তিগণ এক এক সময় এক একটি আলেয়ার পশ্চাতে ধাবমান হয় ইহাও তদতিরিক্ত আর কিছুই নহে।

যখন দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সহিত অষ্ট্রেলিয়ার যোগ ছিল তখন বঙ্গদেশ সমুদ্রগর্ভে ছিল; সুতরাং সেখানে লোক বসতির সম্ভাবনা ছিল না। বাঙ্গলার পূর্ব্ব ও পশ্চিমের অতি সঙ্কীর্ণ সীমারেখা যথা মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূমের পশ্চিম সীমান্ত এবং ত্রিপুরা, চট্টগ্রামের পূর্ব্বাংশ প্রাচীন ভূমির অন্তর্গত। সেখানে এখনও উক্ত আদিবাসীগণ যথেষ্ট সংখ্যায় বিদ্যমান। কিন্তু বাঙ্গলার সুবিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রে তাহাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই।

যাঁহারা ব্রাহ্মণেতর উচ্চ জাতিগুলিকে উক্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত করিতে চান তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করা হইতেছে যে, ঐ উভয় সম্প্রদায়ের ভাষা ও আকৃতির সাদৃশ্য আছে কি?

কেহ কেহ নিম্নবর্ণের হিন্দুগণের সহিত উক্ত জাতির ভাষার ও আকৃতির সাদৃশ্য আছে বলিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশের মধ্যস্থলের নিম্ন বর্ণের হিন্দুগণের সহিতও উক্ত আদিবাসীগণের কোন বিষয়েই সাদৃশ্য নাই। পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন ভূমিবিশিষ্ট সীমান্তবর্ত্তী স্থানগুলির পার্শ্ববর্ত্তী

সমতলক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া আদিবাসীগণ কিছু কিছু ছড়াইয়া পড়িয়াছে বহু পরবর্ত্তী যুগে। সেইজন্য সেখানকার দুই একটি নিম্ন শ্রেণীর সহিত আদিবাসীগণের সাদৃশ্য দেখা যায়, অন্যত্র নহে।

কোন কোন ইতিহাসে এরূপ ইঙ্গিত আছে যে, আর্য্যগণের (বঙ্গদেশে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণের হইবে) অনুকরণে উন্নত হইয়া ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলি উচ্চ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ঐ সকল ঐতিহাসিককে প্রশ্ন করা হইতেছে যে তাঁহারা প্রাচীন গৌড় নগর ও রাজমহল পাহাড়, এই দুই স্থানের ব্যবধানের দূরত্ব জানিয়া, ঐ উভয় স্থানের অধিবাসীগণের ভাষা, আকৃতি ও সভ্যতার তুলনা করিয়াছেন কি?

পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গলার সীমান্তস্থিত প্রাচীন ভূমির অঞ্চলগুলিতে এবং বিহারের প্রাচীন ভূমির বিস্তৃত এলাকায়, ঔপনিবেশিক আর্য্যগণের বংশধরগণের সহিত আদিম অধিবাসীগণের বৈসাদৃশ্যই উক্ত শ্রেণী-দ্বয়ের পার্থক্যের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। কোন্ অনাদি কাল হইতে এক সঙ্গে পাশাপাশি বাস করিয়াও আদিবাসীগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাইতে পারিল না; আর বাঙ্গলার সমতলক্ষেত্রে, যেখানে তাহাদের বাসের আদৌ সম্ভাবনা ছিল না, সেখানে আদিবাসীগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিল না? ইতিহাস প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে, এখানে আজগুবী কল্পনার স্থান হওয়া উচিত নহে। .

["ভারতবর্ষ বহু বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় ভূমি, বহু বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী,— শক-হূন দল এখানে একদেহে লীন হয়েছে। একথা সত্য। আংশিকভাবে সত্য। আমরা বোধহয় একটা শ্রুতিমধুর থিয়োরী হিসাবে এই আংশিক সত্যটাকে বড় বেশি জোরগলায় প্রচার করেছি। কারণ চোখের সামনেই সেই থিয়োরীর বিরুদ্ধে সাক্ষী রয়েছে, ভারতের আড়াই কোটি আদিবাসী। হাজার হাজার বছর ধরে আর্য্য ভারত ও আদি ভারত একই ভৌগলিক

সীমার মধ্যে থেকেও একসঙ্গে মিশতে পারে নি। না হয়েছে শোণিত সমন্বয়, না হয়েছে সংস্কৃতির সমন্বয়। অবশ্য বিরাট হিন্দু সমাজের সুবিস্তৃত জাতের সিঁড়িতে কয়েক ধাপে কোন কোন গোষ্ঠীর আদিবাসী নিজের আগ্রহে এসে ঠাঁই গ্রহণ করে হিন্দু হয়েছে। হিন্দুসমাজে এরা অনাহূত অতিথি।

ভারতবর্ষের জীবনে বহু রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিপ্লব সংঘটন হয়েছে। কিন্তু মহাভারতের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত এমন একটা ঐতিহাসিক প্রমাণের সাক্ষাৎ আমরা পাই না, যাতে বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, ভারতের আদিবাসীকে আর্য ভারতবর্ষ আপন করে নেবার চেষ্টা করেছে। বীর পার্থ আদিবাসী দুহিতা উলুপীকে এবং মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর হিড়িম্বাকে সাময়িকভাবে সহচরীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঠিক ধর্মপত্নীর মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করেন নি। ইন্দ্রপ্রস্থে বা হস্তিনাপুরের আর্য্যগরিমায় ফিরে এসে তাঁরা নির্বাসিত জীবনের সুখ-সহচরীকে ভুলে গিয়েছিলেন। ভারতের আদিবাসী ২ পৃষ্ঠা, শ্রীসুবোধ ঘোষ।]

"বহু বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী, বহু শক হূণ এখানে এক দেহে লীন হয়েছে। একথা সত্য। কিন্তু আংশিকভাবে সত্য।" উপরে উল্লিখিত মন্তব্যটি সম্বন্ধে বক্তব্য যে, ইহা আংশিকভাবেও সত্য নহে। কারণ ইতিপূর্ব্বে শক হূণগণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারাও আর্য্য। সেই কারণেই তাঁহাদের সহিত সংস্কৃতির সমন্বয় সম্ভব হইয়াছে। "বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর" সহিত সমন্বয় সম্ভব হয় নাই।

প্রকৃত কথা, যাঁহাদিগের কোন বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করিবার শক্তি নাই, কেবলমাত্র জাতিবিদ্বেষ ও পরের মত লইয়া মাতামাতি করেন, তাঁহাদের ঐরূপ অবস্থাই হয়। যাঁহারা চন্দ্রবংশীয় রাজা 'বলি' এবং দৈত্যরাজ 'বলি'র পার্থক্য বুঝেন নাই, বর্দ্ধমান রাজ-বংশের ইতিহাস জানেন না, তাঁহারা অষ্ট্রিক জাতির ইতিহাস লইয়া বড় বড় মত প্রকাশ করেন, ইহা অপেক্ষা বাঙ্গলার ইতিহাসের আর কি শোচনীয় অবস্থা হইতে পারে ?

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করিতেছি যে, বর্দ্ধমান রাজবংশ, ক্ষত্রিয় রাজবংশ। ঐ বংশের আদিপুরুষ পাঞ্জাব হইতে ঐ স্থানে আসিয়াছিলেন ব্যবসা করিতে। তাঁহার বংশধর প্রভূত উন্নতি করিয়া সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে জমিদারীর বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন। কিন্তু অনেকে এই রাজবংশটিকে স্বাধীন হিন্দুযুগে প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ এই ভ্রম করিয়া তাহাকেই বাঙ্গলার ক্ষত্রিয় জাতির মানদণ্ড স্থির করিয়া, বৌদ্ধ যুগের দ্বিজসংস্কার বর্জ্জিত প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণকে, ক্ষত্রিয় জাতির তালিকার মধ্যে গণ্য করেন নাই।

তথাকথিত দ্রাবিড় জাতি এবং অষ্ট্রিক জাতি মূলতঃ একই জাতি, নিগ্রোগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ইহা প্রমাণিত হইল। অধুনা বহু ইতিহাসে দেখা যাইতেছে যে, "অষ্ট্রিকগণ কৃষিবিজ্ঞানের আবিষ্কারক। তাহারা উত্তর ভারতের সমতলক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য করিয়া নগর সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল। তাহাদিগকে উত্তর ভারতের সমতল ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিয়া, আর্য্যগণ তাহাদের উর্ব্বর শস্যশ্যামল দেশগুলিকে অধিকার করিয়া লইয়া তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। অষ্ট্রিকগণ দক্ষিণ ভারতের পাহাড় ও জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছে।" এইরূপ বিবরণগুলিও কি কাল্পনিক নহে?

অষ্ট্রিকগণের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে একদিকে আফ্রিকা এবং অন্যদিকে অষ্ট্রেলিয়া, আর মধ্যভাগে, সর্ব্ব নিকটে সিংহল ও আন্দামান দ্বীপ। উক্ত স্থানগুলির ইতিহাস যাঁহারা জানেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন অষ্ট্রিকগণের কৃষিবিজ্ঞানে এবং নগর সভ্যতা স্থাপনে জ্ঞানের পরিচয়। যে অষ্ট্রিকগণ উত্তর ভারতে কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতি করিয়া বৃহৎ বৃহৎ নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিল

তাহারা আর্য্য কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া, দক্ষিণ ভারতে গিয়া সে সভ্যতার বিন্দুমাত্র নিদর্শন বহন করিতে পারিল না। পরন্তু বন্যচারী আদিম মানব স্তরে নামিয়া গেল ইহাই কি একটা যুক্তি? প্রকৃত কথা, অষ্ট্রিক বা নিগ্রোগোষ্ঠীর লোক আদিম কাল হইতেই দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন ভূমির জঙ্গলেই বাস করিতেছে। কৃষি অনভিজ্ঞ জাতির জঙ্গলই একমাত্র আশ্রয়স্থল। অরণ্যের পশু ও ফলমূলই তাহাদের খাদ্যের সম্বল। উত্তর ভারতের সমুদ্রপ্লাবিত স্থানগুলিকে কোনরূপেই ব্যবহারযোগ্য করা নিগ্রো জাতির সাধ্যের অতীত ছিল। আর্য্য প্রতিভাই উক্ত স্থানকে ব্যবহারোপযোগী করিয়াছে। সিংহলের মহাবংশে উল্লেখ আছে যে বিজয়সিংহের আগমনের পূর্ব্বে সেখানকার অধিবাসীগণ কৃষিকার্য্য জানিত না। অষ্ট্রেলিয়ার নরখাদকগণ কি কৃষিকার্য্য জানিত? দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার আদিম মানবগণেরও তদনুরূপ অবস্থা ছিল। এখন তাহারা যে কিছু কিছু কৃষিকার্য্য শিখিয়াছে তাহা সেখানকার আর্য্য উপনিবেশকারীগণের নিকটই শিক্ষা করিয়াছে।

কৃষিবিজ্ঞান সভ্যতম জাতির জ্ঞানের ফল। পুরাণে বর্ণিত আছে মহারাজ পৃথুই সর্ব্বপ্রথম কৃষির প্রবর্ত্তন করেন।

["ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ,—এই তিনটি শব্দে আর্য্যগণের জাতীয় জীবনের ইতিহাসের বীজমন্ত্র রক্ষিত হয়। যাযাবর যুগ, কৃষিযুগ, এই দুইটির মধ্যবর্ত্তী সন্ধিযুগ। এই তিন যুগে আর্য্যগণের জাতীয় জীবন এবং তাহাদের ধর্ম্ম, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, প্রভৃতির ইতিহাস বেদে লিপিবদ্ধ আছে। এই তিন ব্যাহৃতি, ঐ তিনটি যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ভূঃ—সত্তা বা স্থিতি—কৃষিযুগ।

ভুবর=ভূঃ—কৃষিযুগ, ঋ—গতিবাচি যাযাবর যুগ। স্থিতি এবং গতি, দুইই—কৃষি ও যাযাবর। স্বর্—সু উপসর্গের সহিত গতিবাচি "ঋ" ধাতুর সমন্বয়ে, স্বর শব্দ গঠিত।

যযাতির পুনঃ যৌবনলাভ—এই যুগে স্থিতিশীল হইয়াও, আর্য্যগণ মধ্যে মধ্যে যাযাবর নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে মনীষীগণ ভূবর শব্দের অন্তরীক্ষ, এই অর্থ করেন, কিন্তু অন্তরীক্ষ অর্থে প্রসিদ্ধি কোথাও লক্ষিত হয় না। মহামতি যাস্কের নিঘণ্টু ১ম অধ্যায়ে ৩।৪র্থ বর্গে অন্তরীক্ষ বাচি বৈদিক শব্দ সমূহের মধ্যে ভূবর শব্দ দৃষ্ট হয় না, উহার ব্যুৎপত্তিও করিতে পারা যায় না।

যযাতি শব্দ—গতিবাচি 'যা ধাতুর বীপ্সাত্মক রূপ মাত্র এবং ঐ শব্দের উপাদানে যাযাবর।" বৈদিকতত্বে ভাষাবিজ্ঞান, ১২৬ পৃঃ, শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।]

["The word Arya comes from a root word, meaning to till and the Aryans as a whole were agriculturist and agriculture was considered a noble occupation. The tiller of the soil functioned also as priest, soldier or trader, and there was no privileged order of priests." The Discovery of India, Page 62, by Pandit Jawaharlal Nehru.]

["কৃষি—উত্তর আফ্রিকা প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া মেসোপোটেমিয়া, পারস্ত ও ভারতবর্ষ,……এই ভূভাগে প্রথম কৃষিকার্য্যের উদ্ভব হয়। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও প্রত্নতত্বের গবেষণা ও আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ হইতে এই সিদ্ধান্ত এখন সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।" বিজ্ঞানের ইতিহাস ২৮ পৃঃ, শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন]

উপরে উল্লিখিত বিবরণ হইতেও বুঝা যায় কেবল মাত্র আর্য্য অধ্যুষিত, পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যদেশগুলিতেই কৃষি বিজ্ঞানের পত্তন সম্ভব হইয়াছিল।

["চৈনিক কিম্বদন্তী অনুসারে সম্রাট সেনহুঙ সে দেশে চিকিৎসা বিদ্যার প্রবর্ত্তক। তাঁহার রাজত্বকাল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৭০০ অব্দ। রাজ্যের অধিবাসীদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম কৃষি প্রবর্ত্তন করেন"। বিজ্ঞানের ইতিহাস ১২১ পৃঃ, শ্রীসমরেন্দ্র নাথ সেন।]

চীন দেশে যে কৃষির প্রবর্তন হইয়াছিল তাহা একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, যিনি চিকিৎসা বিদ্যার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল। বর্ব্বর লোকদিগের দ্বারা সম্ভব হয় নাই।

আর্য্যগণ যদি অষ্ট্রিকগণের নিকট হইতে জন্মান্তরবাদ শিক্ষা করিয়া থাকে তাহা হইলে উপনিষদের ঋষিগণের কৃতিত্ব কোথায়?

আর্য্য ও অষ্ট্রিকগণের মধ্যে কোন কোন আচার অনুষ্ঠানের সাদৃশ্য থাকিলে, তাহা আর্য্যগণ অষ্ট্রিকগণের নিকট শিক্ষা করিয়াছে ইহা স্থির না করিয়া, অষ্ট্রিকগণ আর্য্যগণের নিকট শিক্ষা করিয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা কি অসঙ্গত হইবে? তাহা ছাড়া বিভিন্ন দেশের মানব মনের অদ্ভুত সামঞ্জস্যগুলি কি কাহারও চক্ষে ধরা পড়ে নাই। সেক্‌সপিয়ার কি কালিদাসের নকল করিয়া নাটক লিখিয়াছিলেন? "মানুষের চিন্তা ও ভাবরাশি অত্যন্ত সংক্রামক। যুগ হইতে যুগান্তরে দেশ হইতে দেশান্তরে সংক্রামিত হয়।" সমগ্র ইউরেশিয়ার আর্য্যগণের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কি, একই রূপ সভ্যতা একই সময়ে বিকশিত হইয়াছিল?

বাঙ্গলার ইতিহাসে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক জাতি সম্বন্ধে এত বিরুদ্ধ মতবাদের অবতারণা সম্ভব হইত না, যদি না এদেশ বৌদ্ধ প্লাবিত হইত। এই বৌদ্ধ প্লাবনের সুযোগ লইয়া জাতিবিদ্বেষপরায়ণ ঐতিহাসিকগণ সব বুঝিয়াও উপবীতহীন জল আচরণীয় উচ্চ জাতিগুলিকে প্রতারিত করিয়া আসিতেছেন। আর ইতিহাস অনভিজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তিগণ ঐ সব ঐতিহাসিকগণের অপপ্রচারের প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছেন। ইতিহাস অনভিজ্ঞ প্রতারিত সাধারণ দেশবাসীগণকে, সেই বৌদ্ধ প্লাবনের মূল সুত্রটির আভাষ দিবার জন্য "বাঙ্গলায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম" হইতে উদ্ধৃত, নিম্নের বিবরণটি উল্লেখ করিয়া এই উপসংহার শেষ করিলাম।

[অনাদিকাল হইতে বসুধার বুকে কত ধর্ম্মমত, কত সভ্যতা জন্মিয়াছে, আবার মহাকালের ভীমাবর্ত্ত রথচক্রের নিষ্পেষণে মরিয়াও গিয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে সে কথা নয়,—তাহার মৃত্যুর কোন প্রশ্নই ওঠে না। বৌদ্ধ ধর্ম্ম শুধু মাতৃভূমির স্নেহনীড় হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া পরবাসী হইল। নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল বটে, কিন্তু যাওয়ার সময় কাহারও বিরুদ্ধে সে এতটুকু অভিযোগ করিয়া যায় নাই তাহার কি অপরাধ,—শুধু অপযাত্রীর মতই চুপে চুপে বাহির হইয়া গেল। যাওয়ার আগে সে কি জানিত না,—রন্ধ্রে রন্ধ্রে, শিরায় উপশিরায়, সে কি টের পায় নাই,—ভারতের সমাজ—নিকেতনে তাহার স্থান কোন নিরালা উপকণ্ঠে,—সেই নিভৃত কোণে সে কত একা কত নিঃসঙ্গ ? পালশক্তির দশম-দশার সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝিয়াছিল,—তাহাকে বুঝিতে হইয়াছিল,—আচম্বিতে দুর্দিনের তুফান যে-দিনই যে দিক দিয়াই উঠিবে, তাহার রক্ষার্থে কেহ অগ্রসর হইবে না, তাহার সাহায্যের জন্য কোন বন্ধুই ছুটিয়া আসিবে না। আসেও নাই। কোনও রাজশক্তি বা জন-শক্তি তাহার সাহায্যে পাদমেকং যায় নাই। সে নিজেই যতটুকু পারিল প্রতিরোধের ক্ষীণ চেষ্টা করিল, অথবা করিল না,—তারপর দুর্য্যোগময়ী রজনীর ঘন তমিস্রার আবরণে নিজের জন্মভূমি হইতে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ভারতের পূর্ব্ব-গগনে একদিন এক মঙ্গল ঊষায় যাহার উদয় হইয়াছিল, সারা-ভারত প্রখর দীপ্তিতে দীর্ঘদিন প্রদক্ষিণ করিয়া আবার সেই পূর্ব্ব-গগন হইতেই সে বিদায় লইয়া গেল। যেখানে যেখানে গেল, সে সকল স্থানে বহু পূর্ব্ব হইতেই তাহার নিরাপদ প্রচ্ছায় রচিত ছিল, তথায় অভ্যর্থনারও কোনও ত্রুটি হয় নাই,—কিন্তু ভারত তাহাকে চিরদিনের মত হারাইল। যাওয়ার সময় সে সঙ্গে পাথেয়ও এমন কিছু লইয়া যায় নাই,—কেবল খান কয়েক পুঁথি। কিন্তু সেই তুলনায় আঠার শতাব্দী ধরিয়া ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাহিত্য ও শিল্পের মঞ্জুষায় সে যাহা দান করিয়া গিয়াছে, তাহার ভূমার, রভসের ও উর্জস্বলতার পরিমাপ করিতে গেলে বিভ্রান্তই হইতে হয়,—তৌলদণ্ডের রজ্জু যত শক্তই হোক, সেই অবদানের অতি ভারে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু বিদায়ের ক্ষণে এসব কথা কেহ একবার স্মরণও করিল না, কেহ

পিছু ডাকিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টাও করিল না, এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিল না। সেদিন শুধু বুঝা গেল, দিগন্তহীন অতীতের মহাসিন্ধুর গর্জিত আলোড়নের মধ্যে গৌতমবুদ্ধ-অশোক-নাগার্জ্জুন হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মপাল, অতীশ-অভয়াকর পর্যন্ত বুদ্বুদ-সকল যেমন নিঃশব্দে ফাটিয়া গিয়াছে, সারনাথ, শ্রাবস্তী ও সাঞ্চী-ভরহুত হইতে আরম্ভ করিয়া নালন্দা-বিক্রমশীল ও সোমপুরী, জগদ্দল পর্য্যন্ত তরঙ্গগুলিও তেমনই নিশ্চিহ্নরূপে লীন হইয়া গিয়াছে। এবং সে-দিনের সে-কথা বস্তুতঃ আজিকারও যেন অনেকখানি কথা। যেন কোনও স্মৃতি নাই, কোন সম্বিৎ নাই, যেন কোন চেতনা নাই কোন অনুভূতি নাই,—বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে এমনই নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ, এমনই নিস্পৃহ ও অনাসক্ত হইয়া আজিকার ভারতবর্ষের ইতিহাস বাঙ্গলার ইতিহাসকে কোলে লইয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে,—যেন কোনও দিন কোথাও কিছু ঘটে নাই।"

বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্ম ২৪০-২৪২ পৃঃ, শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত।]

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১০	প্রণেতার	প্রণেতাদের
৪	৩	যথেষ্ঠ	যথেষ্ট
১/০	১	হর	হয়
১॥০	১৪	অনোপবীত	অনুপবীত
১॥৶০	১১	যথেষ্ঠ	যথেষ্ট
১১	২০	পরস্পরা	পরম্পরা
১৩	২৪	হয়	হন
২২	২২	সাহেবর	সাহেবের
২৮	২	মধ্যভাবে	মধ্যভাগে
২৮	৯	নগরে	নগরকে
২৯	১৩	প্রতাপাম্বিত	প্রতাপান্বিত
৩৩	৬	foming	forming
৩৩	১১	Gangatic	Gangetic
৩৩	২১	Afred	Alfred
৩৩	২৫	কয়া	করা
৩৪	২৪	মগধও	মগধ ও
৩৯	২৭	শ্রীর্গাদাস	শ্রীদুর্গাদাস
৪৩	৩	স্বদেশের	স্বদেশেরে
৪৩	৬	দ্বায়	যায়
৪৬	৭	Khatria	Kshatria
৪৬	১৯	প্রভৃতিতে ও	প্রভৃতিতেও
৪৬	২৩	পদ্মসম্ভরের	পদ্মসম্ভবের
৪৬	২৪	তির্ব্বতে	তিব্বতে
৪৭	১২	সম্ভুত	সম্ভূত

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৭	২৩	উল্লেথ	উল্লেখ
৪৮	৮।৯	শান্তরক্ষিত	শান্তরক্ষিত
৫০	৪	হরিশ্চন্দ্র	হরিশ্চন্দ্র
৫৪	২১	সন্মতিক্রমে	সম্মতিক্রমে
৫৬	২৪	স্ব-সম্প্রায়ের	স্ব-সম্প্রদায়ের
৫৭	২৫	ব্রহ্মণে	ব্রাহ্মণে
৫৯	১৭	অন্নুর্ভুক্ত	অন্তর্ভুক্ত
৬০	৯	ইসিহাসে	ইতিহাসে
৬০	১২	গোগালদেব	গোপালদেব
৬১	৮	নয়পাল ও	নয়পালও
৬১	১৪	ঐতিহাস	ইতিহাস
৬২	৩	জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
৮১	১৫	মর্য্যদা	মর্য্যাদা
৮৬	১৮	সম্প্রদায়ে	সম্প্রদায়ে
৮৬	২৫	গ্যেত্রীয়	গোত্রীয়
৯১	১৯	প্রকিষ্ট	প্রকৃষ্ট
৯৪	১	কুমারিলভট্র	কুমারিলভট্ট
৯৫	১০	উচ্ছৃঙ্ক্ষলতার	উচ্ছৃঙ্খলতার
১০১	১৫	বৈশিষ্ঠ	বৈশিষ্ট্য
১০১	২০	যাবতীর	যাবতীয়
১০৩	২৫	হস্তে	হস্তে
১০৪	৮	থাকে	থাকে
১০৪	১৫	সন্মিলিত	সম্মিলিত
১০৫	১	উপরিল্লিখিত	উপরিলিখিত
১০৫	৪	বঙ্গলাদেশে	বাঙ্গলাদেশে
১০৫	২২	ষাইতেছে	যাইতেছে

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৫	২৩	প্রতিদ্বন্দিতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
১০৫	২৫	বর্ণণা	বর্ণনা
১০৬	২৩	প্রতিদ্বন্দিতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
১০৮	২২	উল্লিখিত	উল্লিখিত
১১২	৭	ব্যবস্থাও	ব্যবস্থাও
১২০	৬	উদ্দশ্য	উদ্দেশ্য
১২১	১০	ভগবন্নন্ন-নারায়ণদেবের	ভগবন্নারায়ণদেবের
১২৩	২৪	ইতেহাসের	ইতিহাসের
১৩৫	১	তদ্ববংশীয়	তদ্বংশীয়
১৩৯	৬	চাতুবর্ণাশ্রম	চাতুর্বর্ণাশ্রম
১৪০	৭	মলয়	মালয়
১৪৪	২১	করিরাছেন	করিয়াছেন
১৪৭	১২	সিখিয়ানের	সিথিয়ানের
১৪৯	৩	ঐতেরেয়	ঐতরেয়
১৫৩	১৭	উল্পেখ	উল্লেখ
২৫৩	২২	তাহাগিকে	তাহাদিগকে
১৫৪	১	কারিয়া	করিয়া